মন্ত্রশক্তি

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

চার টাকা আট আনা

দশম সংস্করণ

চৈত্র—১৩৬১

ভূমিকা

'মন্ত্রশক্তি' পরিচিত এবং অপরিচিত উচ্চশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত সমুদায় পাঠক ও পাঠিকামণ্ডলীর তুষ্টিসাধনে সমর্থ হইয়াছে দেখিয়া আমারও শ্রম সফল বোধ করিয়াছি।

লেখিকা

মন্ত্রশক্তি

মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্নসংশয়ঃ।

উৎসর্গ

যাঁহার নিকট

বেদমন্ত্রের সৃষ্টিস্থিতিবিধায়িনী মহাশক্তির বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি,

যাঁহার

মন্ত্রশক্তির অপূর্ব্ব প্রভাব নিজেও কতবার অনুভব করিয়াছি,

সেই

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিতুল্য

আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপকার

দাদামহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে

অর্পণ করিলাম।

মন্ত্রশক্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজনগরের জমিদারবাবুদের কুলদেবতা গোপীকিশোরের মন্দিরটী শুধু জনসাধারণের চক্ষেই সুন্দর বলিয়া সমাদৃত হইত না, তাহার শিল্পনৈপুণ্য ও নির্ম্মাণ-চাতুর্য্য কবি ও চিত্রকরের নেত্রেও প্রশংসার জ্যোতিঃ ফুটাইয়া তুলিত।

সম্মুখে কলনাদিনী চিত্রলেখা। পরপারের গোলার্দ্ধাকারে সুনিবিড় বৃক্ষরাজি। ইহাদের শেষ প্রান্ত অনন্তে দিগ্বলয়ে মিশিয়া গিয়াছে এবং পদতলে সুদূর-বিস্তৃত অতি শুভ্র তীর বালুকার নিম্নে স্বচ্ছ সলিল-বক্ষে প্রশান্ত নীলিমার প্রশস্ত ছায়া। মধ্যে মধ্যে কেবল জলমধ্যে শ্বেত তরঙ্গের অস্ফুট মৃদু শব্দে অবাধ লীলা-নর্ত্তন, আর গগনাঙ্গনে ততোধিক শুভ্রতর মেঘপুঞ্জের নিঃশব্দ সশঙ্ক গতি। নদীর উপর বাঁধাঘাট। প্রশস্ত চত্বরের দুইদিকে বসিবার জন্য মর্ম্মরাসন। লোহার ফটকটি অতি বিচিত্র। তাহার মাথার উপরে একটা বড় লণ্ঠনে রাত্রিতে রঙ্গীন তেলের বাতি জ্বলিত। এই চত্বরের পরেই একটি সুরচিত পুষ্পোদ্যানের কিয়দংশ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই উদ্যানটি অত্যন্ত বৃহৎ এবং ইহার কতকাংশ বিবিধ ফলবৃক্ষে পরিপূর্ণ। উদ্যানের মধ্যভাগেই মন্দির। সেই উদ্যানে লতাকুঞ্জ, গুল্ম-ভবন, প্রস্তরাসন, নায়ক বা নায়িকামূর্ত্তি; পথিপার্শ্বে আলোকাধার—ইহার কিছুরই অভাব ছিল না। মর্ম্মর-মণ্ডিত সুপ্রশস্ত সমচতুষ্কোণ চত্বরের মধ্যস্থলে বিশাল মর্ম্মর-মন্দির নীল আকাশের দিকে

মাথা তুলিয়া আছে। জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর কনক-কিরণ মন্দির-গাত্রে প্রতিফলিত হইয়া সুন্দর দেখায়। ঘন মেঘাড়ম্বরশালী আসন্ন ঝটিকার স্তব্ধতায় তাহা অধিকতর চিত্তহারী। সুবর্ণ-পতাকা-সংযুক্ত স্বর্ণচূড়া প্রতপ্ত সূর্য্যকিরণে ঝলসিত হইয়া ছটা বিকীর্ণ করে, ঊর্দ্ধপক্ষ পরিশ্রান্ত পক্ষিগণ মধ্যাহ্ন-ভ্রমণের পর একবার ইহার উপরে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া লয়। বর্ষার জলধারা মধ্যে মধ্যে সেই শুভ্র অঙ্গ ধৌত করিয়া দিয়া ছিন্নমাল্যভ্রষ্ট মুক্তাবলীর মত নিম্নের চত্বরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। তখন তাহার ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি পায়।

মন্দিরের প্রবেশদ্বার সোণার পাতে মোড়া, ইহার উপর মণিময় অক্ষরে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার নাম ও প্রতিষ্ঠার তারিখ লিখিত ছিল। সেদিন সুদূর অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যায় নাই। অদূরবর্ত্তী দিনেরই সে ইতিহাস।

মন্দিরের অভ্যন্তরে সুচারু স্বর্ণসিংহাসনে মন্দিরের দেবতা-যুগল পাশাপাশি স্থাপিত। পীতাম্বর শ্যামমূর্ত্তি বামদিকে ঈষৎ হেলিয়া বংশীবাদন করিতেছেন, আর সেই বাঁশীর স্বরে গৃহকর্ম্মে আনমনা রাধা সব ভুলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বিস্রস্ত কুন্তলে ছুটিয়া আসিয়া শ্যামসঙ্গিনী হইয়াছেন। শিল্পী এই অপূর্ব্ব আদর্শ চিত্রপটে অঙ্কিত রাখিয়া প্রতিমা গঠন করিয়াছিল, তাই তাহা এমন পবিত্র ভাব-সম্পদ্-ভূষিত। সংসারের ভ্রাম্যমান চক্রে আবর্ত্তিত হইতে হইতে জীবাত্মা আত্ম-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া সংসারকেই গৃহবোধে তাহাতেই রত থাকে, কিন্তু যে দিন জীবন-যমুনার পরিপূর্ণ কূল হইতে বাঁশীর আহ্বান তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে, তখন তাহার সকল ভ্রান্তির অবসান হইয়া যায়। তখন লজ্জা-মান-ভয় সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া দেহরূপ পরবাস ছাড়িয়া বদ্ধ-আত্মা মুক্ত-আত্মার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া যায়, এবং

সেই আকাঙ্ক্ষিত মিলন লাভ করিয়া সর্ব্ব ব্যাকুলতার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করে।

এই যুগ্ম প্রতিমার সম্মুখে সুন্দর একটি সুবৃহৎ অষ্টদল স্বর্ণপদ্মের মধ্যদেশে তুলসীদাম-বেষ্টিত চন্দন-চর্চ্চিত শালগ্রাম-শিলা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর শ্বেত ও কৃষ্ণপ্রস্তরের পদ্মাকৃতিতে রচিত হর্ম্ম্যতলে নিত্যপূজার সুবর্ণময় উপকরণসমূহ যথাযোগ্য স্থানে সুসজ্জিত। জলে-ভরা শুভ্র পাণি-শঙ্খ, সোনার ঘণ্টা, কাঁশর, পঞ্চ-প্রদীপ, দীপ ও ধূপাধার সমস্তই সুমার্জ্জিত সুবিন্যস্ত।

এই মন্দির স্বর্গীয় জমিদারের অক্ষয় কীর্ত্তি। শুধু মন্দির নহে, তাঁহার প্রায় সমুদয় সম্পত্তিই তিনি দেবোদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন। উৎসবাদির ব্যয় ও মন্দির সংস্কারাদি অত্যুত্তমরূপেই চালাইবার ব্যবস্থা তিনি ইচ্ছাপত্র দ্বারা করিয়া গিয়াছেন। জমিদার-গোষ্ঠী তখন হইতে দেবসেবকরূপে সেবাবশিষ্ট উপস্বত্ব উপভোগ করিতে পারিবেন; কিন্তু দান-বিক্রয়ের অধিকারী হইবেন না, সমুদয় সম্পত্তিই দেবোত্তর।

এই মন্দির ব্যতীত একটি অতিথিশালা ও উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত চতুষ্পাঠীও এই স্বধর্ম্মপরায়ণ জমিদারের যশ ঘোষণা করিতেছিল। টোলের অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণিই প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছানুসারে এতকাল মন্দিরের পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। জমিদার মহাশয় তাঁহার ইচ্ছাপত্রে স্পষ্ট বিধান করিয়া গিয়াছেন যে, যতদিন তর্কচূড়ামণি জীবিত থাকিবেন, ততদিন পূজার ভার তাঁহার উপরই থাকিবে; তাঁহার অভাবে, তাঁহার নিয়োজিত শিষ্যই পুরোহিতের পদ পাইবেন; এবং এইরূপে আস্তিক্য ও শাস্ত্রজ্ঞানযুক্ত প্রকৃত বিদ্বান পুরোহিতগণের উপরই তৎতৎ গুণসম্পন্ন ভবিষ্যৎ-পুরোহিত-মনোনয়নের ভার ন্যস্ত থাকিবে। পুরোহিতের অযোগ্যতা দেখিলে এবং তাহা বিশেষ বিশেষ স্থানীয় ভদ্রব্যক্তিগণের

দ্বারা সমর্থিত হইলে, জমিদার-গোষ্ঠীর যিনি তৎকালে প্রবীণ থাকিবেন, তিনি পুরোহিত পরিবর্ত্তনে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই মনোনয়ন উপরি উক্ত চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের মধ্য হইতেই করিতে হইবে। এই ব্যবস্থাটিতে অনেক সময় কুফল ফলিতে পারে, কিন্তু ইহাতে সুফল লাভের সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। নিজ নিজ যোগ্যতা প্রমাণ করণেচ্ছায় ছাত্রেরা প্রথমাবধি সচেষ্ট থাকাতে প্রতিযোগী পরীক্ষার্থিগণের ন্যায় উন্নতিলাভে সমর্থ হইবে। তবে কখন কখনও কোন ঈর্ষাকলুষিত সঙ্কীর্ণহৃদয় ব্যক্তি এই উপলক্ষে বিবিধ অশান্তি সৃষ্টি করিয়া তুলিতেও সমর্থ। এই প্রথম নির্ব্বাচনে যে সেইরূপই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই কথাই আমরা এক্ষণে বলিতে বসিয়াছি।

এই টোলের ছাত্র অম্বরনাথ নামক ছেলেটি অত্যন্ত নিরীহ ও নম্র-প্রকৃতি সম্পন্ন। সবেমাত্র আট মাস সে এই টোলে অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে অধ্যাপক হইতে আরম্ভ করিয়া, অল্প কয়েকজন ছাত্র ব্যতীত—পাড়া প্রতিবাসী পর্য্যন্ত সকলকেই সে নিজগুণে বশীভূত করিয়াছিল। ইদানীং এই গুণগ্রাহিতার ফলে বৃদ্ধ পণ্ডিতের শয্যারচনা, হরিতকীকর্ত্তন হইতে তাঁহার পদসেবার নিত্য ভার এই শান্ত সুশীল ছাত্রটির উপর নিক্ষেপ করিয়া অন্যান্য ছাত্রগণ নির্ঝঞ্ঝাট হইয়াছিল, অধিকন্তু তাহাদের ঘাড়ের সমস্ত বোঝাও সেই সঙ্গে সঙ্গেই একে একে এই অম্বরনাথের স্কন্ধের উপর মৌরসী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। অধ্যাপক মহাশয় সুদূর অতীতে পত্নীহীন হইয়াছিলেন; তাই জমিদার মহাশয়ের টোলবাড়ীকে চৈতন্যদেবের অনুমোদিত সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান বলা যাইতে পারে; কিন্তু এই নারীবর্জ্জিত গৃহস্থালীর যে একটা মস্ত বড় উপদ্রব বর্ত্তমান থাকা অনিবার্য্য, সেই কাণ্ডটা লইয়া ইতঃপূর্ব্বে ছাত্রদলকে অনেক সময় অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতেও হইয়াছে। সেই পাকশাকের

ব্যাপারটা ইদানীং অম্বরনাথের উপর আসিয়া পড়ায় ছাত্রদলের গুরুভার অনেকটাই প্রশমিত হইয়াছিল। অম্বরনাথও ইহাতে দুঃখিত নহে। সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করায়, তাহার কখনই বড় একটা সময়াভাব ঘটিত না। প্রাতঃকৃত্য ও সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া পাঠ্যপুস্তক লইয়া জনহীন নদীতটে, কখন একটি গাছের তলায়, কখনও বা শ্যামল প্রান্তরে আসিয়া সে বসিত। প্রভাতের সদ্যোজাগ্রত কাকপক্ষিগণ তখন প্রাভাতিক মঙ্গলাচরণ করিত, পদতলে চিত্রলেখা মৃদু কল্লোলে গান গাহিয়া গাহিয়া বহিয়া যাইত। স্বর্ণকুম্ভকক্ষা রক্তবসনা উষা নববধূর সরমশঙ্কিত পদক্ষেপে সখী দিগ্‌বালার হস্তধারণ পূর্ব্বক ক্রমে জগমন্দিরের পূর্ব্বদ্বারে আসিয়া দেখা দিতেন; চঞ্চলা বালিকার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া-পড়া মুক্তাগুলির মত শিশির বিন্দু, গাছের তলায় ও অমরনাথের মাথার উপর ঝরিয়া পড়িত। সে কিন্তু এ সকল কিছুই জানিতে পারিত না, তাহার একাগ্রচিত্ত অধীত বিষয়ে তন্ময় হইয়া যাইত—বাহ্যজগতের সঙ্গে সে সময় তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকিত না।

এই অবসরটুকু যথার্থ উপভোগের পর যুবক গুরুসেবায় মনোনিবেশ করিত। গুরু বৃদ্ধ এবং ব্যাধি-নিপীড়িত, কাজেই তাঁহার প্রকৃতি একটু রুক্ষ হইয়াছিল। মন্দিরের পূজাশেষে টোলে ফিরিয়াই তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িতেন এবং সেই সময় সামান্য একটু কিছু আহার্য্য না পাইলে তাঁহার বিরক্তি অনেক সময়ই ক্রোধে পরিণত হইত। পূর্ব্বে এরূপ রোষাভিনয় নিত্য ব্যাপারের মধ্যেই ছিল; কিন্তু অম্বর-নাথের আগমনাবধি তাহার সাবধানতায় তাঁহাকে এই সামান্য বিষয়ের জন্য আর কোন দিন বিরক্ত হইতে হয় নাই। মধ্যে মধ্যে কারণ বিশেষে তাঁহাকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখিলেই ছাত্রগণ তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া পলাইত; কাজেই তখন একা অম্বরনাথকে সকলের প্রাপ্য তিরস্কার

সহ্য করিতে হইত। এমন করিয়া দিন কাটিতেছিল। মানুষের ইচ্ছা দিনগুলা চির-দাসখতে তাহাদের নিকট নাম সই করিয়া দেয়, কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা অপেক্ষা প্রবলতর একটা অদৃশ্য শক্তি যে এই সুখ-দুঃখের চাকাটাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়, সে কেবল তাহাদের এই আব্দার শুনিয়া মুখ মুচকিয়া হাসে এবং চাকাটা ক্রমাগত ঘুরাইতে থাকে।

জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি পীড়িত হইয়া প্রায় মাসাবধি শয্যাশ্রিত রহিলেন। তারপর সহসা একদিন ইহলোকের সহিত দেনা পাওনা মিটাইয়া কোন এক অজানা লোকান্তরের উদ্দেশ্যে মহাযাত্রা করিলেন। এই দূরপথের উপযুক্ত পাথেয় তাঁহার ছিল কি না, তাহা তাঁহার বোঁচ্‌কা খুঁজিয়া দেখা হয় নাই ; কিন্তু লোকে কয়েকদিন যাবৎ বলাবলি করিল যে, "লোকটা সাক্ষাৎ স্বর্গে গিয়াছে।"—"হ্যাঁ, একেবারে খাঁটি মানুষ ছিল বটে, দেবসেবায় বা শ্রাদ্ধশান্তিতে এতটুকু একটুও খুঁৎ কখনও সইতে পারত না—আর তেমনি কি রাশভারি! কাছে ঘেঁষে কার সাধ্য, যেন সেই সেকালের 'দুর্ব্বাসা ঋষি'!"—অধ্যাপকের রোগবৃদ্ধি ও মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার ছাত্রদল ও রাজনগরের অধিবাসিগণের ভিতর বিষম কৌতূহল ও উৎকণ্ঠার কাল গিয়াছে। তিনি কাহাকে মন্দিরের পুরোহিত ও টোলের অধ্যাপক নির্ব্বাচন করিয়া যান, ইহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়াছিল। যদিও চতুষ্পাঠীর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথের নিয়োগ সম্বন্ধে সকলেই এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিল, তথাপি একটা ক্ষীণ আশা সকলকেই মনে মনে একটু উৎকণ্ঠিত করিতে বুঝি ছাড়ে নাই।

অধ্যাপকের মৃত্যুর দু-একদিন পূর্ব্বে দেশের জমিদার দুইজন ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সহিত কি কথা-বার্ত্তা কহিলেন ও কয়েকটা কি লিখিয়া তাহার নিম্নে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া সেইখানে বসিয়াই তাঁহারা

নিজ নিজ নাম সহি করিলেন। সঙ্গী দুইজনের মধ্যে একজন জমিদারের পারিবারিক উকিল, অপর জন তাহার মুহুরী। তাহারাও তাহাদের যথা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল। গৃহে তখন আর কেহ উপস্থিত ছিল না—কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হয় নাই। জানালার বাহিরে দু-একটি ছেলে পা টিপিয়া আড়ি পাতিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রোগীর শয্যা জানালা হইতে দূরে থাকা প্রযুক্ত ভিতরের পরামর্শ কেহই কিছু জানিতে পারিল না। তাই সকলেরই মনের ভিতর বিষম একটা উৎকণ্ঠা জাগিয়া রহিল। যথাকালে অর্থাৎ অধ্যাপকের মৃত্যুর পর এ বিষয়ে সংবাদ পাওয়া গেল—সে সংবাদটা সকলেরই নিকট একটু অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল—তাই এই ;—স্বর্গীয় অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার স্বল্পদিনের ছাত্র অম্বরনাথকে সমস্ত উত্তরাধিকারটুকু দিয়া গিয়াছেন। সে-ই এখন মন্দিরের পুরোহিত এবং ছাত্রদিগের পরম পূজ্য অধ্যাপকও সে। গভীর বিরক্তিতে একসঙ্গে চতুষ্পাঠীস্থিত ছাত্রবৃন্দের সব কয়টি ললাট একসঙ্গে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। যে এতদিন ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছে, প্রয়োজন হইলে দু-দশটা গালি দিয়া মনের ঝাল মিটাইয়া লইলেও যে কখনও প্রতিবাদটি পর্য্যন্ত করে নাই, সেই অম্বরনাথ আজ হইতে তাহাদের অধ্যাপক হইল—গুরু হইল! এখন হইতে তাহারা সবাই তাহার হুকুম তামিল করিবে? তাহার পায়ে ফুল চন্দন দিয়া পূজা করিবে? অসম্ভব—ছাত্রগণ জোট বাঁধিয়া জমিদারের নিকট অনুযোগ করিল; বলিল, "ও দুদিনের ছেলে—তার ন্যায়-শাস্ত্রের পড়াশুনা বেশীদূর ওর অগ্রসরও হয় নাই, এই ত সেদিন মাত্র এখানে আসিল, উহার দ্বারা কি কখন ছাত্র-অধ্যাপনা চলিতে পারে? এই নির্ব্বাচন অযৌক্তিক হইয়াছে; এক্ষণে আপনি আমাদের মধ্য হইতে অপর কোন যোগ্যতর ছাত্রকে পুনর্মনোনয়ন করুন।"

জমিদারের এ প্রস্তাব অনুমোদন করিবার সাধ্য ছিল না। তাঁহার নিজের কাছেও এ প্রস্তাব সমীচীন ঠেকিলেও তিনি সেই জন্য ইচ্ছাসত্ত্বেও ছাত্রদিগের বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না। নিজের ক্ষমতার কথা বুঝাইয়া বলিলে, ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ ছাত্রের দল, মনের মধ্যে গুমরাইতে গুমরাইতে আবার নিজ স্থানেই ফিরিয়া গেল।

গুরু কর্ত্তৃক অম্বরনাথের পদোন্নতিতে অপর সকলে যতটুকু বিরক্ত হইয়াছিল, সে নিজে এই ঘটনায় তদপেক্ষা কিছুমাত্র স্বল্প ক্ষুব্ধ হয় নাই। সংবাদটা শুনিয়াই সে কিছুক্ষণ নীরবে চালের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দড়ির আন্‌লা হইতে ময়লা চাদরখানা টানিয়া কাঁধে ফেলিয়া লঘুপদক্ষেপে নদীতীরে গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেন এমন হইল? নিজেকে বাড়াইবার ইচ্ছা ত তাহার মনে এক নিমেষের জন্যও কোন দিন স্থান পায় নাই, তবে কেন এমনটা হইল? যাহারা এতদিন আশা করিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের সে আশাতরুর মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সে তাহাদের কতই না ক্ষোভের কারণ হইয়াছে? তাহাদের জীবনের মাঝখানে সে এমন অতর্কিত দুর্গ্রহের মত কোথা হইতে সহসা আসিয়া পড়িয়া উহাদের চির-পোষিত আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করিয়া দিল! এমন হইল কেন?

জমিদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে থাকে। অথচ দেখা না করিলেও নয়। দুই-চারিদিন যাই যাই করিয়াও সেখানে যাইতে পারিল না। শেষে অধ্যাপকের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেলে, কর্ম্মভার গ্রহণ করিবার পর, একদিন সে পূজা-শেষে দেবনির্ম্মাল্য লইয়া জমিদার-দর্শনে গমন করিল। জমিদার তখন একাই ছিলেন। ভৃত্যকে আসন আনিবার আদেশ প্রদান করিয়া তিনি বিস্মিতনেত্রে নূতন পুরোহিতকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গৌরবর্ণ, প্রশস্তললাট, দিব্য

আয়তনেত্র, নম্র সুন্দর মূর্ত্তিখানি ব্রাহ্মণোচিত প্রতিভায় বিমণ্ডিত। সে মূর্ত্তি দেখিলে মনে বেশ একটু শ্রদ্ধার ভাবই উদিত হয়, কিন্তু মহা সম্মানিত অধ্যাপক-পদে সমাসীন হইবার পক্ষে বয়সটা এখনও যেন নিতান্ত কাঁচা, এ ত্রুটিটা চোখে না ঠেকিয়া পার পায় না। বৃদ্ধ অধ্যাপক কেনই যে এই তরুণবয়স্ক যুবকটিকে অধ্যাপক ও পুরোহিতপদে বৃত করিয়া গেলেন ইহার রহস্য বুঝিয়া উঠা কঠিন।

আসন গ্রহণ করিয়া অম্বর সসঙ্কোচে বলিল, "আমার দ্বারা এই সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে বলিয়া আমার মনে ভরসা হয় না। আমায় না দিয়া এই কার্য্যভার আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অপর কোন যোগ্যতর হস্তে প্রদান করুন।"

জমিদার বলিলেন, "কিন্তু তোমার গুরু তাঁর অতগুলি ছাত্রের মধ্য হইতে তোমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করিয়াই ত এই গুরুভার তোমারই উপর দিয়া গিয়াছেন। তবে কি তিনি ভুল করিয়াছেন?"

অম্বর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল। তারপর সে উত্তর করিল, "তাঁর ভুল হওয়া সম্ভব, একথা আমি মনে করিতেই পারি না। হয় ত আমিই আমার নিজের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু এ দায়িত্ব গ্রহণে আমি যখন নিজেই ভীত হইতেছি, তখন আপনি এ ভার আমার নিকট হইতে লইয়া ইহা অপর কাহাকেও দিন।"

এই বলিয়া সে উঠিতে উদ্যত হইলে, জমিদার মহাশয় কিছু বিস্মিত হইয়া তাহাকে পুনশ্চ বসিতে বলিয়া, এই নির্ব্বাচন-সম্বন্ধীয় প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। পরিশেষে বলিলেন, "তুমি ছাড়িতে চাহিলেও এক্ষণে তোমায় নিষ্কৃতি দিবার ক্ষমতা আমার নাই! যদি সাধারণ সকলেই তোমাকে পৌরোহিত্য বা অধ্যাপনাকার্য্যে অসমর্থ বলিয়া মত প্রকাশ করে, তবেই আমি ভবিষ্যতে তোমায় পদচ্যুত করিতে পারি, এ ব্যতীত

নয়।" পরে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "যদি এ কার্য্যভার লইতে একান্তই অনিচ্ছুক থাক, তবে কাজে ত্রুটি দেখাও। তোমার দোষ ধরিবার লোকের অভাব হইবে না।"

অম্বরনাথ এই কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার সেই প্রশান্ত দৃষ্টিসংযুক্ত সুবৃহৎ চক্ষু দুইটি মুহূর্ত্তের জন্য ঈষৎ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল, জমিদারকে নমস্কার করিয়া সে ঈষদ্দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "স্বেচ্ছায় আমি কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত্রুটি করিতে পারিব না। সে উপায়ে মুক্তি আমার অভিপ্রেত নহে। গুরুর আদেশই তবে শিরোধার্য্য করিলাম।"

ইহার পরদিন প্রভাতে সে এই মনেই নিজের সমুদয় কর্ত্তব্যভার মস্তকে তুলিয়া লইতে গেল, কিন্তু তাহা তাহার মাথার উপরে ঠিকভাবে বসিল না। চতুষ্পাঠীর স্বল্পাবশিষ্ট ছাত্রেরা মুখ অন্ধকার করিয়া পুস্তক খুলিয়া বসিল বটে, কিন্তু তাহাদের কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া মুখ বিবরেই সাঁটিয়া রহিল—স্বর বাহির হইল না। আশুনাথ সদলবলে ইহার ঠিক পূর্ব্ব রাত্রে টোলবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।

তাহাদের মনোভাব বুঝিতে অম্বরেরও কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না, সে নিজেই যে মনে মনে নিজের ও তাহাদের জন্য লজ্জাবোধ করিতেছিল তাই সে কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া গেল এবং অধ্যাপকের জীবিতকালের ছাত্র অম্বরেরই ন্যায়, ভাণ্ডারের দরজা খুলিয়া কাঠায় করিয়া চাল মাপিতে লাগিল, তারপর রান্নাঘরে গিয়া নীরবে জলন্তচুলার উপরে পাঁচসেরি ভাতের হাঁড়িটা চাপাইয়া দিয়া চাল ধুইতে বসিয়া গেল। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া কেহ লজ্জায় মাথা নত করিল, কাহারও বা অধরপ্রান্ত ঈষৎ হাস্যে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে হাসি নিতান্তই অবজ্ঞার—অর্থাৎ কিনা মেছুনী রাজরাণী হইলেও স্বভাবজাত মৎস্যগন্ধ-প্রিয়তা ত্যাগ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজনগর গ্রামের বাজার হাট নদীতীর হইতে ন্যূনাধিক আধক্রোশ দূরে অবস্থিত। জমিদারবাটী হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটি অনতিপ্রশস্ত পথ দুই পার্শ্বের ঘনসন্নিবিষ্ট আম্র, পনস ও অশ্বত্থ বৃক্ষের শীতল ছায়াতলে দীর্ঘকায় অজগরের ন্যায় নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করিতেছে। হাটের দিনে পশারী পশারিণীগণ বোঝা মাথায় হাত দোলাইয়া এই রাস্তা দিয়া পণ্যশালায় গিয়া পঁহুছিত। শস্যের বোঝার উপর বসিয়া গো-শকটের আরোহী অতি মন্থর-গতি বাহনদ্বয়ের প্রতি অত্যন্ত কটুভাষা প্রয়োগ করিতে করিতে সাতক্রোশ দূরে রেলওয়ে ষ্টেশনের অভিমুখে প্রস্থান করিত। আবার কখনও কখনও দ্বিতীয় একখানা তদবস্থ যানের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় টক্ টক্ হেই হেই শব্দে ও চালকদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি কটুবাক্য-প্রয়োগে সে পথ মুখরিত হইয়া উঠিত।

এই পথের দুইধারে রাজনগর গ্রাম সংস্থাপিত। গ্রামের মধ্যেই দুই-দশ ঘর বর্দ্ধিষ্ণু লোক ভিন্ন অধিকাংশই দরিদ্র ও সাধারণ গৃহস্থের বাস। সুতরাং গ্রামে কোঠাঘর অপেক্ষা চালাঘরের সংখ্যাই বেশী।

তথাপি গ্রামখানির মধ্যে জননী কমলার কৃপাদৃষ্টির বেশ একটু চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। অধিবাসিগণের সকলেরই প্রায় গৃহসংলগ্ন দুই-চারি বিঘা জমি ফলটা ফুলটা উৎপাদন করিয়া গৃহস্থের গৃহসৌষ্ঠবসাধন ও অভাব বিদূরিত করিত। গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন গৃহাঙ্গনের একটি ধারে মরাই বাঁধা নাই, এমন লক্ষ্মীছাড়ার ঘর এ গ্রামে দেখাই যায় না। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধবতী গাভী, হলবাহী বলদ, কমলার বরপুত্র গৃহপালিত কপোতের ঝাঁকও প্রায় সকল গৃহে দৃষ্ট হইত। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলেই রাজনগরের

বাজার। এইখানেই প্রকাণ্ড আটচালার ভিতর বৃহস্পতি ও রবিবারে হাট বসে। হাটের দিন নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। কারণ এ অঞ্চলের মধ্যে রাজনগরই কলিকাতা সহরের সমতুল্য। এখানের অশন-বসনে আট-দশটা গ্রামের লোক প্রতিপালিত হয়। এই বাজারের পাশেই একটি আটচালায় গ্রামের পাঠশালায় একটি মিঠেকড়া গোছের গুরুমহাশয় প্রাণপণ শক্তিতে গ্রামের অধিকাংশ ভাল-মন্দ ছেলে লইয়া মহা কোলাহলে বিদ্যাদানরূপ মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বারোয়ারিতলা, চড়কতলা, রথতলা, নূতন মাইনর স্কুল ইত্যাদি ক্রমশঃ রাস্তার উভয়দিকে অবস্থিতি করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে।

এই বাজারের ভিতরে পাঠশালার ঠিক সম্মুখে একখানি একতালা পাকাবাড়ীতে আদ্যনাথের বহুদূরসম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা বাস করিতেন। আদ্যনাথ চতুষ্পাঠী ছাড়িয়া এখন তাঁহারই স্কন্ধে ভর করিয়াছিল। তাহার এই জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাতপুত্রের নাম বৃন্দাবনচন্দ্র। বৃন্দাবন দেশের মধ্যে নিরীহ স্বভাবের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। এই সঙ্গে আরও একটা সু বা অখ্যাতি লাভ তাহার ঘটিয়াছিল, তাহা তাহার অসাধারণ পত্নীপ্রেমিকতা। তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তুলসীমঞ্জরী এমন কিছু মন্দ মানুষ নহে, তথাপি বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা বলিয়াই হউক, অথবা নিন্দুকের স্বভাবের গুণেই হউক বার্দ্ধক্যের সীমায় পদার্পণোদ্যত স্বামীর উপর তাহার যে একটা অতিরিক্ত আধিপত্য আছে, এই কথাটা ক্রমে ক্রমে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। লোকে বলিত, সে নাকি তাহার স্বামীকে এক হাটে বেচিতে এবং অপর হাটে কিনিতেও সক্ষম। এমন কি লোকের এ বিশ্বাস এতদূর দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল যে, স্বভাবসঙ্কুচিত বৃন্দাবনের দ্বারা জগতের বড় কাজ কিছু

তো হওয়া সম্ভবই নহে; সামান্য কোন একটা কার্য্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে হইলেও তাহার পত্নীর নিকট বাড়ীর মেয়েদের পাঠাইয়া অনুরোধ করাইত। তুলসীর বিশ্বাস, সে তাহার স্বামীকে চিরনিয়মানুযায়ী বৃদ্ধ-তরুণী সম্পর্কে সম্পর্কিত করে নাই। কিন্তু কতকগুলি লোক আছে, তাহাদের চেষ্টা করিয়া বশ করিতে হয় না। তাহারা আপনা হইতেই কোন্ সময় বশ হইয়াই বসিয়া থাকে। বৃন্দাবনের স্বভাবটাও ঠিক এই শ্রেণীর। কাজেই তুলসী আর কি করিবে? তা ছাড়া ক্ষমতাগর্ব্বে নিজেকে একটুখানি গৌরবান্বিত বোধ করা মানুষ মাত্রেরই স্বভাবধর্ম্ম—মঞ্জরী ত সামান্য নারী।

আঙ্গিনাটি লেপা পোঁছা। তাহার ঠিক মধ্যস্থলে ইষ্টকে গাঁথা একটি অনতিউচ্চ তুলসীমঞ্চ। মঞ্চের চারিধারে বাঁখারী বাঁধিয়া ফুটা হাঁড়ি ঝুলাইয়া 'ঝারা' দেওয়া হইয়াছিল। সন্ধ্যা হয় হয়, মঞ্জরী একখানি পিতল থালাতে একঠোঙ্গা বাতাসা ও একটি জ্বলন্ত প্রদীপ হস্তে লইয়া তুলসী-তলায় দীপদান করিতে আসিতেছিল। এমন সময় আগুনাথ ডাকিল, "বৌদিদি।"

"কি বল্‌চো গা ঠাকুরপো?" বলিতে বলিতে মঞ্জরী মস্তকচ্যুত তসর শাড়ির একটা অংশ তুলিয়া যথাস্থানে স্থাপনান্তে মুখ ফিরাইল, কহিল, "এস না। আহ্নিকের জায়গা করে দেব?"

আগুনাথ বলিল, "জায়গা—না—হ্যাঁ, তা দেবে দাও। তা সেজন্য নয়, অন্য একটা কথা ছিল। তা থাক্, অন্য সময় বল্‌ব না হয়।"

দুইটি কৌতূহলী চক্ষু দেবরের মুখের উপর সোৎসুক্যে স্থাপন করিয়া তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য সময় কেন? এখনই বল না—কি বল্‌বে। না—না, সে হবে না—ও কি ভাই, আধখানা বলে এখন কথা চাপা দিচ্চো কেন? হ্যাঁ—আধকপালে ধ'রে মরি আর কি!"

তুলসীমঞ্জরী পূর্ণবয়স্কা যুবতী। হাস্যে, রহস্যে, কৌতুকে, কৌতূহলে তাহার সারাপ্রাণ বর্ষার পরিপূর্ণ নদীটির মত ছল ছল করিতেছিল, ভিতরে বাহিরে একটা সঘন হিল্লোল মৃদু বাতাসেই বহিয়া যাইত। দেবর আদ্যনাথকে সে মুক্তি দিল না, জানালার উপর হইতে একখানা আসন পাড়িয়া তাহাকে বসিতে আমন্ত্রণ করিল এবং নিজে অদূরে মাটি চাপিয়া বসিয়া জিদ ধরিয়া আবার কহিল, "কি বল্‌বে, বল না।"

আদ্যনাথ কহিল, "কথা এমন কিছুই না। দাদা ত এক রকম হয়ে গেছেন, একটা যুক্তি পরামর্শও তাঁর কাছে পাবার আশা দেখি নে। তা বুদ্ধি শুদ্ধি পুরুষের চেয়েও তোমার দেখতে পাই ঢের বেশী। তাই তোমার কাছেই একটা পরামর্শ চাইব মনে কর্‌ছিলাম। তোমাকে আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হবে।"

মঞ্জরী মুখ নত করিল, তাহার বুদ্ধির প্রশংসাগানে সে একটু প্রীত হইয়াছিল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার স্বামীর প্রতি দোষারোপটাও সে মনে মনে অপছন্দ করে নাই, কারণ তাঁহার যে দোষের কথা বলা হইল, ওই নির্ব্বিরোধী ভালমানুষীর জন্যই সে তাহার অপেক্ষা আড়াই গুণ অধিক বয়স্ক স্বামীকে মনের সঙ্গেই ভালবাসে এবং ভক্তি করে। কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া মৃদুহাস্যে কহিল, "মেয়ে মানুষের আবার বুদ্ধি! হা রে পোড়ার দশা! মুখ্যু সুখ্যু লোকেদের বুদ্ধি থাক্‌লেই বা কি, আর না থাক্‌লেই বা কি? তা তোমার কি কাজটাই বল না, শুনেই না হয় রাখি—কিছু কর্‌তে পারি আর নাই পারি।

আদ্যনাথ নিজের মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। সম্পূর্ণ অবিচার করিয়া গুরু তাহার ন্যায্য পাওনা অম্বরকে দান করিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার মাথার ঠিক ছিল না, সেই জন্যই এরূপ অঘটন ঘটিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে সে আদালতে প্রমাণ করিতে পারিবে না, আর

করিলেই বা তাহার কথা মানিবে কে? কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহার "হকের ধন" অন্যে লুটিয়া খাইবে, ইহাও যে একেবারেই অসহ্য। কোথাকার কে একটা ছোঁড়া, যাহার গলা টিপিয়া ধরিলে আজিও মাতৃ-দুগ্ধ নির্গত হয়—সে না জানে শাস্ত্রার্থ, না সে পূজাপদ্ধতিতে অভ্যস্ত। এতবড় একটা গুরুভার যে তাহাকে দেওয়া হইল, ইহাতে এদেশের কাহারও মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি? সংসারে ঘোরতর কলি ও অরাজকতার কাল উপস্থিত। শীঘ্রই যে সমস্ত দেশটাই উৎসন্ন যাইবে, ইহা নিঃসন্দেহ সত্য! জমিদারের শুদ্ধ মতিভ্রম হইয়াছে, তাই এ ভুলের সংশোধন হইল না। এ অনাচার আর যাহার-খুসী সে স্বীকার করিয়া লউক, কিন্তু আত্মনাথ খাঁটি মানুষ, সে এতবড় অবিচার কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। বরং সে না খাইয়া মরিয়া যাইবে, তথাপি সেই হতভাগা অম্বুরে-ছোঁড়াটার তাঁবেদারী করিবে না—করিবে না—করিবে না—ইহার জন্য সে আর সবই করিতে প্রস্তুত।

সকল কথা শোনা হইয়া গেলে মঞ্জরী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় তুমি কি কর্‌তে বল?"

আত্মনাথ তাহার দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়াছিল, তাহার এই ধীর প্রশ্নে সে কিছু বিরক্তি বোধ করিল; অল্প ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, "কি কর্‌তে হবে, তাই যদি স্থির কর্‌তে পার্‌ব, তবে নিজেই ত অনায়াসে করে নিতে পার্‌তাম; তোমার কাছে তা হলে পরামর্শ চাইব কেন?"

তাহার ক্রোধ বুঝিয়া মঞ্জরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমার পরামর্শ! মনে আছে ঠাকুরপো, তুমিই না একদিন বলেছিলে, 'স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী'!"

"আহা, তাই মনে করে বুঝি অভিমান করে বসে আছ? রাম বল!

সে একটা এমনি কথার কথা ! সত্যি কি আর বলেছিলাম ? তোমরা এতও কথা ধর্ত্তে পার ! আচ্ছা, তোমার সঙ্গে জমিদার বাড়ীর মেয়েদের জানাশুনা আছে না ?”

তুলসী তাহার হাস্যময় চোখের সচঞ্চল তারকা পূর্ণভাবে প্রশ্নকর্ত্তার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, “তা আর নেই, খুব আছে। কেন ?”

আম্বনাথ একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, পরে বলিল, “শুনেচি, জমিদারবাবুর মেয়ে খুব ধর্ম্মপরায়ণা। তাকে যদি এ বিষয়—”

মঞ্জরী সহসা দুই চোখ বিস্তৃত করিয়া ঘৃণাপূর্ণ অনুযোগের সহিত বলিল, “কি ! আমি তোমার অম্বরনাথের নামে তাঁর কাছে লাগাতে যাব ?”

আম্বনাথের মুখ এতটুকু হইয়া গেল। কোন পুরুষমানুষ এমন স্বরে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিলে, তৎক্ষণাৎ সে আসন হইতে উঠিয়া তাহার দুই গণ্ডে দুইটি চপেটাঘাত না করিয়া ছাড়িত না। কিন্তু মঞ্জরী একে স্ত্রীলোক, তাহাতে সে মঞ্জরী, তাহার উপর রাগ করিবার কারণ বর্ত্তমান থাকিলে, সহসা রাগ করা যায় না। আত্মসংবরণ করিবার জন্য নতনেত্রে বলিল, “ঠিক তা নয়, তার নামে কুৎসা করবার দরকার হবে না। সত্যই সে পুরুত হবার যোগ্য নয়, তা সে কথা বলায় মিথ্যা বলা হবে না ত—এতে আর দোষ কি ?”

বিরক্তি গোপন করিয়া মৃদু হাসিয়া মঞ্জরী কহিল, “দোষ বিলক্ষণ ! কে না বুঝবে, তুমি আমার আপনার জন—তোমার জন্যই আমরা নতুন পুরুতের নামে কুৎসা রটনা কর্‌চি।” আম্বনাথের ললাটের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, হঠাৎ মঞ্জরী কথার সুর বদলাইল, বলিয়া উঠিল, “তবে এ কথাও তোমায় বল্‌চি আমি, যদি তোমাদের অম্বরনাথ সত্যসত্যই অজ্ঞ হয়, তা হলে তাকে বেশীদিন পুরুতগিরি কর্‌তে হবে না।

তোমার চোখের চেয়ে আরও দুটো শক্ত চোখ সেখানে তার কাজের উপর চৌকি দিচ্চে। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।"

আত্মনাথের হতাশামিশ্রিত ক্রোধের দৃষ্টি শীতল হইয়া আসিল, সে একান্ত ঔৎসুক্যে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কে? কে? কার চোখ?"

"কেন, জমিদারবাবুর মেয়ে রাধারাণী—তার কাছে এতটুকু ফাঁকি চল্‌বে না।" শ্রোতার দুই উৎসুক নেত্রে আশার আলো দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল "তবে তুমি একবার খবরটা নিও। লক্ষ্মীটি বৌদি, আমার কাজটি একটু মন দিয়ে করে দাও দেখি। তোমার একেবারে চিরকেলে কেনা দাস হয়ে থাক্‌বো।"

"আচ্ছা—দেখা যাবে কি না।"

"আমি তা হলে এখন এখানেই দু-চারটে ছেলে যোগাড় করে একটা টোল খুলে বসি, কি বল? নেহাৎ ওকে না তাড়াতে পারি, ওর চতুষ্পাঠিটাও ত ভাঙ্গব। দেখি, ও কেমন করে পণ্ডিতী করে খায়। অম্‌নি আমি ছাড়্‌চি নে। হ্যাঁ, বলে, 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই!' কোথায় ছিলি রে ব্যাটা এতদিন? আমি যে এই আশা করে আজ সাত সাত বচ্ছর ধরে এই দোর কাম্‌ড়ে পড়ে আছি।"

অনুপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি আত্মনাথের ক্রোধোত্তেজনা দেখিয়া মঞ্জরী মুখ টিপিয়া অলক্ষ্যে ঈষৎ হাসিল এবং উহা গোপনার্থ সন্ধ্যাপ্রদীপ ও হরির শীতল দ্রব্য লইয়া উঠিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অম্বরনাথ যে মন্দিরে পূজা করিতে যাইত, সেখানে সুবর্ণ সিংহাসনে দুইটি স্বর্ণমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আরও একখানি প্রতিমাকে সে সেখানে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইত। দেব-বিগ্রহ অচল, কিন্তু মন্দিরবাসিনী এই তৃতীয় দেবীমূর্ত্তি সচলা ; ইঁহাদের সহিত এই মাত্র তাঁহার প্রভেদ।

প্রথম দিন সে যখন স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সমাপনান্তে গুরুর পরিত্যক্ত জীর্ণ গরদের জোড় পরিধান পূর্ব্বক পূজার আসনে আসিয়া বসিল, তখন একটা অননুভূতপূর্ব্ব গভীর বিস্ময়ে তাহার সমস্ত চিত্ত এককালে ভরিয়া উঠিয়া তাহাকে প্রায় অভিভূত করিয়া তুলিল! এ কি মন্দির? এই মন্দিরের দেবতার এ কি ঐশ্বর্য্য! কি সৌন্দর্য্য! সুপ্রশস্ত মর্ম্মর-নির্ম্মিত হর্ম্ম্য, প্রাচীরে পাথর কুঁদিয়া কাটিয়া রচিত সুন্দর চিত্র, জন্ম হইতে লয় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। উপর হইতে বহু বর্ত্তিকাযুক্ত রজতকান্তি স্ফটিক ঝাড় বিলম্বিত। রামধনুর আলোকরেখা রঙ্গীন কাচের মধ্য দিয়া সেই অমর লোকের মত গৃহমধ্যে বিস্তৃত হইয়া বহুবর্ণের সমাবেশ করিয়াছিল। কিংখাবের বিছানায় সুবৃহৎ মতির ঝালরযুক্ত জরিদার মশারিতে ঢাকা নাতিবৃহৎ সুবর্ণ পালঙ্কে সেই রৌদ্র ছায়া প্রতিহত হইয়া চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছিল, পূজার দ্রব্য-সম্ভারে তাহা ঝিকিমিকি করিতেছিল। সমস্তই মনোরম।

স্বর্ণ-রচিত পাত্রে পাত্রে নৈবেদ্য, মুক্তা-খচিত স্বর্ণ পাত্রে যত্নসজ্জিত সুগন্ধি তাম্বুল, সুবৃহৎ সুবর্ণ থালিপূর্ণ পুষ্প রাশি। বৃহদায়তন সুবর্ণ পুত্তলিকার হস্তধৃত ধূপ, দীপ, অগুরুর গন্ধে বাতাস আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধের অপূর্ব্ব সমাবেশ। অম্বর স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল। দূর্ব্বাদল, তুলসী, চন্দন,

কুঙ্কুম, উপচারের কোনখানে কোন ত্রুটি নাই। রাজসিক পূজার সাড়ম্বর ও সুন্দর আয়োজন! সে মনে যেন ঈষৎ ব্যথা অনুভব করিল। এই কি দেবমন্দির? এত সাজ, এত জাঁক, এত হীরা, মণি, মাণিক্য এ যেন বিলাসকুঞ্জেই শোভা পায়! সোণা রূপার এত ছড়াছড়ি, সাটিন কিংখাবের এত প্রচুরতা, সে তাহার জীবনে এই প্রথমবার প্রত্যক্ষ করিল। কিন্তু এই দেবৈশ্বর্য্যের বিস্ময়-জনক আবির্ভাব তাহাকে স্তম্ভিত ভিন্ন আদৌ মুগ্ধ করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তাহার বিস্ফারিত দৃষ্টিতলে যে ছায়া সঘন কালো মেঘের বাপীতলস্থ ছায়ার মত নিঃশব্দে ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে বিদ্যুতের চকিতস্ফুরণমাত্র ছিল না, শুধুই ভারাক্রান্ত চিত্তের বিপুল বেদনাভার নিহিত ছিল। পূজা শেষে বাহিরে আসিয়া সে মৃদুশ্বাসে ভিতরের পানে বারেক চাহিয়া দেখিয়া চিন্তিতমুখে চলিয়া আসিল।

হায় দেবতা! তোমার দ্বারের বাহিরে কত দৈন্য, কত হাহাকার! আর তোমার অঙ্গে এই লক্ষাধিক মুদ্রার মণিরত্ন জ্বলিতেছে! দেবতার নামে মানবের একি মর্ম্মভেদী পরিহাস, একি—লজ্জাকর পুতুলখেলা। এ ত আরাধনা নয়; এ যে দেবতার অপমান!

বাহিরে বাহিরে একটু খানি ঘুরিয়া টোল বাড়ীর সম্মুখীন হইবামাত্র সে দেখিল, আদ্যনাথ ছেলেদের সহিত চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। সে আর অগ্রসর হইল না, কারণ সে জানিত, দুর্ভাগ্যক্রমে এই যুবকটির সহিত তাহার বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে। আদ্যনাথ তাহার প্রতি অত্যন্তই বিমুখ হইয়া আছে। হয় ত তাহাকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিলে হ্রাস না হইয়া সে বিরক্তি বাড়িয়াই উঠিবে। সসঙ্কোচে তাই সে সরিয়া আসিল।

রৌদ্রোজ্জ্বলা ধরণীর অঙ্গে বিচিত্র শ্যামাঞ্চল প্রভাত-পবনে মৃদু বিকম্পিত হইতেছে। সৌখীনা নারীর বসনাঞ্চল-বিকীর্ণ পুষ্পসার

সৌরভের মত বিবিধ ফুলের মিশ্র সুবাস বহন করিয়া আনিয়া বাতাস চারিদিকে তাহা ছড়াইয়া দিতেছিল। তীব্র উজ্জ্বলতায় আকাশের নীলিমাগায়ে শুভ্র মেঘে অ্যাসিটিলিনের শাদা আলোর মত রং ফুটিয়াছে। নদীর জলে সূর্য্যের ছায়া চূর্ণ-হীরকের ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিয়া তরঙ্গের সঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছিল। পরাণ কৈবর্ত্ত জাল গুটাইয়া নদীর কিনারায় ডিঙ্গির খোল হইতে আহৃত মৎস্য, মৎস্যগন্ধযুক্ত পুরাতন ডালাখানিতে সযত্নে সজ্জিত করিতেছিল। ভূমিতে পড়িয়া সে অম্বরকে প্রণাম করিল—"দণ্ডবৎ হইগো, দাদাঠাকুর, তুমি এখন 'পুৎমশাই' হয়েচেন শুন্‌লুম, তা বেশ হয়েচেন।"

অম্বর তাহার পরিচিত—শুধু পরিচিত নয়, উভয়ের মধ্যে বেশ একটু ঘনিষ্ঠতাও ছিল। মধ্যে মধ্যে নদীতীরে দুইজনে দেখাসাক্ষাৎ হইত। একদিন সে পরাণের ছোট মেয়ে আদুরীকে তাহাদের দগ্ধপ্রায় গৃহের অগ্নিরাশির মধ্য হইতে রক্ষা করিয়াছিল, সেই অবধি পরাণ ও তাহার পরিবারবর্গ পথে ঘাটে এই উপকারী যুবকটীকে দেখিলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিত। প্রথম প্রথম কিছুদিন সে দাদাঠাকুরের জন্য নিজের গভীর কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সামান্য ফলটা পাকোড়টা, যেখানে যেটি পাইত, লইয়া আসিয়া—তাহার মৃদু ভর্ৎসনার উত্তরে শুধু একটু হাসিয়া—রাখিয়া যাইত ; বাহিরে আসিয়া বলিত, "দাদাঠাকুর ত একটা দ্যাবতা ! এমন মনিষ্যি পিরথিমিতে আর জন্মায় নি !" কিন্তু বেশি দিন এই আদান প্রদান কার্য্য চলিল না। অম্বরনাথের সহিত পরাণ কৈবর্ত্তের এতটা মাখামাখি শীঘ্রই টোলের ছেলেদের চিত্তাকর্ষণ করিল। অনাচারে একান্ত অসহিষ্ণু আদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি জেলের দান নিচ্চ ?" অম্বর এই প্রশ্নটার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না। এ রকম একটা জবাবদিহি যে থাকিতে পারে, ইহা সে কোন দিন সন্দেহও করে নাই। ঈষচ্চকিত

হইয়া উত্তর করিল, "দান! না—হ্যাঁ। তা সে বারণ করলেও যে শোনে না—দিয়ে বড়ই সুখী হয়।"

আত্মনাথ ঠোঁট টিপিয়া ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হাসিল, দলের ছেলেদের চোখেও একটা অবিশ্বাসের সাঙ্কেতিক হাস্য দেখা গেল। আত্মনাথ বলিল, "গরীব লোক নিজেই খেতে পায় না, সে আবার দিয়ে সুখী হয়—হ্যাঁ! তা সে ত কথা নয়, তুমি কেমন করে শূদ্রের প্রতিগ্রহ কর? এতে ত শূদ্র-যাজী পতিত ব্রাহ্মণ হ'য়ে যাবে। বিশেষ এখন তোমার পাঠ্যাবস্থা—ব্রহ্মচর্য্যের কাল। তাতে আবার সকলকে তোমার হাতে খেতে হয়।"

অম্বর কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, মাটির দিকে চোখ নামাইয়া মৃদুস্বরে সে বলিল, "দান ঠিক নয়, ওটা উপহার।" আত্মনাথ এবার আর মুচকিয়া নয়, হা হা করিয়া উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল, "ঠিক্, ঠিক্—বামুনের ছেলে কৈবর্ত্ত জেলের কাছে উপহার পায়। তা মন্দ কি? হা-হা-হা কালে কালে আরও কত দেখ্‌তে হবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ।" সঙ্গিগণও সেই অট্ট-হাসিতে যোগদান করিল—যাহাদের হাসি আদৌ আসিতেছিল না, তাহারাও দলপতির খাতিরে 'হোঃ হোঃ' 'হুঃ হুঃ' প্রভৃতি একপ্রকার বিকট শব্দ করিয়া উঠিল। অম্বর অপ্রতিভের একশেষ হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। সংসারে সর্ব্বত্রই মিলিত শক্তির জয় হইয়া থাকে। আর আমরাও অনেক সময় মানুষের উদ্দেশ্য না দেখিয়া দলে মিশিয়া পড়ি।

এ ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল না। এই ঘটনার পরদিন যখন পরাণ একটী নবজাত কচি কাঁটাল লইয়া কুণ্ঠিত চরণে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া বলিল, "নূতন দ্রিব্যি, ও পারথে, নিয়ে এনুগো দাঠাকুর! তারকারি বেনিয়ে খেও।" তখন অম্বরের বক্ষ একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া একবার সলজ্জভাবে বলিল, "এটা না

দিলে কি হয় না পরাণ? তুমি কিছু মনে করো না। গরীব মানুষ তুমি, রোজ রোজ তোমার জিনিষ আমি আর নিতে পারব না, লক্ষ্মীটি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।”

পরাণ ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে দাদাঠাকুরের মুখের দিকে চাহিল, জিভ কাটিয়া ত্রস্তে কহিল, “সেও কি একটা কথা হ’ল গা ঠাকুর? তোমার নামের ত্রিব্যি তোমায় না দিয়ে ফিরিয়ে নে যাব? তোমাদের কেরপায় পরাণে এতটা গরীব নয়। তার গতর সুখে থাক্, ডিঙ্গি, জাল যদি না টোটে ফাটে, ভাতের দুঃখ তার ছেলে ছাওয়ালে কক্ষনো পাবে না। ন্যাও মেনে, আর তোমার শাত্তর-মাত্তর বের করো না, কচি কাঁটালে একটু গরম মসলা দিও দিকি—ঠিক হুবোহু একেবারে পাঁটার মতন খেতে নাগবে। এর নামই হচ্ছে ‘গাছ-পাঁটা’। কি বল্‌ব, মাছ ত খাবে না, নৈলে গল্‌দা চিংড়িটে একবার পেট ভরে খাওয়াতুম।”

পরাণ পুনশ্চ ‘গড়’ করিয়া চলিয়া গেল। অম্বর আর কিছু বলিতে পারিল না। মানুষটার এত বড় দানের সুখে বাধা দিয়া নিজেকে ‘শুদ্ধ সত্ব’ রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে মনে মনে বলিল, “এতে যদি পাপ হয়, যেন আমারই হয়।” এঁচোড়টি কুটিয়া সে পরিপাটিরূপে রন্ধন করিল, এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদল খাইতে বসিলে সকলের পাতে তাহা পরিবেষণ করিয়া দিল। অধ্যাপক ডান্‌লার ঝোলটুকু টানিয়া ভাতের সঙ্গে মাখিতে মাখিতে হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, “আজ যে নূতন ব্যঞ্জন দেখছি—”

আদ্যনাথ সহসা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “খাবেন না, ও স্পর্শ করবেন না, ও ভস্ম—ও অখাদ্য।”

সকলেই এক সঙ্গে বিস্মিত হইয়া বক্তার দিকে ফিরিল। গুরু বলিলেন, “তোমার সকলই বাড়াবাড়ি—আদ্যনাথ, এমন সুন্দর বস্তু, তুমি বল ভস্ম, অখাদ্য! এ তোমার কিরূপ কথা?”

আগুনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "অম্বরনাথের জেলে বন্ধুর উপহার তিনি আনন্দের সঙ্গেই খেতে পারেন, কিন্তু আপনার ও আমাদের পক্ষে উহা শূদ্রের দান, 'ভস্ম' ভিন্ন আর বেশী কিছু নয়। তার উপর পাষণ্ড জেলের ছেলে, ইহাকে বৈষ্ণবের মুখে পর্য্যন্ত উচ্চারিত হতে পারে না, এমন একটা ভয়ানক বস্তুর সঙ্গে উপমিত করেছে! আপনার ছাত্রটি বোধ করি ব্রাহ্মণের অনুচিত কোন কর্ম্ম করতেই কুণ্ঠিত না হ'তে পারেন, কিন্তু সকলে তার জন্য পাপের ভাগী হ'ব কেন? শূদ্রের দান গ্রহণ ও তা ভোগ এ উভয়ই এক কথা। একথা আপনি অবশ্যই মানেন? আর কেউ যদি না-ও মানেন, আমি নিজে নিশ্চয়ই মানব।"

অধ্যাপকের মুখে ঘোর বিরক্তির চিহ্ন লক্ষিত হইল। তিনি বিরক্ত স্বরে অম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অম্বর, আগুনাথের কথা কি সত্য?"

কথা শুনিয়াই আগুনাথ তারস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "আগুনাথ কখনও কি কারও নিকট মিথ্যা বলেছে?"

অম্বর নতমুখে উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

"ভাল কর নাই, আর যেন এরূপ না হয়।"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া সে ডালের পাত্র হইতে হাতা ভর্ত্তি ডাল তুলিয়া একজন ভোক্তার পাতে প্রদান করিতে গেলে, আগুনাথ হাত নাড়িয়া কহিয়া উঠিল, "উহুঁ, উহুঁ, এসব ভাত নষ্ট হইয়াছে, অস্পৃশ্য দ্রব্য-সংস্পর্শ-জাত খাদ্য গুরুকে দিতে তোমার আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা জানিয়া, শুনিয়া এ মহাপাপের ভাগী হইতে পারি না। আবার ভাত চড়াইতে হইবে। এসব ফেলিয়া দাও।"

অম্বর নিরুত্তরে রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল। অধ্যাপক মহাশয়েরও এতটা ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু আগুনাথকে তিনিও মনে মনে একটু ভয় করিয়া চলিতেন। পাছে সে বাহিরে তাঁহার অনাচারের কথা রাষ্ট্র করে,

সেই ভয়ে ক্ষুধার অন্ন ত্যাগ করিয়া বিরক্তচিত্তে উঠিয়া পড়িলেন। এবং আচমনান্তে রাগ করিয়া 'যা, আজ আর পিণ্ড খাবার দরকার নাই' বলিয়া নিজের শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ছাত্রদের কাহারও আহার হইল না। আদ্যনাথকে সকলেই ভয় করিত। অম্বর লজ্জায় ক্ষোভে মরিয়া নূতন করিয়া ঘর পরিষ্কার করিয়া ও তারপর যতশীঘ্র সত্বর রান্না চাপাইয়া দিল। তাহার মর্ম্মাহত বেদনায় বিবর্ণ মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া, দম্ভভরে আদ্যনাথ তাহাকে শুনাইয়া সঙ্গীদের কাছে বলিল, "আমার সঙ্গে টেক্কা দেবেন উনি? হাঃ, এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব না!"

বলা বাহুল্য, পরাণের নিকট হইতে অতঃপর সওগাত গ্রহণ অম্বরনাথের পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং এই উপলক্ষে সত্য কথাটাও তাহাকে প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। পরাণ মূর্খ গোঁয়ার মানুষ—সে আগুন হইয়া উঠিয়া বলিল, "যাই দিকিন্ বিটেল বামুনের বামনাই ঝেড়ে দে' আসি ত। দাদাঠাকুর, তুমি যেমন ম্যাদামারা, ভালমানুষ! তাই তোমায় অমন নাহাক নাকাল করে মারে। তুমি বল্‌তে পারলে না যে, শূদ্র নৈলে ধান রোয় কারা? ফসল জন্মায় কোন্ ভট্‌চায্যিমশার বাড়ীতে। "শূদ্দুরের দান" নৈলে ভদ্দরলোক মশাদের যে নিজে হাতে কোদাল ধরতে হবে। ভদ্দর থাকবে কেমন করে?" অম্বর অনেক বুঝাইয়া তাহাকে সেবার শান্ত করিয়াছিল।

আজ পরাণ তাহার আকর্ণবিস্তৃত শুভ্র দন্ত পঙ্‌তি বাহির করিয়া তাহাকে যখন অভিনন্দন করিল, তখন সহসা অম্বরের নেত্র ঈষৎ সলিলার্দ্র হইয়া আসিল। মূর্খ জেলে সে, জানে না যে অম্বর আজ যে পদে উন্নীত হইয়াছে, সে পদের সে কতই না অনুপযুক্ত! যে ঘটনায় সমস্ত রাজনগর বাত্যান্দোলিত সেই অঘটনায় কাণ্ডটাকে এমন শান্তভাবে গ্রহণ করিতে

পারে—এমন্ নহিলে আর সে জেলের ঘরে জন্মিয়াছে কেন? একটুখানি শুষ্ক হাস্য তাহার অধরপ্রান্তে দেখা দিল। কথাটা উল্টাইয়া সে পরাণকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে, তোর ছেলে পিলে সব ভাল ত? আহ্লী ভাল আছে?"

পরাণ একগাল হাসিয়া বলিল, "আর দাদাঠাকুর, আপনার ছিরি-চরণের কেরপায় পারণ-গতিক সব এক পেরকার ভালুই যাচ্ছেন। গোটাকতক বিলিতি আমড়া রেকেচি, দাদাঠাকুর, ও বেলা তখন দে' আসব'খন। এখন তুমিই ত ভস্‌চায হয়েছ, আর ত কেউ তোমায় 'রা' করবে না?"

অম্বরনাথের চিত্তে ঈষৎ আঘাত লাগিল। অতিরিক্ত ক্ষমতার প্রয়োগ মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে এই রকমে উত্তেজিত করিয়া রাখে যে, সেই ক্ষমতা নিজ হস্তে প্রাপ্ত হইলেই একদিনের সেই পদ-দলিত বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে এতটুকুও বিলম্ব করিতে পারে না। সে বিষণ্ণমুখে কহিল, "না পরাণ, গুরুর কাছে যা একদিন স্বীকার করেছি, তা এ জন্মে আর ভাঙ্গতে পারব না। তুই কিছু মনে করিস্ নে বাপু।"

পরাণ কিছু দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমি আবার কি মনে করব দাদাঠাকুর? আমরা হলুম বোকা সোকা মুখ্যু মানুষ। তোমাদের যাতে ধম্মে দাগ পড়ে, তা কি তোমরা আমাদের জন্য কয়তে পার।"

সে ডিঙ্গির খোল হইতে মৎস্যোত্তোলনকার্য্যে মনযোগ প্রদান করিয়া নিজের মুখের উপরের বেদনার রেখাটুকু অম্বরনাথের নিকট হইতে গোপন করিবার চেষ্টায় বলিয়া উঠিল, "আজ দুটো হিলসে জালে পড়েচেন। আর এই দেখ না, পাতচিংড়ি—কলাপাতায় ভাগা দিয়ে পয়সা পাঁচেকে বিকিরি করলেও আকারা দেওয়া হবে না।"—অম্বর ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল।

নদীতীরে এদিকে কাহার ঘর বাড়ী নাই। যতদূর দৃষ্টি চলে মখমল

সবুজ তীরভূমে সুদূরবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র সীমায় বিবিধ ছায়াতরু ও লতা গুল্মের প্রকৃতি-রচিত চারুকুঞ্জবন। শস্যক্ষেত্রে ধান্য ফলিয়া উঠিতেছে; নবীন শীর্ষগুলি মন্দ বাতাসে ক্রীড়াশীল সুকুমার শিশুগুলির মতই নৃত্য করিতেছে। বাধাহীন বিস্তৃত মাঠে সুদূর সীমানায় কৃষকপল্লীর ছোট কুটীরগুলি অমল রৌদ্রস্নাত হইয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। এক স্থানে একটা পৌরাণিক বটবৃক্ষ জটাভার চারিদিকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া তপস্যা-পরায়ণ সন্ন্যাসীর মত দূর অনন্তে নিস্তব্ধ দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া অনন্তশক্তির ধারণায় নিবিষ্ট হইয়া আছে। তাহার পদতলে কত লতা, কত গুল্ম, কত তরু জন্মিল, কত সুখ দুঃখের অভিনয়স্মৃতি তাহার সবল বক্ষে মুদ্রিত করিয়া দিয়া কাল সমুদ্রের তরঙ্গ সঙ্গে মিশিয়া লয় হইয়া গেল। গতিশীল জগৎ নিজের গতিপথে অবাধ বিচরণ করিতেছে; প্রতিপদে সে জীবনের অনিত্যতার গান গাহিয়া চলিয়াছে। ইহার মাঝখানে নিত্য বস্তুর শরণাগত অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত জীবন্মুক্ত সাধকের মতই সে অটল অচল দণ্ডায়মান। কাল যেন তাহার কাছে ঘেঁসিতেও সাহস করে না।

অম্বরনাথ চিন্তিতহৃদয়ে এই বট মূলে আসিয়া দাঁড়াইল। গাছের উপর শালিক, দোয়েল, বুলবুলি আনন্দ কলরব করিতেছিল। কেহ রাঙ্গা ফলে ঠোকর দিতেছে, কেহ সন্তানের চঞ্চু মধ্যে চঞ্চু প্রবেশ করাইয়া আহার্য্য দান করিতেছে, কেহ কেবল গান গাহিয়া ডালে ডালে নাচিয়া বেড়াইতেছে, কোন পক্ষিদম্পতি অস্ফুট কূজনে সুখ-বিহ্বল—যেন এক বৃহৎ সমাজভুক্ত অস্থায়ী-ভাবাপন্ন সুখী পরিবার।

অম্বর চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে আজ পূজা করিতে গিয়া যাহা দেখিয়া আসিয়াছে, কিছুতেই সে দৃশ্য মন হইতে সরাইয়া ফেলিতেছে না। কেবলই তাহার ব্যাকুল চিত্তে

এই অমীমাংসিত প্রশ্ন উঠিতেছিল, "দেবতার নামে ঐ ঐশ্বর্য্যের খেলা কেন? ইহাতে কি দেবতা প্রসন্ন হইতেছেন?"

সেই ইন্দ্রপুরী-তুল্য দেবমন্দিরের ছবি ও সহরের ভিতরকার বুভুক্ষা পীড়িত দীনদরিদ্রের ভগ্নকুটীর তাহার মনোদর্পণে ফুটিয়া উঠিয়া পরস্পরের সহিত উপমিত করিতেছিল; আর তাহার হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। দেবমন্দিরে ঐ নৃপৈশ্বর্য্য, আর ওদিকে দারিদ্র্য রাক্ষসী কত মানব সন্তানের বক্ষঃশোণিত শুষিয়া পান করিতেছে। সেখানে কি তবে দেবতা নাই? হা নাথ! তুমি কি মন্দিরেশ্বর! বিশ্বেশ্বর কি তুমি নও?

বেলা বাড়িতেছিল। বৃক্ষপত্রের ব্যবধান-পথে প্রথম শরতের পীতাভ রৌদ্র, খণ্ড খণ্ড চন্দ্রকান্ত মণির মত জ্বলিতে আরম্ভ করিল। কৃষাণেরা মুড়ি মুড়কি খাওয়া শেষ করিয়া নদীর ঘাটে জলপান করিতে আসিয়া তাহাকে 'পেরণাম হইগো, ভস্‌চাযমশাই' বলিয়া কেহ সাষ্টাঙ্গে, কেহ কেবল মাত্র উত্তমাঙ্গ দ্বারা ভূমে প্রণাম রাখিয়া গেল। একজন কেবল একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "তুমি ভস্‌চায্যির জায়গা পেয়েচ বলে আত্তিঠাকুর বড্ড রেগেচে, বলেচে, 'দেখি কত সাত্তি যে আমার হক্কের ধন কেড়ে খায়, ওকে থানছাড়া, মানছাড়া করব, তবে আমার নাম আত্তিনাথ।' আমাদের এসব কথায় কাজ কি ঠাকুর! আদার ব্যাপারি জাহাজের খবর নিয়ে কি করবে, তবে কথাটা কানে শুনন্থ, তাই তোমায় জানিয়ে গেন্থ। হুঁষ চাঁক রেখো। ও সর্ব্বনেশে নোক, সব করতে পারে।"

শুনিয়া অম্বর শুধু একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিল। আত্তনাথের মনের দাহ যে এইরূপ দু-চারিটা স্ফুলিঙ্গবিস্তারি ক্রোধের ভিতরে আসিয়া পড়িবে, ইহাতে তাহার কিছুই বিস্ময় বোধ হইল না। তবে যাহার তাহার নিকট এইরূপ ধূমোদগীরণে সে যে নিজেকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছে, ইহা মনে করিয়া তাহার জন্য একটু লজ্জাও সে বোধ করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজনগরের জমিদার-গোষ্ঠি দান, ধ্যান, ক্রিয়াকলাপের জন্য যেরূপ দেশের ও দশের মুখপাত্র, অক্ষুণ্ণ কৌলীন্য-গৌরবেও সেইরূপই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর একটা বিশেষ কারণে তাঁহাদের নাম জনসাধারণের মধ্যে একটু বিশেষভাবেই আলোচিত হইয়া আসিতে-ছিল—সেটা তাঁহাদের বংশপরম্পরাগত বৈষ্ণবতন্ত্রের ও কৌলীন্যের অত্যধিক গোঁড়ামী।

জমিদারবংশ পুরাতন। বংশমর্য্যাদাগর্ব্বে পুরাকালে সূর্য্য বা শাক্যবংশীয়ের তুল্য অভিমানী। বল্লালী আমলের কিছু পরেই আদিশূর কর্ত্তৃক আদৃত পঞ্চব্রাহ্মণের এক শাখা তত্রত্য কোন মহারাজার নিকট রাজনগর জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বঙ্গদেশে যখন প্রেমের বন্যা আসিয়াছিল—বাঙ্গালীর সুপ্তপ্রেমের কলনদী উৎসারিত হইয়াছিল, সহস্র পাষাণ জলে গলিয়া অমৃতের প্রস্রবণ বহিয়াছিল, সেই সময় এই বংশের জমিদার সেই মৃত-সঞ্জীবনী সুধায় তাঁহার বিষয় বাসনা বিষ জর্জ্জর চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম এ বংশের কুলধর্ম্ম ও এই মন্দির-অধিষ্ঠিত যুগল-দেবতা কুলদেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

এ বংশের সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে অনেকগুলি কঠোর নিয়ম পালনের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে এবং এ পর্য্যন্ত এ বংশের বংশধর কেহ এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হইয়াছেন, এমন কথা তাঁহাদের কোন বিপক্ষ পক্ষও বলিতে পারে নাই।

জমিদার হরিবল্লভবাবু—বর্ত্তমান জমিদারের পিতা—এই বংশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন। এ অভিনব মন্দির-স্থাপন ও বিষয়াদির দেবোত্তর বন্দোবস্ত, তাঁহার অতুল কীর্ত্তি। কিন্তু এই কীর্ত্তি-লাভের মধ্যে সবটায় আধ্যাত্মিক যোগ না থাকিয়া ইহার মধ্যে কতকটা আধিভৌতিক যোগও ছিল। হরিবল্লভবাবু সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে পৌত্রমুখ সন্দর্শনের আশায় হতাশপ্রায় হইয়া তাঁহার বিপুল ধনৈশ্বর্য্য পরমার্থে উৎসর্গের কল্পনা করিয়া এই মন্দিরনির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছেন, এমন সময় পুত্রবধূ কৃষ্ণপ্রিয়া একটি পুষ্পকোরকতুল্য সন্তান প্রসব করিলেন। শিশুটি পুত্র সন্তান নহে, কন্যা সন্তান। তথাপি এই 'হাপুত্রে'র ঘরে তাহার আদরের সীমা রহিল না। কন্যার পিতামহ সুতিকা গৃহের দ্বারে আসিয়া বস্ত্রবিজড়িত নাতনীটিকে ধাত্রীক্রোড় হইতে গ্রহণ করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে গদগদস্বরে বলিলেন, "রাধারাণি! এত দিনে তোর এই অধম সাধককে কি প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিতে এলি মা?"

অন্তরালে শিশু-জননীও নয়নজলে অভিষিক্তা হইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কাতর আহ্বান এতদিনে কানে তুলিয়াছেন। এই সন্তানটুকুর জন্য প্রাণ এতদিন কত যে হা হা করিয়াছে, তাহা অপরে কি বুঝিবে? এইটুকুর জন্যই শ্বশুর তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বামী অবশ্য মুখে কিছু বলিতেন না, বরং কুলীন ও ধনী সন্তান হইয়াও আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া এবং পিতার বিরাগ ভাজন হইয়াও কেবল এই হতভাগিনীর মুখ চাহিয়াই গৃহে পুনর্ব্বার সৌভাগ্যবতী নববধূ আনয়ন করেন নাই। ইহাতে তাঁহার নিজের প্রেমপূর্ণ হৃদয়েরই পরিচয় তিনি প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়া ত তাহাতে যথার্থ সুখী হইতে পারেন নাই। পতিব্রতা হিন্দুরমণী নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে বড়

করিয়া দেখিতে জানেন না। তিনি যাঁহার মধ্যে নিজের সমুদয় সুখ দুঃখ নিমজ্জিত করিয়া তন্ময় হইয়াছেন, তাঁহার সুখ দুঃখের কাছে নিজের লাভ লোকসানকে দাঁড় করাইতে সতীচিত্ত যে একান্তই ক্ষুন্ন হয়। শ্বশুর বংশের কথা ভাবিয়া নীরবে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। এত বড় নামটা এই অভাগীকে ঘরে আনিয়াই বুঝি লোপ পাইল। অনেক অনুনয় অনুরোধেও স্বামীকে পুনর্ব্বিবাহে সম্মত করাইতে পারেন নাই। আজ তাই বড় সুখে অতীতের সকল দুঃখ এক সঙ্গে বক্ষে আলোড়িত করিয়া জাগিয়া উঠিল। গভীর সুখে ততোধিক নিবিড় স্নেহে জননী ক্ষুদ্র সন্তানটিকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া তাহার ঘুমন্ত মুখে চুম্বন করিলেন। শিশু ঘুমের ঘোরে মধুর হাসি হাসিল।

অন্নপ্রাসনের দিন মেয়েটির নাম রাখা হইল, বাণী। কিন্তু মেয়েদের কতকগুলা অলঙ্কার বস্ত্র যেমন কেবল বাক্স আলমারীতে কোন একটা বিশিষ্ট পর্ব্ব দিনের অবসর চাহিয়া আবদ্ধ থাকিবার জন্যই জন্ম লাভ করে, বাণী মেয়েটির এই নামটুকুও তাহাকে সেইরূপ আটপৌরে ব্যবহারের জন্য না দিয়া পোষাকীরূপে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল। মা সাধ করিয়া কখনও কখনও সেই তোলা নামটি ধরিয়া ডাকিলে কি হইবে, পিতামহ-দত্ত 'রাধারাণী' নামটাই ইতঃমধ্যে সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত পিতা এই সেকেলে নামটার বিরুদ্ধে নিজের ঘোর আপত্তি জ্ঞাপন করিবার জন্যই কিছু দিন খুব জোর করিয়া পিতার সাক্ষাতেও তাহাকে বাণী বলিয়া ডাকিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমশঃ কানে শুনিয়া শুনিয়া তাঁহারও রাধারাণী নামটার উপর বিতৃষ্ণার মাত্রা কমিয়া আসিতে লাগিল এবং কিছুদিন পরে তিনিও বালিকাকে তাহার পিতামহ-দত্ত নামেই ডাকিতে লাগিলেন। বাণী নামটা হীরা মতির মত তোলাই রহিল।

হরিবল্লভবাবু অত্যন্ত গোঁড়া বৈষ্ণব। সর্ব্বদা হরিনাম-গ্রহণে ও তিলক-সেবায় তাঁহার বিন্দুমাত্র আলস্য ছিল না। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার বেতনভোগী গায়েন ও গ্রামস্থ অপরাপর বৃদ্ধ প্রৌঢ় সঙ্গীতজ্ঞগণ মিলিয়া নাট-মন্দিরে যখন হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিত এবং ঝুলন, রাস, দোল প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে প্রায় মাসাবধি ব্যাপিয়া যখন ঠাকুরবাড়ীর সুবৃহৎ দালানে হরি-কথা বলিত, সেই সময় সর্ব্বক্ষণ ধরিয়াই প্রায় তাঁহার মুদ্রিত নেত্রদ্বয় হইতে দর-বিগিলিত প্রেমাশ্রুধারা তাঁহার অনাবৃত বিশাল বক্ষে ঝরিয়া পড়িতে থাকিত। অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ এবং সহস্রবার তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিত জপমালায় রাধাকৃষ্ণ নাম জপ সমাধা না করিয়া কোন দিন তাঁহাকে কেহ জলগ্রহণ করিতে দেখে নাই। মধ্যাহ্নে মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত সমাগম হইলে, তাঁহার শুভ্র জাজিম পাতা প্রশস্ত গৃহতলে কম্বলাসন বিছাইয়া শাস্ত্রানুশীলন হইত। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে বৈষ্ণবতন্ত্রের বাহিরে তাঁহার মনকে কেহ তিল পরিমাণেও নড়াইতে সমর্থ হইত না। বিশেষতঃ বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের উপর তাহার একটা জাতক্রোধ ছিল। ইঁহারা আত্মা পরমাত্মার দ্বিত্ব অঙ্গীকার করেন না। ইঁহাদের মুক্তি নির্ব্বাণের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছায়। তাঁহার বিশ্বাস, বেদান্তশাস্ত্রে শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে ঈশ্বরে অবমাননা সূচিত করে; এবং জীব ব্রহ্মে একাক্ষরূপে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। ইঁহাদের সহিত শাস্ত্রালাপ তিনি কখনই করিতেন না। বলিতেন, "আসলে উহারা নাস্তিক। ধর্ম্মের ভাণ করে বলিয়া নাস্তিকাপেক্ষাও ভয়াবহ। অতএব উহাদের সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যজ্য।" ইদানীং পৌত্রী রাধারাণী "কর্ম্মী দাদামহাশয়ের হৃদয়ের সমস্ত স্থানটুকু অধিকার করিয়া তাঁহার চিরাভ্যস্ত বিধিশৃঙ্খলার বাঁধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সবটা উলট পালট করিয়া দিয়াছিল।

মেয়েটি বছর-খানেকের হইয়া উঠিতেই বৃদ্ধের সাধনভজনের কাল অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া নাতনী রাধারাণীর খেলার সঙ্গে একটু যেন বর্দ্ধিত হইতেছিল। জপের মালায় টান দিয়া মধ্যে মধ্যে একটা বায়না-ভরা আবদারে স্বরে ডাকিয়া উঠে, "দাদা!" হরিবল্লভবাবু মনে মনে উদ্বেগ অনুভব করিলেও বাহিরে অতিশয় স্নেহভরেই তাহাকে কোলের উপর টানিয়া লন।

পুত্র রমাবল্লভবাবু কিছু নব্য তন্ত্রের লোক; ইহার আভাসও পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। হরিবল্লভবাবু যখন নবম বর্ষে পৌত্রী রাধারাণীকে পাত্রস্থ করিয়া অক্ষয়-স্বর্গ-ফল-কামনা-লোলুপ চিত্তে চারিদিকে ঘটক পাঠাইয়া বরানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন এই উপলক্ষে পিতাপুত্রে ঈষৎ মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হইল। প্রথমতঃ এক কুটুম্বপুত্র মৃগাঙ্কমোহনের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে কথা কহিতে যাইতেই, রমাবল্লভ আপত্তি প্রকাশ করিয়া এই যুক্তি প্রদর্শন করিলেন যে, উক্ত বালকটি এই বয়সেই যখন সিগারেট টানে, মাথার চুলে বাবৃরি কাটে, শিষ দিয়া যখন তখন যা তা গান গাহে, তখন উহার ভবিষ্যৎটা—। হরিবল্লভ আপত্তি মানিলেন কিন্তু ইহার পরেই প্রজাপতির অনুচর একদা একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুলীনসন্তানের শুভসংবাদ বহন করিয়া রাজনগরের বাটীতে উপস্থিত হইল। পাত্র কুল সম্বন্ধে একেবারে নিখুঁত, এ ভিন্ন বংশ পরম্পরাক্রমেই ইঁহারাও বৈষ্ণবাচার-পরায়ণ। হরিবল্লভ-বাবু পুত্রকে ডাকাইয়া প্রফুল্লচিত্তে সবিশেষ সংবাদ বিবৃত করিয়া পরিশেষে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "ছেলেটি অতি সুপাত্র! আগামী ফাল্গুনে দোল-পূর্ণিমার পর বিবাহের দিন স্থির করা হোক; বৃদ্ধ বয়স, কবে আছি কবে নাই, শুভকার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নয়।" পুত্র কিন্তু এ সংবাদে আনন্দিত হইতে পারিলেন না, বিমর্ষভাবে বলিলেন, "এখন এত তাড়াতাড়ি করছেন কেন? এখনও ত মেয়ে নেহাৎ ছোট আছে।"

হরিবল্লভবাবুর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "ছোট আছে! বল কি তুমি? ন'বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে যায়, সে খবর কিছু রাখ কি?"

রমাবল্লভের মুখ শুকাইয়া আসিল; তথাপি একটু সাহসে ভর করিয়া তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "এখন সকল লোকেই মেয়েদের একটু ডাগর করে বিবাহ দিচ্ছে। তা ছাড়া আমরা কুলীন, কুলীনের ঘরে বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়সেও মেয়ে আইবুড় থাকে দেখেছি। শুধু শুধু তাড়াহুড়ো করে সতীনের হাতে মেয়ে দেবার দরকার কি? শুনলাম ছেলেটির এক স্ত্রী বর্ত্তমান।"

শুনিয়া হরিবল্লভবাবুর চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু আপনাকে তখনই সংবরণ করিয়া ঈষৎ শ্লেষের ভাবে তিনি বলিলেন, "বটে, সতীনের হাতে। হুঁ! মুখ্য-কুলীনের ছেলে তোমার মত স্ত্রৈণ কোথায় খুঁজে জোড়া মেলাতে পারবে? এখন একটা সতীন-ওয়ালা বর জুটেছে, এর পর যে গণ্ডা ভরে যাবে! ও কোন কাজেরই ওজর নয়। আমার ঘরে যে বিয়ে করবে তার দশটা স্ত্রী থাক্‌লেই বা তাতে ক্ষতি কি? এ গাঁয়ের বাহির হলে ত সে স্ত্রীকে সে ঘরে আনবে? সে ভাবনা তোমার নাই। বউটা চিররুগ্না, তাকে ভরণপোষণের মত সামান্য টাকা দিলেই সে খুসী হয়ে বাপের ঘরে জন্মের মত চলে যাবে। এ ছেলে অতি চমৎকার! সুন্দর চেহারা, বয়সও অল্প, লেখাপড়া করছে, কোষ্ঠিতেও রাজ-যোটক মিল! সব দিকেই সরেশ মিল।"—রমাবল্লভের চক্ষের সম্মুখে ঝাপটাকাটা কোঁকড়া চুলের থরের মধ্যে একখানা সুধামাখা মুখ মুহূর্ত্তে চাঁদের মত ফুটিয়া উঠিল। তিনিও হঠাৎ ঈষৎ উত্তেজনার সহিত কহিয়া ফেলিলেন, "বাণীকে আমি বিবহিত ছেলের হাতে দেব না, না হয় সে আইবুড়ই থাকবে। শুনেছি, আপনার ছোটপিসি চিরকাল কুমারী থেকে দেবসেবা করে কাটিয়া গেছেন। আর একটী পরেশ

মেয়ের ক্ষতি—সেটাও সমীচীন হবে কি না, এও একটু বিচার করে দেখবেন।”

হরিবল্লভবাবু যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেও ছেলের জিদী স্বভাব জানিতেন বলিয়া আর কিছুই বলিলেন না, কেবল—“হাঁ, কুলীনের ঘরের আইবুড় ছেলে বিধাতাপুরুষকে ফরমাস দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে এসো গে যাও।” বলিয়া রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। বাহিরের চেয়ে তাঁহার ভিতরটা অনেক বেশী তাতিয়া রহিল। রাধারাণীর কাছে আসিলে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, “যা, যা, তুই তোর মা বাপের কাছে যা। আমি তোর কে রে বাপু যে, চব্বিশ ঘণ্টা আমার কাছেই লেগে থাক্‌বি?”—রাণী বালিকা হইলেও প্রখরবুদ্ধিশালিনী। সে আশৈশব পিতামহের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার স্বভাবের সহিত উত্তমরূপেই পরিচিত ছিল। ভর্ৎসনার কোন উত্তরে অভিমান প্রকাশ না করিয়া সে ধীরপদে সেল্‌ফের নিকট গিয়া হরিকথামৃত গ্রন্থখানি লইয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া সুর করিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। প্রথমেই পড়িল—

অপূর্ব্ব শ্রীহরি-লীলা কহনে না যায়।
অন্ধ নেত্র লভে ইথে বোবা গীত গায়॥”

“হাঁ দাদামশাই, আমাদের কৈলেসীর ভাইটি ত কাণা, তাকে ত হরিকথা শোনালে হয়? আমি তাকে নিয়ে আসব?”

হরিবল্লভবাবু চকিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। কি বিশ্বাস-ভরা প্রাণ! ইহার উপর রাগ করিয়া থাকে, এমন মানুষও জগতে আছে? আহা, থাক না, দুইটা দিন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াক্। বাপ যদি ইহার মধ্যে ভাল পাত্র খুঁজিয়া আনে ক্ষতি কি?

এমন করিয়া যে বিবাহ নয় বৎসর বয়সে বন্ধ হইয়াছিল, মেয়েটি

ত্রয়োদশ পার হইলেও, সে বিবাহ আর ঘটিয়া উঠিল না। হরিবল্লভবাবু একরোখা মানুষ। যে অধিকার তাঁহার পুত্রের দ্বারা একবার খর্ব্ব হইয়াছে, নিজে যাচিয়া আর কোন মতেই তিনি উহা গ্রহণ করিতে পারেন না। কাজেই অনেক মনোমত পাত্রের সন্ধান পাইয়াও তিনি নাত্নীর বিবাহ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই করিলেন না। কেবল মধ্যে মধ্যে অন্তরের ক্ষোভ তাঁহার এই একমাত্র অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীটির নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়া বলিতেন, "ওরা তোর বিয়ে দেবে না রে দিদি! সেই মতলব করে সব চুপচাপ বসে আছে, দেখছিস্ নে!" বাণী এ কথার উত্তরে মুখ নত করিয়া একটুখানি হাসিত মাত্র। কাজেই এ প্রসঙ্গ আর বেশীদূর পর্য্যন্ত চলিত না। নিগূঢ় অভিমানভরে পিতৃসম্মানে আহত পিতা পুত্র বা পুত্রবধূকে এ বিষয়ে তাঁহার চিন্তার আভাস মাত্র দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই এ সম্বন্ধে বাহিরের একজন পরের চেয়েও পরের মত তাঁহার এক প্রকার অত্যদ্ভুত ঔদাসীন্যই তাঁহাদের নিকট প্রকটিত হইত।

বাণী ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিবার পর হঠাৎ একদিন পত্নীর অনুযোগে রমাবল্লভের চমক হইল, এবার তাহার বিবাহ না দিলেই নয় লোকে নিন্দা করিতেছে, এদিকে মেয়েও বেশ ডাগর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনে মনে যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল যে, এই বিস্তৃত বঙ্গদেশে তাঁহার মনের মত পাত্রের কোনই অভাব ঘটিবে না; একটু মনোযোগী হইয়া অনুসন্ধান করাই যা অপেক্ষা। কিন্তু মানুষের মনের মত জিনিষ জগতে কয়টাই বা মেলে? মন যাহাই পাক না কেন কিছুই সে মনোনীত করিয়া লইতে পারে না তন্মধ্যস্থ খুঁৎগুলাই অণুবীক্ষণের সম্মুখস্থ কীটাণুর প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটীর মতই বৃহৎ ও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। রাধারাণীর জন্ম অনেকগুলি বরের সন্ধান মিলিল; কিন্তু একটিকেও ঠিক সুপাত্র বলিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া বা রমাবল্লভের মনে ধরিল না। অন্ততঃ কোন খুঁৎ যাহার

নাই, সে হয় ত সুদূরপল্লীবাসী, অথবা নিতান্ত রোগা বা মাথায় এত খর্ব্ব যে, বাড়ন্ত মেয়ে রাণীর সহিত মোটেই সাজিবে না। কুল একটু খাট করিতে স্বীকার পাইলে অনেক ভাল পাত্র পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহা একেবারেই অসম্ভব। রমাবল্লভ পিতার নিকট কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, কুল-গৌরবের এতটুকু লাঘব করিয়া তিনি কন্যার বিবাহ দিবেন না, কিন্তু ঠিক সমান ঘরে যোগ্য বরও খুঁজিয়া মিলিল না। তখন তিনি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। নিকষ কুলীনের সঙ্গে মেল, গাঁই প্রভৃতি এত উপদ্রব জড়িত আছে যে, দুটি পাঁচটি ভিন্ন সে রকম ফরমাসী বরের পদধূলি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে পড়েই নাই।

হরিবল্লভবাবু এই সকল দেখিতেন, শুনিতেন, আর মনে মনে বেশ একটুখানি আমোদ বোধ করিতে থাকিতেন। ছেলে যে তাঁহাকে খাটো করিয়া আপনার মত প্রচার করিতে দ্বিধা করে নাই, ইহাতে তিনি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। এখন 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার' সুখ বুঝুন, বাছাধন! কিন্তু মেয়েটি যে এই উপলক্ষ করিয়া তাঁহার কোল ঘেঁষিয়া রহিল, পরের হাতে গেল না, ইহার মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন সুখ না ছিল, এমন ঠিক বলা যায় না। এ পরমান্নের বাটিটা তিনি নিজের হাতে মুখে তুলিয়া লইতে কুণ্ঠিত ছিলেন বটে, কিন্তু অপরে যখন ধরিলই, তখন তাহার আস্বাদটুকুকে ত প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

ইহার অল্পদিন পরেই রাধারাণীর পিতামহ স্বল্পদিনের রোগশয্যা ছাড়িয়া একদিন অতর্কিতে সহসা কোন এক সম্পূর্ণ অজানা দেশের উদ্দেশ্যে মহাপ্রস্থান করিলেন। মৃত্যুশয্যায় যে উইল প্রস্তুত হইল, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাধারাণীর সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ ছিল যে সমুদায় স্থাবর সম্পত্তি তাঁহার পূর্ব্ব-নির্দ্দেশানুসারে দেবোত্তর করা হইয়াছে, এবং যাহা নিজ নামে আছে, যদি পঞ্চদশ বৎসর বয়সের মধ্যে তাহার পৌত্রী

রাধারাণী কোন সমশ্রেণীর সমান ঘরে কুলীনসন্তানের সহিত বিবাহিতা হয়, তবেই সে অথবা তাহার সন্তান সন্ততিগণ দেবসেবা ব্যতিরেকে আয়ের সমুদয় উপস্বত্ব-পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিতে পাইবে। কিন্তু যদি তাহা না হয়—অর্থাৎ অসমান ঘরে বিবাহ হয় অথবা উক্ত সময়মধ্যে বিবাহ না হয়, তাহা হইলে রাধারাণীর পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর দিবস প্রাতঃকালেই তাঁহার সুদূর সম্পর্কীয় কুটুম্বপুত্র মৃগাঙ্কমোহন সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। রমাবল্লভ যাবজ্জীবন সহস্র মুদ্রা মাসহারা পাইবেন মাত্র, এই পৈতৃক গৃহে সেইদিন হইতে তাঁহার কোনই অধিকার থাকিবে না।

নিষ্ঠুর প্রতিশোধ! রমাবল্লভ ব্যথিত বক্ষে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই ননীর পুতুল সোণার প্রতিমাকে কি শেষে শুধু কুল দেখিয়া অযোগ্য হস্তে দিতে হইবে? কোন উপায় নাই, কোন উপায় নাই? ইহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াও কেমন করিয়া তাহার পিতামহ এমন একটা কঠিন সর্ত্তের মধ্যে ইহার সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে কঠোররূপে বদ্ধ করিয়া দিতে সক্ষম হইলেন? স্নেহ কি স্নেহাধারের সুখ দুঃখকেই সব চেয়ে প্রধান করিয়া তাহার কাছে আর সব ছোট বড় সাংসারিক বস্তুকে ভুলাতে পারে না? কৃষ্ণপ্রিয়া সকল কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন না; বলিলেন, "তা ঠাকুর ত কিছুই অন্যায় কথা বলেন নি। পনেরো বছরে ভদ্রঘরের মেয়ের বিয়ে দিতে না পারিলে লোকে যে ছিছি করিবে। এর মধ্যে বিবাহ দিতে হবে বৈ কি।"

রমাবল্লভ ঈষৎ-চটিয়া বলিলেন, "বেশ, তুমি ত বললে হবে বই কি! কিন্তু ধর যে সময়টার মধ্যে দিতেই হবে, যদি সে সময়ের মধ্যে তেমন ভাল ছেলে না পাওয়া যায়, তবে কি ওই মৃগাঙ্কের হাতেই শেষটা তাকে দিতে হবে? চরিত্রহীন ব'লে ওকে সেই সর্ব্বপ্রথমেই আমি ছেড়ে

নিই, বাবার কিন্তু বরাবরই ওর দিকে সমান টান। ওকেই শেষ অবলম্বন করে রেখে গেছেন, দেখচ না। ওই ভাগ্যে আছে আর কি!"

বিশ্বাসপরায়ণা গৃহিণী আশ্বাসের মৃদু হাসির সহিত সকল সন্দেহ ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "কি যে বল! দুবছরের মধ্যে আমাদের রাধারাণীর বর জুটবে না, এও কি একটা কথা! ওর হাতেই বা পড়বে কেন, মেয়ের উপর তাঁর আশীর্ব্বাদ আছে। আর আমিও বলছি, ওর ভালই হবে, তুমি দেখো।"

দুই বৎসর কাটিয়া আসিল। কিন্তু এই দুই বৎসরের ৭৩০ দিনেও পিতামাতার যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীমতী বাণীদেবীর বর জুটিল না। আজিকালিকার দিনে শিক্ষিত ঘরে বড় একটা কেহ কুলমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে নাই; কাজেই রমাবল্লভ স্বঘরে মনোমত পাত্র খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন অগত্যা একটি দরিদ্র ঘরের নিতান্ত অশিক্ষিত বালকের উপরই মন ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু মন কেবলই কাঁদিতেছিল। কল্পনায় বাস্তবে এতটা প্রভেদ কি সহ্য করিতে পারা যায়? এমন মুক্তার হার কোন্ বানরের গলায় পরাইবেন। এত লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাকে একটা গণ্ডমূর্খের হাতে সঁপিয়া দিবেন? শাস্ত্র যে বলিতেছে, 'দেয়া বরায় বিদুষে।' কিন্তু একদিন এ সমস্যারও সমাধান করিয়া দিয়া সেই নির্ব্বাচিত মূর্খ ছেলেটি ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

বাণী কিন্তু তাহার নিজের অবস্থায় বেশ ভালই আছে। কুমারী জীবনের যে সুখাস্বাদে হিন্দু বালিকারা চিরবঞ্চিতা সেই অনুপমেয় শান্তির আস্বাদ গ্রহণে সে নিজেকে চরিতার্থ মনে করিতেছিল। যে দাদামহাশয়ের স্নেহের আশ্রয়ে তাহার জীবনটী মুকুলিত হইয়া দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, সেই হৃদয় পারিজাতের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত। সেই কুসুম পেলব শান্তির আধার হৃদয়ে চিন্তা, ভয়, বেদনা, আঘাত

কোনই অশান্তি আনয়ন করিতে পারে না। এ কি কম সুখ! সে বেশ আছে। হরিবল্লভ চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে পলে পলে, তিলে তিলে নিজের অন্তর্বাহ্যের সমুদয় বৃত্তি ও কর্ম্ম সংস্কারের দ্বারা এই মেয়েটাকে গঠিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাহার কোন কার্য্য অসম্পাদিত বা কোন মত পরিবর্ত্তিত হইবার আশঙ্কা ছিল না। বরং 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' বলিয়া যে একটা প্রবাদ আছে, এ মেয়েটি এই পুরাতন প্রবাদটিকে বিশেষরূপেই সপ্রমাণ করিয়া তুলিয়াছিল। ছোটবেলা হইতে মন্দিরের সেবা তাহার যেন প্রধান আনন্দ। এ দেবপ্রীতি অস্থি মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। খেলাঘরেও সে কখনও বউ সাজে নাই। সেখানেও সেই 'ঠাকুর ঠাকুর' খেলা। বস্তুতঃ ইহাই তাহার একমাত্র প্রাণের সুখ। শিশুকাল হইতে অতিক্রান্তপ্রায় কৈশোর ব্যাপিয়া এই যে একটি সংযমপূর্ণ, শুদ্ধ সত্ব কুমারী-জীবন এই সংসারটিতে পুণ্য দেবাশীর্ব্বাদের মত আবির্ভূত হইয়া রহিয়াছে, ইহাই তাহার সর্ব্বপ্রধান ঐশ্বর্য্য ও শোভা। রমাবল্লভ কতবারই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন এবং ভাবিতেন, কি করিলে ইহাকে চিরদিন এমনই রাখিতে পারা যায়? এমনই শিশু-সরল প্রসন্ন চিত্ত, এমনই নির্ম্মল শারদচন্দ্রের ন্যায় হাসি ভরা মুখ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নূতন পুরোহিত প্রথম যেদিন পূজার আসন গ্রহণ করিল, সেদিন পূজা-গৃহে যেন একটা নব যুগের সূচনা হইল। রাধারাণী দুই অচঞ্চল দীপ্ত নেত্রের স্থির পর্য্যবেক্ষণের ফলে সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন পুরোহিত সম্বন্ধে এইটুকুই অভিজ্ঞতা লাভ করিল যে, সে 'নিতান্ত ছেলেমানুষ'—কাজেই

পুরোহিতের ঠিক যোগ্য নয়। পূজা শেষে পুরোহিত বিদায় লইলে তাহার দুই সূক্ষ্ম ভ্রূরেখা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নীরবে দ্বারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে পূজার নৈবেদ্যগুলা পূজা-স্থান হইতে সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া গেল। দেবসেবক ব্রাহ্মণ সে সকলের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

মন্দিরের বাহিরে পুষ্পভূষিত প্রশস্ত উদ্যানে বসন্তের প্রমোদোৎসব তখনও সাঙ্গ হয় নাই। কৃষ্ণচূড়ার কতকগুলা রাঙ্গা রাঙ্গা ভাঙ্গা পাপ্‌ড়ি বাতাসে উড়িয়া রাস্তাময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই রক্ত-রাঙ্গা পাপ্‌ড়ি গুলি পদদলিত করিয়া রাধারাণী কিছুক্ষণ উদ্যানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার মনের ভিতর অকস্মাৎ আজ কোথা হইতে অত্যন্ত একটি অশান্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। এ কি হইল? এ কি ব্যবস্থা হইল? দেবতার সহিত মানবের এ পরিহাস না কি? এই মন্দিরের এই পুরোহিত। গোধূলি গগন প্রান্তে অস্তগত সূর্য্যের দীপ্তিহীন রশ্মিচ্ছটায় যেমন সুবর্ণমণ্ডিত রক্তিমা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে, তেমনই করিয়া তাহার দুই কপোলে পূর্ণরক্তিমা সুলোহিত রাগে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দাদাবাবুর বুকের ধন, মাথার মণি কি এই অল্প সময়ের মধ্যে এ সংসারে এমন মূল্যহীন হইয়া গেল যে, ইহার জন্য সৃষ্টি খুঁজিয়া এই কচি বাচ্ছাটিকে পূজারী করা হইল? বাবা কেন এমনটা ঘটিতে দিলেন? ইহাতে কি আমাদের অপরাধ হইবে না?

বিরক্ত ও ক্ষুব্ধচিত্তে সম্মুখস্থ বৃক্ষ হইতে গোটা কয়েক ফুল ছিঁড়িয়া পরক্ষণেই অনাগ্রহভরে সেগুলা মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া সে গৃহে ফিরিয়া গেল। অম্বরনাথের উপর তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিবার এমন কিছু কারণ যে পাইল, তাহা নয়; কিন্তু তথাপি মানুষের মন কখন কাহার প্রতি কি সূত্রে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হয়, তাহার কোন বাঁধা নিয়ম ত নাই।

তাই সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কারণ কিছু থাক বা না থাক, বাণীও এই যুবকের তরুণ বয়স উপলক্ষ করিয়া প্রথম দিনেই তাহার প্রতি বিরক্ত, এমন কি ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়াই ঘরে ফিরিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া পাটের শাড়ীর প্রান্ত গলায় বেষ্টন করিয়া নাসিকাগ্রে তিলক ধারণপূর্ব্বক হরিনামের মালা হাতে ভাণ্ডারিণীকে তরকারী বানাইবার উপদেশ দিতেছিলেন, এমন সময় মেয়ে আসিয়া নিকটস্থ চৌকিতে বসিল।

উপদেশপ্রাপ্তা দাসী কর্ত্রীর আদেশে "আচ্ছা তাই বানাবো মা," বলিয়াই বাণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ গা দিদিঠান, কি হয়েচে গা? মুখটা অমন ধারা ক'রে রয়েছ কেন?"

দাসীর কথায় কৃষ্ণপ্রিয়া চকিতে কন্যার দিকে চাহিয়াই তাহার অপ্রসন্ন মুখকান্তি দেখিয়া ব্যাপারটা কতক অনুমান করিয়া লইয়াই ছিলেন। কিন্তু কিছু বুঝিয়াছেন, সে ভাবটা অপ্রকাশ রাখিয়া অনুযোগ পূর্ণ স্বরে দাসীকে বলিলেন, "তোদের এক কথা! বাণীর আমার মুখ ভার আবার কোথায় দেখ্‌লি? নতুন পুরুত কেমন পূজো করলেন রে?"

রাধারাণী ঠোঁট ফুলাইয়া সবেগে উত্তর দিল, "ছাই! ভা—রী—ত পুরুত।" ইহা বলিয়াই সে মার পাশ দিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল— "অত ছেলেমানুষ, ও আবার পুরুত!"

কৃষ্ণপ্রিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা তাই না কি? খুব ছেলেমানুষ? তা ত কই শুনি নি। কত আন্দাজ বয়েস হবে? আমি এই যাব যাব করে আর পূজোর সময় যেতে পারলাম না। যেটি দাঁড়িয়ে না করাব, সংসারে সেটি ত আর কারও দ্বারা হবে না।"

বাণী অবজ্ঞার সহিত বলিল, "আমি কি তার ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখতে গেছি যে কত বয়স তা ঠিক করে বলব? দেখে ত মনে হয়, খুব বেশী হয় ত এই বছর কুড়িই না হয় বড় জোর হবে।"

কৃষ্ণপ্রিয়া কহিলেন, "ওমা, তাই নাকি?"

সন্ধ্যাকালে যথাযথ আরাত্রিকের ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। বিংশাধিক সুবর্ণাধার মধ্যস্থ বর্ত্তিকার হেম-পিঙ্গল জ্যোতিতে মর্ম্মর মন্দিরের চিক্কণ ভূমিতল শুক্তিখণ্ডের মত জ্বলিতেছিল। বসনভূষণস্থ মহামূল্য রত্নরাজি সে আলোক-সম্পাতে ঝলমল করিয়া নক্ষত্রখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তি বিকীর্ণ করিতেছিল। ঘণ্টা কাঁসরের সহিত খোল করতাল ও মৃদঙ্গধ্বনি 'হরি হরিবোল' শব্দকে অতিক্রম পূর্ব্বক ঊর্দ্ধাকাশে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। দেবতার গলায় পুষ্পমাল্য দুলিয়া দুলিয়া তাঁহাকে যেন চামর ব্যজন করিতেছিল। আর বিগ্রহের পার্শ্বে একখানি পুষ্প-কোমল শুভ্র হস্ত স্বর্ণ-মণ্ডিত ব্যজনী সঞ্চালন করিয়া দেব-অঙ্গে তেমনি সুরভি বায়ু প্রদান করিতেছিল। অম্বরনাথ বামে দক্ষিণে সঞ্চালিত সেই হাতখানার প্রতি একমুহূর্ত্ত দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া পরক্ষণে পঞ্চপ্রদীপ তুলিয়া লইয়া আরাত্রিক ক্রিয়া সম্পাদনে মনোযোগী হইল। সুপ্রচুর আলোকে সেই হাতখানাকে প্রথম মুহূর্ত্তে তাহার ঠিক যেন মর্ম্মর গঠিত একখানা নকল হাত বলিযাই মনে হইয়াছিল। তাই চকিতমাত্র সেই বিস্ময় দৃষ্টি।

সন্ধ্যার কার্য্যেও অম্বরনাথের উপর বাণীর চিত্ত তেমন প্রসন্ন হইতে পারিল না। সে স্থির চক্ষে উহার অনভিজ্ঞ হস্ত সঞ্চালন ও কোন কোন ক্রিয়া বিশেষে বিশেষরূপ ত্রুটি দেখিতে পাইতেছিল। আজন্ম যে এই মন্দির ও মন্দির-দেবতাকে লইয়া কাটাইয়া আসিল, তাহার চক্ষের দৃষ্টি হইতে ভ্রম গোপন রাখা বড় কঠিন। বাণী মনে মনে কঠিন হইয়া উঠিল অম্বরের উদ্দেশ্যে বলিল, মূর্খ—অতি মূর্খ এটা! এমন আনাড়ি লইয়া আমার একদিনও পোষাইবে না।"

সেই দিনই আরতি শেষে গৃহে ফিরিয়া বাণী পিতাকে গিয়া বলিল,

"নতুন পুরুতটাকে কবে বিদায় কর্‌বে বাবা ?" রমাবল্লভ পূর্ব্বেই কৃষ্ণপ্রিয়ার নিকট কন্যার পুরোহিত বিদ্বেষের সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। ঈষৎ হাসিয়া খবরের কাগজ পড়া বন্ধ রাখিয়া তিনি বলিলেন, "কেন বল্‌ দেখি। ও বেচারাকে হঠাৎ বিদায় কর্‌তে চাস্‌ কেন ?"

বাণী সূক্ষ্ম ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধে টানিয়া বলিল, "বাবা, তুমি বল্‌লে—'কেন ?' ও কি রকম পুরুত, ওকে দেখেছ কি তুমি ? কি রকম ছেলেমানুষ—মা গো! ও আবার কি পুরুত, ছিঃ !"

রমাবল্লভের মনেও যে এই খুঁৎটাই জাগিয়াছিল, সে কথা তিনি প্রকাশ করিলেন না ; বরং মেয়ের কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ছেলেমানুষ না ত সব্বাই একবারে বুড়ো হয়ে জন্মাবে কেমন করে রে ? আর এমনই কি ও ছেলেমানুষ ?"

"ছেলেমানুষ বৈ কি ! বছর কুড়ি বয়েস, তার চেয়েও কি আবার খোকা হবে নাকি ?"

"অত কম নয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে বোধ হয় !"

পিতার এই কথা শুনিয়া বাণীর ক্রোধের মাত্রা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "দাদাবাবু থাকলে কখনই ওকে তিনি রাখতেন না কিন্তু। ওকে দিয়ে বিধিমত পূজা হতেই পারে না, সে আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। ওটা নেহাৎ হস্তিমূর্খ।" এই বলিয়াই সে অভিমান ভরে মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার রাঙ্গা রাঙ্গা পাতলা ঠোঁট দুখানা ঈষৎ কাঁপিতেছিল। তখন রমাবল্লভ তাহাকে ব্যথিত দেখিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন। অম্বরের প্রতি তাঁহার এমন কিছুই সহানুভূতি ছিল না, যাহা দ্বারা তিনি তাঁহার সংসারের সারসুখ বাণীর মনে বেদনা দিতে পারেন। তিনি তখন উঠিয়া বসিয়া সস্নেহে কন্যার গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন, "রাধারাণি !" বাণী ঈষৎ মুখ ফিরাইল।

"দুঃখিত হ'য়ো না মা! ওকেই একটু শিখিয়ে নাও, এখন আর ওকে ত্যাগ করবার ত উপায় নেই।"

বাণী সে সব কথা জানিত না। সে সবিস্ময়ে পিতার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি বাবা, কোন উপায় নেই কেন?"

রমাবল্লভ পিতার উইলের কথা তাহাকে সবিশেষ জানাইয়া শেষকালে বলিলেন, "দেখছ ত, পুরোহিত নির্ব্বাচনে আমার কোন হাতই নেই। এখন সাধারণ লোকের বিচারের উপরই ওর থাকা না থাকা নির্ভর করছে। কিন্তু মা, আমার মনে হয়, ছেলেমানুষ হলেই যে সব সময় নির্ব্বাচন হয়, তা নয়। আজই নূতন কাজ আরম্ভ করছে, তাই হয় ত ভাল পারে নি। তোমার হাতে পড়লেই দুদিনে ওকে তুমি ঠিক করে নিতে পারবে। আমি জানি, আমার রাধারাণী মা, ছেলেমানুষ হ'লেও অনেক বুড়ি মেয়েদের চেয়েও বেশী বুদ্ধিমতী।"

বাণী পিতার এই স্নেহপূর্ণ স্তোকবাক্যে আললাট রঞ্জিত হইয়া সলজ্জ মুখে—"বাবা যে কি বলে! আমি ত সবই জানি, তাই আবার ওকে শেখাব।" বলিয়াই উঠিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু মনে মনে সে যে এই শিক্ষকের পদটির পূরা গৌরব অনুভব করিয়া গেল, তাগ তাহার অধর প্রান্তের এক ফোঁটা সূক্ষ্ম হাসিই তাহার পিতার নিকট প্রকাশ করিয়া দিল—উহা শিশিরে ধোয়া গোলাপ কুঁড়িটির মতই সুরভিযুক্ত। রমাবল্লভ অতৃপ্ত নেত্রে তাহার গমনশীল মূর্ত্তিখানি চাহিয়া দেখিয়া অবশেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। মেয়ের দিকে চাহিলেই আজকাল তাঁহার সারা প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। হায়! এই সাধের প্রতিমাকে যে কোন্ অযোগ্য হস্তে সঁপিয়া দিতে হইবে, তাহা কে জানে! হায় রে মানবের ভাগ্য! লক্ষপতির সমুদয় শক্তি চেষ্টাও বুঝি তোমার নিয়ম রোধ করিতে সমর্থ হয় না? নহিলে এই নিষ্পাপ ক্ষুদ্র বালিকার

উপর, তাহার প্রতি পূর্ণ স্নেহপরায়ণ পিতামহের এ কঠোর দণ্ড বিধান কেন ?

মন্দিরের নিত্যপূজা যথাকালে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইতে থাকিল, কিন্তু পূজারী কিম্বা মন্দির-সেবিকা দুইজনেই এ পূজায় তৃপ্ত হইতে পারিতে-ছিল না। প্রচুর আয়োজনের ভারে অনাড়ম্বর সাধনায় চিরাভ্যস্ত অম্বরের চিত্ত অযথা ব্যথিত হইয়া উঠে। সে চারিদিকে বাদ্যোদ্যম ও কোলাহলের ভিতরে কোনও ক্রমে পূজা সমাপ্ত করিয়া যায়। পুষ্পথালিতে অপর্য্যাপ্ত পুষ্প চন্দন পড়িয়া থাকিয়া ম্লান হইয়া পড়ে। বাহিরে আসিয়া সে বিষণ্ন দৃষ্টিতে একবার ভিতরের পানে চাহিয়া চিন্তাক্লিষ্ট মুখে চলিয়া যায়। তাহার মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠে, "এতক্ষণ ধরিয়া একি তুই খেলা করিয়া আসিলি—পূজা করিলি কই ?" নিজের প্রতি সে অসহায় ভাবে রুষ্ট হইয়া ভাবে, "একি তোর অক্ষমতা ? নির্জ্জন নিরালা ভিন্ন তুই কোন মতেই চিত্ত স্থির করিতে পারিস্ না, অথচ এত বড় কোলাহলে রাজ-পূজাই তোর নিত্য ব্রত হইল। তোকে লইয়া আমি কি করি বল দেখি ?"

তাহার পর বিষণ্ন চিত্তে সে একটু এদিক সেদিক ঘুরিয়া বেড়ায়; পথের ধারে কালু পোদের কুঁড়ে ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কখনও তাহার রুগ্ন ছেলেটাকে একটু আদর করে, বাগ বুড়ীর ঘাড়ের বোঝাটা কিছুদূর পর্য্যন্ত বহিয়া দিয়া ঈষৎ স্বচ্ছন্দ মনে ঘরে ফিরিয়া ছাত্র কয়টিকে পাঠ বলিয়া দেয় ও রান্নাঘরে গিয়া রন্ধন করিতে বসিয়া যায়। ভাত ফুটিতে থাকে, সেই সময় সে ইষ্টদেবের ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়ে। তখন তাহার মনের বোঝা অনেকটাই কমিয়া আসে।

বাণী প্রতিদিন বসিয়া বসিয়া তাহার পূজা করা দেখে, মনে মনে সাত বার করিয়া তাহার কাজের সমালোচনা করে, কিন্তু বাহিরে সে মুখ ফুটিতে

পারে না। খুঁত বাহির হয় অনেক, কিন্তু তাহা লইয়া অনুযোগ করিতে গেলে, সেগুলা যুক্তির দিক দিয়া এত ছোট দেখায়, যে তাহাতে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে যেন নিজেকেই নিচু করিয়া ফেলা হয়। ইহার চেয়ে একটা বড় রকম দোষ পাওয়া বরং ভাল। তাহাতে উভয়ের মধ্যেই একটা মীমাংসার উপায় থাকে ; কিন্তু যে দোষটা শুধুই মনের খুঁতের উপর নির্ভর করে, সেটা লইয়া আলোচনা করা সব চেয়ে মুস্কিল, আবার না করাও তদপেক্ষা অধিকতর অশান্তিকর। না সেটাকে ছাড়া যায়, না তাহার কোন প্রতিকার হয়। বাণী মনে করে, নূতন পূজারীর অজ্ঞতা সে নিজে পড়াইয়া শিখাইয়া দূর করিবে ; কিন্তু কাজের বেলা এমন কিছু বড় রকম দোষ চোখে পড়ে না যাহা লইয়া চোখ রাঙ্গাইয়া বলা চলে, "এ কি পূজো করচো ঠাকুর! এই এমন করে কর না!" কাজেই সে অসন্তুষ্ট চিত্তে চুপ করিয়া চাহিয়া দেখে, তাহার দেবতাকে লইয়া শিশু হস্তের অনভ্যস্ত খেলা চলিতেছে। শিখাইয়া পড়াইয়া গড়া আর হয় না, কেবল বিরক্তিই বাড়িয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন সন্ধ্যার বিলম্ব আছে, সূর্য্যদেব পশ্চিম দিগ্বলয় সীমান্তে নামিয়া দাঁড়াইয়াছেন, হোম শিখাবৎ প্রোজ্জ্বল রক্ত-জ্যোতিঃ অর্দ্ধাকাশ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। রাঙ্গা আলোয় স্নান করিয়া প্রকৃতির মূর্ত্তি যেমন সুন্দর দেখাইতেছিল, গৃহমধ্যে শিল্পকার্য্যে নিমগ্নচিত্তা বাণীকে তাহার চেয়ে কম সুন্দর দেখায় নাই। সম্মুখে স্নানযাত্রা। সেদিন মন্দিরে বড় ধুম। সুবর্ণময় শিবিকায় বিগ্রহদ্বয়কে লইয়া গিয়া নদীতে সেদিন স্নান করান হয়। সেই স্নানের পর দেবতাযুগলকে নববেশ পরাইতে হইবে। তাই

বাণী সযত্নে রাধার জন্ত সুন্দর নীল রেশমী শাড়ির উপর জরির ফুলপাতার শিল্প প্রস্তুত করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের পীতবস্ত্র ইতঃপূর্ব্বেই তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। পীত উত্তরীয়খানির চারিধারে কেবল চারিটী জরির কল্কা বসাইতে বাকি। নীল শাড়িখানির প্রশস্ত পাড়টি সোণালি রূপালি জরির অতি সূক্ষ্ম, ফুল পাতা ও লতায় বিচিত্র, তাহার মধ্যে মধ্যে জীবনহীন স্বর্ণভ্রমর মধুলেশশূন্য সুবর্ণ পুষ্পের স্বর্ণ-পরাগ মধ্যে বৃথা মধু অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত। কল্কা কয়টীও একটু একটু করিয়া সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। একবার সে আলোর দিকে উজ্জ্বল পাড়টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল; গোধূলির আলো উজ্জ্বল চুমকিগুলিতে হীরার জ্যোতির মত তাহার মৃদু হাসি ছড়াইয়া দিল। কিছুকাল ধরিয়া সেগুলি নাড়াচাড়ার পর সে-গুলাকে হস্তচ্যুত করিয়া রচয়িত্রী তৃপ্তচিত্তে আবার সূচে জরি পরাইতে মনঃসংযোগ করিল। তাহার অধরপ্রান্তে সাফল্যের হাসি বিকাশোন্মুখ হইয়াছিল। তাহার অর্থ, আমি যাঁদের ভালবাসি, তাঁদের অঙ্গে আমার এ শ্রমের দান ব্যর্থ হইবে না।

বাহিরে অপরাহ্ণের হাওয়া মধুরতর হইয়া উঠিতেছে; দোলের দিনের পথের মত আকাশ-বর্ত্মে লাল ধূলি ছড়াইয়া রাঙ্গা রাঙ্গা মেঘগুলা ক্ষিপ্রগতিতে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। যেন চারিদিকে আবিরের পিচকারি ছুটিতেছে! এমন সময় পিছন হইতে কে আসিয়া ত্বরিৎহস্তে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল এবং তখনই আবার তাহা ছাড়িয়া দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তাহারই পাশে বসিয়া পড়িল।

বাণী কর্ম্মনিরত থাকিয়াই হাসিয়া কহিল, "আহা! আমি যেন জান্‌তে পারি নি!"

"তা জান্‌বি নে কেন? তোকে সোহাগ জানাবার এই একজন বই আর দুজন ত হলো না। তা ভাই, এমন আলোয় ঘরের কোণে কেন?

তোর মনটা কি বিধাতা সত্যই পাথর দিয়ে গড়েছে? আয়, ছাতে যাই।" এই বলিয়াই সে তাহার হাতের শিল্পকার্য্যটা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

ত্বরিতে হাত সরাইয়া লইয়া বাণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এতে যা তা হাত দিস্ নে সই! এ যে ঠাকুরদের। আর ছাতে গিয়ে কি হবে ভাই? এইখানেই ব'স্ না, গল্প করতে করতে বোনাটাও শেষ হয়ে যাক্।"

তুলসীমঞ্জরী, বাণীর সখী, অগত্যাই ছাতের লোভ সম্বরণ করিয়া একটুখানি সরিয়া বসিল, মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমিও কাপড় চোপড় না কেচে তোমার কাছে আসি নি গো, ভট্‌চায্যিমশাই! এটা হচ্চে কি?"

বাণী সখীকে সমাপ্তপ্রায় স্বহস্তকৃত শিল্প প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ, কি রকম হ'ল?"

মঞ্জরী মুরব্বীর মত একটু মাথা নাড়িয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, "সুন্দর হয়েছে! কিন্তু হলে কি হয়, এ শুধু বেণাবনে মুক্ত ছড়ান।"

বাণীর বুকে ধড়াস্ করিয়া একটা ধাক্কা লাগিল। সে মুখটা ঈষদুত্তোলন পূর্ব্বক সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কেন?"

মঞ্জরী হাসিতে লাগিল, বলিল, "যে পুরুত জুটেছে, তাই, বলছি। হাঁ ভাল কথা, লোকটা পূজা-অর্চ্চনা করছে কেমন? মন্তর তন্তর কিছু জানে? না, কেবলি কোশাকুশি নেড়েই সারে?" মঞ্জরী এই কথা বলিয়া বিদ্রূপের ছলে হাসিয়া উঠিল।

সেই কৌতুকহাস্যে বাণীর মুখখানা অকস্মাৎ সেই সূর্য্যাস্ত-লোহিত আকাশের মতই লাল হইয়া উঠিল, সে যেন ইহাতে নিজেকেই অপমানিত বোধ করিতেছিল।

মঞ্জরী সখীর মুখের দিকে চাহে নাই। সে আপনার মনেই বলিতে লাগিল, "দেশশুদ্ধ সবাই মিলে এই কাজটার জন্ত কত কি-ই না

বলেছে। মরবার সময় স্মৃতিতীর্থ মশাইয়ের নাকি 'ভীমরতি' ধরেছিল তাই তিনি এমন কাণ্ডটা হঠাৎ ঘটিয়ে গেলেন। পূজা পাঠের ও জানে কি? আদি ঠাকুরপোর মুখে শুনেছি, ছোঁড়াটা বরাবর নাকি ওদের ভাত রাঁধত। রাঁধুনী বামুন, হঠাৎ হলেন ঠাকুরমশাই! সেই পাট-হস্তীর শুঁড়ে জড়িয়ে চাষার ব্যাটা চাষাকে রাজগদিতে বসানর গল্পটা ওর বরাতে সার্থক হয়ে গেল আর কি। তা যাক্, ভাই রাধারাণি, তোর ত মনে ধরেছে, তা হলেই সব লেঠা চুকে গেছে।"

বাণী প্রথমে মনে করিয়াছিল, নূতন পুরোহিতের সম্বন্ধে সে মঞ্জরীর সহিত কোন আলোচনাই করিবে না, কেন না, অম্বরনাথকে যখন বিদায় করিবার পথ নাই, তখন তাহাকে সহিয়া নিয়া কোনমতে চালাইয়া লইবার চেষ্টা করাই উচিত। বিশেষতঃ উহার অক্ষমতা কেবলমাত্র উহারই ত্রুটির পরিচায়ক নহে—তাহাদের পক্ষেও ত গ্লানিকর। কিন্তু ইন্ধনযুক্ত অগ্নি যেমন আপনাকে গোপন রাখিতে পারে না, তেমনি সখীর সহানুভূতি লাভে সে আর আপনার মনোভাব গোপন রাখিতে পারিল না। রুষ্ট অসন্তোষের সহিত তীব্রভাবে বলিয়া ফেলিল, "মনে ধরেছে ছাই, ওর চেয়ে তোমার আদি ঠাকুরপোও ঢের ভাল।"

মঞ্জরী নিজের মনে আত্মনাথের প্রচণ্ড দম্ভের জন্য তাহাকে তেমন পছন্দ করিত না, অথচ অম্বরনাথের উপরও তাহার বিদ্বেষের কোন কারণ বর্ত্তমান নাই। কিন্তু যতই হোক, আত্মনাথ তাহার আপনার জন, তাহার উপর জন দশেক ছাত্রের সহিত সে এখন তাহাদেরই অতিথি। তাহাদের স্বামী-স্ত্রীকেই তিনটি বেলা ইহাদের সকল হাঙ্গামা পোহাইতে হইতেছিল। এতগুলি পূরা খোরাকী প্রাণীর উপর তাহাদের যথেষ্ট পরিশ্রম ও পয়সা খরচ হইলেও, স্বামী স্ত্রী দুইজনের মধ্যে কেহই অতিথিগণকে সে সম্বন্ধে কোনরূপ আভাস দিতে পারে নাই। কিন্তু

অম্বরনাথেরও যেরূপ গতিক, তাহাতে তাহার এই ইঙ্গিত পদটি ব্যতীরেকে অন্য কোন উপায়েই তাহাকে বাটীর বাহির করিবার উপায় নাই। অবশ্য এ ছাড়া আর একটা পথ ছিল, কিন্তু সেটা ইহার চেয়েও শক্ত।—সেটা ঘাড়ে ধরিয়া বাহির করা।—কাজেই মঞ্জরী নানা অছিলায় অম্বরনাথকে ফাঁকি দিয়া কাটাইতে থাকিলেও আজ নিতান্তপক্ষে অসহ্য হওয়ায় বাণীকে এই কথাটা বলিয়া ফেলিল। আত্মপ্রবোধচ্ছলে সে নিজেকে বুঝাইল যে, আমি ত আর অম্বরকে মিথ্যা দোষে দোষী করিতেছি না—সত্য যা শুনিয়াছি, তাই বলিতেছি বই ত নয়। ইহাতে আমার আর দোষ কি? না হইলে এদিকে আমার বুড়া স্বামীর দুর্ব্বল ঘাড়টি যে ভাঙ্গিয়া যায়! করি কি?

মঞ্জরী কিন্তু সে দিন আর একটিবারও এ কথাটার উল্লেখ করিল না। সখীর কথায় সে স্পষ্টই বুঝিয়াছিল যে, অম্বরনাথের আসন স্বতঃই টলমল। আর সে আসন টলিলে যে তাহাদের গৃহের শান্তি পুনঃ সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা—এইটুকু জানিয়াই সে আপাততঃ আশ্বস্ত হইল।

সে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জরির কটিবন্ধটি তুলিয়া লইয়া উহা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে খপ্ করিয়া বলিয়া বসিল, "কবে এম্‌নি একটি পোষাক পরে আমার রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণ আস্‌বেন গো! আহা সই, সেই ভাবনা ভেবে ভেবেই, দেখ্ ভাই, আমি আধখানা হয়ে গেলাম।"

"কথায় বলে, 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়্‌সীর ঘুম নেই।' আমার জন্য তোর অত মাথাব্যথা কেন বল্ দেখি? আমার কৃষ্ণ ত দিন-রাত্তির আমার কাছেই রয়েছেন, আস্‌বেন আবার কোথা থেকে শুনি? আমি কি এক দণ্ড কৃষ্ণ ছাড়া? এই দেখ্, তাঁর জন্য এই তাজ করেছি, হীরে বসান নূতন বাঁশি গড়িয়েছি, এই চাদরে এই কাপড়ের মালা সব

নিজে হাতে কত যত্নে তৈরি করেছি। আমার তাঁকে আমি কত সেবা করি, কত আদর করি, সমস্ত মন প্রাণ স'পে দিয়ে এক মাত্র তাঁরই হয়ে দিবা রাত্রিই যে সেই দুখানি পায়ের তলায় পড়ে আছি। তোরা তোদের স্বামীকে কি এমন করে সাজাতে পারিস্? না, এমন ভালই বাসতে পারিস্? তারা পান থেকে চুণ খসলে ঝগড়া করে, দাসীর মত খাটিয়ে নিয়ে দুটো ভাল কথাও সকল সময় কয়ে উঠতে ফুরসৎ পায় না। রোগে ভোগে মরে, কত রকমে জ্বালায় বল্ দেখি? এই চিরকিশোর চিরনিরাময় চিরজীবী জগৎস্বামীকে ছেড়ে কে তোর মানুষের দাসীত্ব চায়? আমি তাই স্বয়ম্বরা হয়েছি।"

বাণী কথাগুলা খুব গম্ভীর মুখে বলিয়া গেল, কিন্তু তাহার সখী এত বড় কঠিন বিষয়টাকে তেমন শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার পিঠের উপর গড়াইয়া পড়িল। ইহার ফলে অকস্মাৎ নড়িয়া গিয়া সীবনকারিণীর আঙ্গুলে সূচ বিঁধিয়া গেল। সে চমকিয়া "উহুঃ" করিয়া উঠিল, কিন্তু মঞ্জরীর হাসির স্রোত তাতে বাধা পাইল না। সে বেদম হাসি হাসিয়া হাস্য গদগদস্বরে বলিতে লাগিল, "স্বয়ম্বরা হবার সাধ হয়েছিল ত আমায় বলিস্ নি কেন? তোর সয়া ত ঘরেই ছিল। গোসাই ঠাকুরটিরও তিলক সেবা টেবা করে থাকেন, না হয় একটি চুড়ো বেঁধেই নিতিস্। স্বয়ম্বরা হবি ত এখনও না হয় বল্? তাঁকে ঐ তাজটি পরিয়ে পীতবাস টাস দিয়ে পাঠিয়ে দিই? তা ভাই, নামেও বাধবে না। সেই বেশ হবে লো, বেশ হবে।"

বাণী রাগ করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া নিজে এক দিকে সরিয়া বসিল। ফুলের কুঁড়ির জন্য কাঁচি দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে জরি কাটিতে কাটিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে রাগের স্বরে বলিল, "তুই ভাই ভারি ছ্যাব্‌লা! আমি কি তামাসা করছি নাকি? সত্যি সত্যিই যে আমি

আমার দেহ মন প্রাণ সব আমার শ্রীকৃষ্ণকে "তুভ্যমহং সম্প্রদদে' বলে দিয়ে ফেলেছি। এগুলার উপর আর কারও দাবী দাওয়া নেই—, নিজেরও না। দেখিস্ তুই, এ আর কেউ পাচ্ছেন না।"

মঞ্জরী তথাপি বুঝিল না, সে তেমনি অবিশ্বাসমিশ্র বিদ্রূপের হাসি হাসিতে হাসিতেই কহিল, "দেখা যাবে গো, দেখা যাবে। এক মাঘেই কিছু শীত পালায় না, এখনি ত আর আমি মরছি নে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূজা করিতে গিয়া অম্বর এক মূর্ত্তিমতী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আসিয়াছিল, ইহার পর হইতে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় পূজারতির সময় সেই একই স্থানে সেই মর্ম্মর-প্রতিম অনুপম মূর্ত্তি সে দেখিতে পাইত। সে কে, কোথা হইতে আসে, তাহা সে জানিত না; জানিবার কৌতূহলও নিমিষের জন্য তাহার চিত্তে জাগে নাই। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রতিদিন সেই প্রতিমাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সে বর্ত্তমান দেখিত; পূজাশেষে তাহাকে সেইখানেই দেখিয়া চলিয়া আসিত। মন্দিরবাসী অন্য দেবদেবীদের মত সে মূর্ত্তিও এই মন্দির-সংশ্লিষ্ট বলিয়াই তাহার ধারণা জন্মিয়াছিল। সে দেখিত, সে মূর্ত্তির কোষেয় বসনের স্খলিতাঞ্চলে খস খস শব্দ হয় না, হস্তালঙ্কার ঝুমুঝুমু বাজিয়া উঠে না, যেন যথার্থই সেও একটি জীবনহীনা পাষাণমূর্ত্তি! কিন্তু অতর্কিতে যদি কখনও অম্বরের দৃষ্টি সেই মূর্ত্তির মুখে পতিত হইয়াছে, অমনি সে দেখিতে পাইত, সেই জীবনহীনাবৎ নিথর মূর্ত্তি তাহার সুপ্রচুর কৃষ্ণ তারকোজ্জ্বল চক্ষু দুটির তীক্ষ্ণ ভেদ্য দৃষ্টির দ্বারায় শুধু যে জীবনীযুক্তা বলিয়াই প্রতীতা হন, তা নয়,—সে দৃষ্টিও যে একটু নূতন, একটু অস্বাভাবিক। তাঁহার কোমল কালো চুলের তরঙ্গে, কোমল বঙ্কিম ভ্রূরেখার নিম্নে মর্ম্মরশুভ্র সুগঠিত কোমল চিবুকের তুলনায়, প্রবাল

রক্ত ক্ষুদ্র কোমল অধরোষ্ঠের সঙ্গে সেই বিদ্যুদুজ্জ্বল স্থির দৃষ্টি অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইত। তা হোক, সেজন্য কিছুই যায় আসে না। অনন্যচিন্তা সেই ভক্তিমতী পূজারিণীকে সে কিন্তু মনে মনে বড়ই শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিত। এই বয়সে এই রূপরাশি লইয়া এ কিশোরী শৈলজা উমার ন্যায়ই তপস্যাপরায়ণা, এ যে বড়ই আশ্চর্য্য! কিন্তু এই রহস্যময়ী তাঁহার সেই অন্তর্ভেদী যুগল নেত্র যে তাহার উপরেই সমস্ত ক্ষণ স্থাপিত রাখিয়া তাহাকে উলটিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন, এ তথ্য সহসা একদিন তাহার সন্দেহহীন চিত্তের নিকট প্রকাশিত হইয়া গেল। অম্বরনাথ সেদিন একবার চোখ উঠাইতেই দেখিল, সেই তীব্র অনুসন্ধাননিরত দৃষ্টি তাহারই উপর ন্যস্ত। সে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ দৃষ্টি নত করিয়া লইল, কিন্তু পূজার সময় কেহ এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে, ইহা মনে করিতে গিয়া তাহারও মনে একটু অশান্তি বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল, এইজন্য পূজাকালে পূজাস্থানে অন্যলোকের অবস্থান নিষিদ্ধ! ইহার ফলে সেদিন তাহার জড়িত ভাব অধিকতর বৃদ্ধিই পাইল। তারপর ক্রমে এ দৃষ্টিও সহিয়া গেল। মন্দিরের মধ্যে ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর ও বৃথোপকরণরাশি প্রথম দিন যেমন তাহার অনাড়ম্বর অভ্যাসকে পীড়িত করিয়াছিল, এখন সেগুলাও তেমন করিয়া আর দর্শন-পীড়া জন্মায় না; তেমনি সেই বাক্য-হীনা কিশোরীর কুণ্ঠাবিহীন পরীক্ষা দৃষ্টিও আর তাহাকে সঙ্কুচিত করে না। বরং অম্বর এখন সেই অনন্যচিন্তা শ্রদ্ধাময়ী নারীর অবস্থানকে ভক্তির সহিত দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার অকৃত্রিম দেবপ্রীতি তাহার মনে যেন কি এক অননুভূত আনন্দ ও গৌরব জাগাইয়া দিতে-ছিল। সে ইতঃপূর্ব্বে কখনও প্রতিমা পূজা করে নাই। ইহার ভক্তিতে সে দেব পূজায় নিজের মধ্যে যেন একটা ভক্তির বল লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

তাহার ঐ আনন্দের মধ্যে তাই বলিয়া কোন পার্থিব ভাব মিশ্রিত ছিল না। সে ইঁহার সৌন্দর্য্য ও নারীত্বের দিক হইতে ইঁহার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ অনুভব করে নাই। সে শুধু সেই গভীর মনোনিবেশের ছবিখানিকে ভক্তির শরীরিণী মূর্ত্তিরূপে দেখিত। সে মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার হৃদয়-সমুদ্রে ভক্তির তরঙ্গ উঠিত—উপাসনায় আগ্রহ বর্দ্ধিত হইত পাছে তাহার নিষ্ঠায় আঘাত লাগে, সেই ভয়ে সে যথাসাধ্য সশঙ্কিত থাকিত কিন্তু কাজে কতদূর কি ঘটিয়া উঠিত, তাহা সেও ঠিক বুঝিতে পারিত না। হয় ত সময় সময় অভ্যাসানুযায়ী পূর্ব্বের মতই ধ্যানে ও ভাবে তন্ময় থাকিয়া পূজার সকল কার্য্য ত্রুটিহীনভাবে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে না পারায়, তাহার অলক্ষ্যে প্রহরিণীর নির্ম্মল ললাট-গগনে ঘন মেঘ জমিয়া উঠিত।

এমন করিয়া একে একে কতকগুলি পর্ব্বদিন গত হইয়া গিয়া স্নানযাত্রা আসিয়া পড়িল। স্নানযাত্রা হইতে ঝুলন পর্য্যন্ত এই মন্দিরে দীর্ঘকালব্যাপী সমারোহ চলিতে থাকে। এবারও পূর্ব্ববৎ সাড়ম্বর আয়োজন চলিতেছিল।

স্নানযাত্রার যথাকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বিগ্রহ পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল, পুরোহিত যথাবিধি দেবার্চ্চনা করিতে বসিলেন। নূতন বস্ত্রালঙ্কারে নব অঙ্গরাগে দেবমূর্ত্তি সুন্দরতর দেখাইতেছিল; কৃষ্ণচূড়ায় এবার একখানি বহুমূল্য হীরক শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। এ রত্নখানি জমিদার দুহিতার কণ্ঠভূষণের জন্য জমিদারের উপহার। ইহার মূল্য অযুতাধিক মুদ্রা। কিন্তু সে তাহা তাহার ইচ্ছামত এটিকে দেব ব্যবহার্য্য করিয়াছে। কন্যাগত প্রাণ পিতার কন্যার সুখেই সুখ। তিনি মেয়ের ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে কোনদিনই চেষ্টা করেন নাই।

মন্দির বাহিরে বিবিধছন্দে বাদ্য বাজিতেছিল। সঙ্কীর্ত্তনের দল

করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছিল, "হরি, হরিবোল বল রে, গৌরহরি—"

এই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া মাসাবধি কাল প্রত্যহ অপরাহ্ণে সুসজ্জিত সভার মাঝখানে পুরোহিতঠাকুর মঞ্চারূঢ় হইয়া হরিকথামৃত বর্ষণ করিতেন। স্মৃতিতীর্থের সেই অমর স্মৃতি স্মরণে এবারও সে উদ্যোগ হইয়াছিল। ঠাকুর বাড়ীর মর্ম্মরবেদীকাসজ্জিত দরদালানের দুইপার্শ্বের কুঠারিগুলি আসনে পরিপূর্ণ; দ্বারে চিক্ খাটান। বাহিরে ঢালা জাজিমের উপর সহস্র শ্রোতার বসিবার স্থান। গিদ্দা তাকিয়া পুষ্পমাল্য, আতর, পান প্রভৃতি অভ্যর্থনাসূচক কোন উপকরণই এখানে বাদ পড়ে নাই। গ্রাম এবং গ্রামান্তরেরও অনেক ইতর ভদ্র এ সভায় স্থান পাইত। পল্লীগ্রামে জমিদার বাড়ীতেও দ্বারবানের লাঠি ভাঁজা কড়া হাত বড় সহসা কাহারও কণ্ঠে চন্দ্রার্দ্ধহার পরাইতে অভ্যস্ত নহে; এখানে এ সব সময় সকলেরই জন্য অবারিত দ্বার।

যথাকালে রূপার গাড়ু ও গামছা সম্মুখে লইয়া কথক ঠাকুর মঞ্চারোহণ করিলেন। একটি জুঁইয়ের গোড়ে মালা তাঁহার কণ্ঠে লম্বিত হইল, অপরটি তাঁহার মস্তকে চড়িয়া বসিল। আগ্রহশীল শ্রোতা ও শ্রোত্রীবৃন্দ দলে দলে আপন আপন স্থান গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভূমিকা ও প্রস্তাবনা করিয়া কথারম্ভ হইয়া গেল। কথক অম্বরনাথ। সেই মুখচোরা অম্বর—সে একটা লোকের সাক্ষাতেই কথা কহিতে কেমন যেন হইয়া যায়, এত লোকের সম্মুখে বিনাইয়া বিনাইয়া তালে ছন্দে কথার স্রোত প্রবাহিত করা কি তাহার সাধ্য! সে ঘামিতে লাগিল। কথা বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে থমকিয়া সে থামিয়া পড়ে, কণ্ঠ যেখানে তারায় তুলিতে হইবে, সেখানে উদারায় নামিয়া আসে, যেখানে হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিতে হইবে, সেখানে কণ্ঠ বাধিয়া স্বর

নবোঢ়া বধূর মত লজ্জায় অস্ফুটতর হইয়া আসিয়া হয় ত বা শেষে থামিয়াই যায়। বিষম বিপদ! শ্রোতার দল প্রসন্ন হয় না, বক্তা লজ্জায় মাটি হইয়া যাইতে চাহে! যে নিজের চিত্তরঞ্জন করিবার জন্য শুধু নীরবেই পাঠ করিয়াছে, সে আজ এত লোকের চিত্ত-রঞ্জিনী শক্তি কোথায় পাইবে? কিন্তু লোকে ত এ কথা বুঝে না।

চিকের অন্তরালে নারীদলের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বাণী কথা শুনিতে বসিয়াছে। অপর সকলে পান চিবাইতেছিল, দোখ্‌তা গুল চাহিতেছিল, ঘরকন্নার কথা অস্পষ্ট অর্দ্ধস্পষ্ট স্বরে বলা বলি করিতেছিল, কথকের কথার দিকে মেয়েদলের মধ্যে বড় একটা কাহারও কান ছিল না। এক বাণীই যেন সবাকার অমনোযোগ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিয়াছে। তাহার সকল ইন্দ্রিয় আসিযা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে—এমনি তন্ময়চিত্তে সে কান পাতিয়া কথকের কথাগুলা গিলিতেছিল। তা তাহার পক্ষে এ কিছু নূতন নহে, এমন সে বরাবরই করিত। বৎসর বৎসর এই একটী মাস ধরিয়া দিনের পর দিন এইরূপ স্পন্দহীন লোচনে চাহিয়া বক্তার প্রতি বচনটি কর্ণদ্বারা পীযূষধারার ন্যায় সে সেই এতটুকু বেলা হইতেই পান করিয়া আসিতেছে। আজও কি সেই সুধাস্বাদ সে তাহার ক্ষুধিত অন্তরে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাই তাহার এই নিবিষ্ট-চিত্ততা? না, তাহা সে পায় নাই। অভিনিবিষ্ট চিত্ত পরীক্ষক যেমন কান খাড়া করিয়া পরীক্ষার্থীর পাঠ শুনিয়া যায়, বাণীর স্থির মনোযোগের মধ্যে সেইরূপ একটা তীক্ষ্ণতা ছিল। বক্তা যতবার কথা থামাইয়া গলা ঝাড়িয়া স্বর শুদ্ধ করিতেছিল, ললাটের ঘর্ম্মস্রোত গাত্রমার্জ্জনীদ্বারা মুছিয়া অধরোষ্ঠ সিক্ত করিয়া লইয়া, ভীত শিশুর ন্যায় সঙ্কুচিত চিত্তে কথিতাংশ পুনরায় বিজড়িতকণ্ঠে আরম্ভ করিতেছিল, ততবারই থাকিয়া থাকিয়া অন্তরালবর্ত্তিনী বাণীর বঙ্কিম ভ্রূযুগল রুদ্ধ রোষে কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল—

তাহার দুই নেত্র হইতে ক্রুদ্ধ বিরক্তির তীব্র দাহ ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছিল। মুক্তা দন্তে অধর চাপিয়া কোন মতে শুধু নিজেকে সে বাহিরের লোকগুলার কাছে সংযত রাখিয়াছিল। কিন্তু মনের মধ্যে তাহার ক্ষোভ ও বিরক্তিতে বিদ্বেষের প্রবল ঝড় বহাইতে ছাড়ে নাই। অনেকবারই তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে, উঠিয়া সে এখান হইতে চলিয়া যায়।

পরদিন পূজা করিতে আসিয়া পুরোহিত মন্দিরাধিষ্ঠাত্রীর দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারিল না। লজ্জায় সে যেন আজ একেবারে মরিয়া গিয়াছে। রাত্রে জমিদারবাবু তাহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, তাহার 'ধ্রুব-চরিত্র' ব্যাখ্যান তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। রাধারাণী ইহাতে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই কথা লজ্জিত অম্বরকে অধিকতর লজ্জিত করিয়াছিল। একে অক্ষমতার মত লজ্জা জগতে বুঝি আর কিছুই নাই, তাহার উপর এতবড় একটা অনুযোগ। আবার তা ছাড়া—

হাঁ, তা ছাড়া আরও কিছু ছিল বই কি। রাধারাণীর ক্ষোভ! সেও ত বড় অগ্রাহ্যের জিনিষ নয়। সেই যে প্রতিমাখানি অকৃত্রিম নিষ্ঠার প্রতিকৃতিস্বরূপ দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি একভাবে একস্থানে দেবসেবিকার পদ লইয়া এ মন্দিরে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছে, দেবসেবার আনন্দমাত্র যে ইহজীবনের সার করিয়াছে, তাহার সেই আনন্দে ব্যাঘাত করে এমন মহা পাষণ্ড এ সংসারে কেহ আছে কি? তাই অম্বর লজ্জায় মরিয়া গেল। ছিঃ, সে কেন এমন অক্ষম হইয়াছিল? কত লোকে কত বড় বড় কাজ করিতেছে, আর এই এত সামান্য একটা কাজ তাহার দ্বারা সম্পন্ন হয় না? আবার এদিকে কত বড় বড় কল্পনায় সে যে ভোর হইয়া আছে! সে পাগল নাকি? তার দ্বারা নাকি কোন কিছুই সম্ভব নয়।

বাণী কিন্তু তাহাকে কোন কথাই বলিল না। পুরোহিতের সহিত কথা বলিবার তাহার বড় একটা প্রয়োজনই হয় না। সে স্বভাবতঃ স্বল্প-

ভাষিণী, পূজারীও তাই। প্রতিদিন নীরবেই দেবারাধনা নির্ব্বাহ হইয়া যায়। ভৃত্যগণ কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতে থাকে। নিজে সে দেব-অঙ্গে চামর ব্যজন করে, আরতির কর্পূর দীপ জ্বালিয়া চন্দন-চূর্ণ ধূনার সহিত অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করে, তারপর পুরোহিত পূজা শেষে চলিয়া যায়; বাণী অপ্রসন্ন মুখে চাহিয়া থাকে। আজও ঠিক সেই মত হইল। বাহিরে আসিয়া অম্বর জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। মন যেন তাহার বলিল, আঃ, বাঁচিলাম।

তারপর আবার অপরাহ্নে কথারম্ভ হইল। সেদিনও কথা ভালরূপ জমিল না। কথকের প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে কথনের একটুখানি উন্নতি দেখা গেলেও কথকতায় সে লীলা-সরস রসিকতা পাওয়া গেল না, অশ্রুহাস্যময় ভাবতরঙ্গ বক্তা ও শ্রোতাকে উদ্বেগ পুলক চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারিল না। কেবল অকৃত্রিম শ্রদ্ধাপূর্ণ গাম্ভীর্য্যে ভক্তি অবদানের ভারে মাথা নুইয়া আসে, গম্ভীর রহস্যবাণী প্রাণের নিভৃত প্রান্তে যেন কি এক অজানা বিস্ময় জাগাইয়া তুলে।—সভা ভাঙ্গিলে গৃহ-পথে সকলেই বলাবলি করে, "একি আবার কথা? ছাই, ছাই! এমন কথা ত তুমি আমিও বলিতে পারি।" কিন্তু যতক্ষণ কথকের কথা শেষ না হয়, ততক্ষণ মনটা বিদ্রোহের সুর ধরিতে চাহে না। মনে হয়, তা এমন মন্দই বা কি?

এ কথাটি খুব সত্য! নহিলে রাধারাণী এতদিন কথকতার সহিত হয় ত পরিচয় বন্ধ করিয়াই দিত। সে এটুকু বুঝিয়াছিল, এ'কথার মধ্যে সুখ দুঃখের ঝঙ্কার না উঠুক, বুকের মধ্যে প্রাণের হিল্লোল নাই বহুক, ইহার মধ্যেও কিছু একটা আছে। এ ধ্রুবের 'কোথায় হরি! কোথায় হরি!' শুনিয়া চোখে জল না আসিলেও মনে যেন একটু শান্তি আইসে। পরীক্ষিৎ রাজার তক্ষক দংশন কালে একজনও কান্নায় ফোঁপাইয়া

না উঠুক, সে নিজে কিন্তু সেইক্ষণে জীবনের নশ্বরত্ব অনুভব করিয়াছিল। তাই যখন রমাবল্লভ জিজ্ঞাসা করেন, "আজকের কথা কেমন লাগ্‌ল রে রাধারাণী ?" তখন সে ম্লানভাবে উত্তর দেয়, "ভাল না বাবা !" অথচ পরদিন আবার কথা শুনিতে যাওয়াও বন্ধ করে না।

এমন করিয়া দিন পনেরো কাটিল। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, পারিজাত-হরণ প্রভৃতি বাছা বাছা বিষয়গুলি কথিত হইয়া গেল। পারিজাত-হরণের পালাটা সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত এবারকার নারদ দুই সতিনীর নিকট ছন্দোবন্ধে পরস্পরের রূপ গুণ ও রন্ধন প্রভৃতির নিন্দা সুখ্যাতি করিল না। অভিমানিনী সত্যভামার চরণ ধরিয়া অশেষ মানভঞ্জ চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ সকলের সমবেত সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। মানিনীর সখীজনের সহিত রুক্মিণীর প্রাণসখার রহস্য বিদ্রূপে লোক হাসিল না। কিছুই হইল না। শুধু একথার হইতে সকলেই ক্ষুণ্ণ ও বাণী রুষ্ট হইল। ইহার উপর আবার ইহারই পরদিন অম্বর পূজা শেষে উঠিয়া গেলে, পুষ্পপাত্রে নেত্রপাত করিয়াই বাণী চমকিয়া উঠিল। এ কি সর্ব্বনাশ ! এ যে রক্তজবা ! এ কোথা হইতে এখানে আসিল ? এ কি অলক্ষণে কাণ্ড ! বৈষ্ণবের উপাস্য দেবমন্দিরে—শক্তি সাধনার উপচার ! একেই পূর্ব্ব দিনের কথকতার নিন্দা সর্ব্বত্র শুনিয়া শুনিয়া অম্বরের উপর সে হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছিল। তাহার উপর তাহারই এত বড় ধৃষ্টতা আজ আর কোন মতেই সে সহ্য করিয়া থাকিতে পারিল না। ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া ফুলগুলা পুষ্প-পাত্র হইতে তুলিয়া দ্বারের বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। কিন্তু এ কি ! দেব-চরণেও যে ঐ শোণিতরাগ ফুটিয়া আছে ! তখন সে স্তম্ভিত হইয়া গৃহতলে বসিয়া পড়িল। কোন্ ফুলে কোন্ দেবতার পূজা করিতে নাই, এটুকু পর্য্যন্ত যে জানে না, সে পুরোহিতগিরি

করিতে আসে কোন্ লজ্জায়? ঠাকুরমশাইয়ের চরম কালে কি এমনই বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়াছিল! ক্রোধে ক্ষোভে আশঙ্কায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। মনে মনে গর্জ্জিয়া বলিল, "বাবাকে তখনি বলেছিলাম, ওকে তাড়ান, তা ত হ'ল না। আচ্ছা দেখি, কেমন করে ওটাকে না তাড়ান হয়!" সে নিজে আজ সারাদিন অনাহারে মন্দিরে পড়িয়া থাকিবে, দেব-বিগ্রহ এখান হইতে তুলিয়া কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইবে, অথবা ইহাকে গলায় বাঁধিয়া চিত্রায় ডুবিয়া মরিবে। তাহা হইলে পিতা যদি পুরোহিতকে বিদায় দেন! এমন কত অনাসৃষ্টি কথাই যুগপৎ তাহার মনে উঠিতেছিল।

তারপর একটু মনঃস্থির হইলে উঠিয়া গিয়া সে ভৃত্যকে ডাকিয়া আদেশ করিল, "বামুনঠাকুরকে শিগ্‌গির করে ডেকে আন্।" সে রাগ করিয়াই, 'পুরুতঠাকুর' না বলিয়া তাহাকে 'বামুনঠাকুর' বলিল।

কালাচাঁদ বলিল, "রঘুঠাকুরকে ডাকব, কি দিদিমণি?"

"সব সমান!" বলিয়া ক্রুদ্ধা বাণী সগর্জ্জনে পুনশ্চ কহিল, "তাকে আমার কি দরকার বল্‌ত? কে পূজা কর্‌তে আসে, তাও কি দেখিস্ নি? চোখ দুটো থাকে কোথায়?"

"ওঃ, তাই বলুন না কেনে, ভস্‌চায্যিমশা'কে।"

ভৃত্য চলিয়া গেলে, বাণী তাহার রোষ-প্রদীপ্ত-দৃষ্টি আবার দেবচরণে ফিরাইল। ভক্ত হৃদয়ের ভক্তিরস শোণিতাক্ষরে যেন সেখানে ফুটিয়া আছে—চাহিয়া থাকা যায় না, এমনি উজ্জ্বল লাল! সে শিহরিয়া চক্ষু মুদিল। এ কি লীলা নাথ! এ কি তোমার লীলা? না, না, প্রেমাবতার তুমি, তোমার ত এ ভুষা নয়। একি তোমার সাজে? এ যে অট্টহাস্যময়ী নরমুণ্ডমালিনী নির্ম্মমতার প্রতিকৃতি করালীর বীভৎসভুষা চিহ্ন! তোমাতে ত হিংসা লেশ নাই! প্রাণময় প্রেমময়—যে তুমি! তবে এ কি?

এ পাপ যে আমারই! কিরূপে এই অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব? আমায় বলিয়া দাও, ঠাকুর! দয়া করিয়া আমায় বলিয়া দাও।

কালাচাঁদ ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, "ঠাকুরমশাই ঘরে নেই, আদ্দ ঠাকুর ছিল, বল্লে, চল্ আমিই শুনে আসি।"

বিমানমার্গ হইতে প্রেরিত কোন দেবতার বাণী যেন সেই মুহূর্ত্তে বাণীর কর্ণকুহরে আশার বাণীরূপে বাজিয়া উঠিল। আদ্যঠাকুর—আদ্যনাথ—আসিয়াছে? বুঝি ইহা দৈবপ্রেরণা? বুঝি তাই। বলিল, "আচ্ছা, তাঁকেই আসতে বল্।"

আদ্যনাথ অনেক কথা বলিল। বাণীর রোষ-ক্ষুব্ধ চিত্ত আজ একেই জলিয়া আছে, তাহার উপর সেই আগুনে অনেকগুলো ইন্ধন সে আজ যোগান দিল। আদ্যনাথ বলিল, "কলিকালে ন্যায় ও সত্যের জয় নাই, গুণের আদর কেহ করে না, নহিলে অম্বর—ভাত রাঁধা অবধি যাহার বিদ্যার দৌড়, সে জমিদার বাড়ীর সর্দ্দার রসুইয়া বামুনের পদ না পাইয়া পাইল কি না ছাত্রাধ্যয়ন এবং পূজা পাঠের অধিকার! এ সকল বুদ্ধি-বিদ্যার কার্য্য, ঘণ্টা নাড়িয়া ফুল ফেলিয়া মানুষকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু উপরে ত একজন সবই দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে কতদিন আর জুয়াচুরি চলিবে? একদিন না একদিন বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই ত। পূজায় ত এই—কথকতার ছেলেখেলা যে দিন দিন কিরূপ ভাঁড়ামির নিদর্শন হইয়া উঠিতেছে, তাহা যাহারা রাস্তা ঘাটে বাহির হয়, তাহারাই হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। ঘরের মধ্যে কান ঢাকিয়া বসিয়া সে আর কিরূপে কে বুঝিবে? লোকে ইতঃমধ্যেই বলাবলি করিতেছে যে, 'বেশ বুঝা যাইতেছে মৃত কর্ত্তার এমন অবিনশ্বর কীর্ত্তিটা দুই দিনেই লোপ পাইবে।' কিন্তু এ যে বড়ই পরিতাপের বিষয়!"

শুনিয়া বাণীর এতক্ষণকার যত্নায়ত্ত ধৈর্য্যের বাঁধ প্রায় ভাঙ্গিয়া গেল।

কঠোর দৃষ্টিতে আগুনাথের দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কথকতা করতে জান ?"

"নিজমুখে বল্লে লোকে অহঙ্কার বলবে—আমার মত কথকতা করতে এ তল্লাটে কারও সাধ্য নাই। একটি দিনমাত্র আপনি শুনলেই বুঝতে পারবেন।"

"একদিন কি—আজই আমি শুনতে চাই।"

আগুনাথ মনে মনে প্রীত হইল, কিন্তু মানটা আরও একটু বাড়াইয়া লইবার জন্য একটু অগ্রাহ্য দেখাইয়া কহিল, "আজই কি পারব ? সর্দ্দি হয়ে গলাটা ধরে আছে। তা ছাড়া—"

বাণীর যুগলভ্রূ গুণ দেওয়া ধনুর মত উর্দ্ধে বিস্তৃত হইল, দৃঢ় আদেশের স্বরে সে বলিল, "আজ না পারলে আর কোনদিনই পেরে কাজ নাই, কথা আমি বন্ধ করিয়ে দেব ঠিক করেছি।"

সর্ব্বনাশ! সভয়চিত্তে হরি স্মরণ করিয়া আগুনাথ ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "তবে আজই হবে! আমি আপনাদের অনুগত আশ্রিত, যখনি যা হুকুম করবেন, নির্ব্বিচারে তখনি পালন করতে কখন কুণ্ঠিত হব না, এ স্থির জানবেন। তাতে আমার দেহে প্রাণ থাকে আর যায়। আজই তা হলে বিকালে কথা আরম্ভ করব, কি বলেন ?"

"হ্যাঁ আজই।"

"আপনার হুকুম পেলেই হ'ল।"

"বেশ, এখন এর কি উপায় ?" অঙ্গুলিদ্বারা দেব চরণ দেখাইয়া সে স্থির নেত্রে ভট্টাচার্য্যের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?"

আগুনাথ প্রথমটা এ প্রশ্নের উত্তর ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে

নাই। তাই একটু ফাঁপরে পড়িয়াছিল, কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ রহস্যটা তাহার কাছে ফাঁস হইয়া পড়িল। যেন কোন বিভীষিকা দেখিয়াছে এমন করিয়াই আতঙ্কে তিনহাত পিছাইয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিল, "শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণবের মন্দিরে—বৈষ্ণব প্রতিমায় শক্তি উপাসকের রাঙ্গা ফুল! হায়, হায়, আরও যে কত কি-ই এই দুটো চক্ষে দেখতে হবে! এতে ত প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ মহাপাতক হয়েছে।"

"এখন উপায়?"

"উপায়? দেববিগ্রহকে পঞ্চগব্যে স্নান করিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সহস্র তুলসী দ্বারা মহাহোম, সার্দ্ধ সহস্র হরিনাম জপ, আর কাঞ্চনমূল্য বৈষ্ণবকে দান। তা সে মূল্যটা যে কত, তারও একটা নিয়ম প্রায়শ্চিত্ত পদ্ধতির দ্বাদশ অধ্যায়ে লেখা আছে, সেটা এখন আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না তবে এখনি পুঁথি দেখে বলে যাব। এমন আহাম্মক—অ্যাঁ! একেবারে কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত! ভণ্ড! পাষণ্ড!"

অম্বরনাথের নিন্দা আরও কিছুক্ষণ চালাইতে আদু ঠাকুরের অনুৎসাহ ছিল না, কিন্তু শ্রোত্রীর জ্বলন্ত ক্রোধ তখন সেই নিন্দার্হর নাম পর্য্যন্ত শ্রবণে অক্ষম। সে অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়া বলিল, "আগে হাত ধুয়ে তুমি ও ফুলগুলো ফেলে দাও আদুঠাকুর, আমার এখন আর কিছুই ভাল লাগছে না, মন আমার একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। তারপরে পুঁথি দেখে এস, আমি ততক্ষণ রঘু ঠাকুরকে ডেকে তুলসী টুলসী আনিয়ে প্রায়শ্চিত্তের উদ্যোগ করে রাখি। যতক্ষণ ও সব না শেষ হবে, আমি ত জলগ্রহণ কর্ত্তে পারব না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মধ্যাহ্নে জমিদারের তলব পাইয়া অম্বর সেখানে হাজির হইল। সবেমাত্র নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া আসিয়া রমাবল্লভ সেই মোটা তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় অম্বর গিয়া নমস্কার করিল। প্রতি নমস্কার ও আসন দিতে আদেশ প্রদানান্তর রমাবল্লভ কহিলেন, "শুনলাম, তুমি নাকি পূজার্চ্চনা যথাবিধি করিতে পার না। নিত্য নিত্য অভিযোগ শুনতে শুনতে আমি ত গেলাম।"

অম্বরনাথের পদতলে মৃত্তিকা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। অভিযোগ! কে করে? তিনিই কি? সে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। ভৃত্য আসন দিয়া গিয়াছিল, বসিবার কথা মনে হইল না। কি ত্রুটি হইয়াছে? কোন্ ভুলের জন্য এ অভিযোগ? স্পষ্ট করিয়া কি কিছু বলিয়া দিবেন?

রমাবল্লভ চিরদিন বিষয়-চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। সংসারের লোক চিনিতে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সেটুকু তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। দোষীকে দোষী বলিলেই সে যে লাফাইয়া মারিতে আসিবে, এই অনতিক্রমণীয় নিয়মের ব্যত্যয় আর কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে পড়ে না, তাই অপরাধ আরোপের পরও পুরোহিতকে নম্র ভাবে নীরব থাকিতে দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। সেই বিস্ময়ে পুনঃ পুনঃ অক্ষমতার শত ত্রুটির উল্লেখে ঝালা পালা হইয়া উঠায় অম্বর নাথের উপর তাঁহার যে বিরক্তিটুকু জন্মিয়াছিল, তাহারও অনেকখানি হ্রাস হইয়া গেল। তখন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা নরম সুরে বলিলেন, "পুঁথিটুথিগুলো একটু দেখে শুনে নিও দেখি। রাধারাণী বাবার আমল থেকেই দেব সেবা দেখছে, পূজোর ত্রুটি সে সহ্য করতে পারে না। আর আমিও বলি, সেটা উচিত নয়।

আচ্ছা, তা হলে এখন এস। তোমার কাজকর্ম্ম থাকতে পারে। আর যেন এ রকম অনুযোগ আমায় না শুনতে হয়, সে বিষয়ে একটু সাবধান হয়ো, নমস্কার।”

অম্বরের মনে তখন এই প্রশ্নটা উঠিয়া মুখে ফুটিতে চাহিতেছিল, কি দোষ কি ত্রুটি বলিয়া দিলে ভাল হইত যে ? কিন্তু এ প্রশ্নে একটা প্রচণ্ড গর্ব্ব প্রকাশ পাইবে বলিয়া সে সেই প্রশ্নটাকে রসনায় ফুটিতে দিল না। প্রভু যখন বলিতেছেন—পুঁথি দেখিয়ো, তখন নিশ্চয়ই সেখানে সে এই অজ্ঞাত ভ্রমের উত্তর পাইবে। নিশ্চয়ই একটা মস্ত ভুল লইয়া সে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক কাজে ফাঁকি দিতেছে বই কি। নহিলে তিনি এমন কথাটা বলিবেন কেন ? সে তাঁহাকে প্রতি নমস্কার করিয়া বিনীত স্বরে কহিল, “যে আজ্ঞে, আমি ভাল করিয়া পুঁথি দেখিব।”

অম্বরনাথ চলিয়া গেলে জমিদারবাবু কিছুক্ষণ সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন, তারপর দৃষ্টি সরাইয়া আনিয়া আপন মনে কহিলেন, “আমি ত ছেলেটিকে মন্দ দেখি নে, স্বভাবটি তো বেশ নরম সরম আছে। বাণীর কিন্তু ও যে দুচক্ষের বিষ। ওকে কাজ থেকে ছাড়াতে পারলেই ভাল হ’ত, কিন্তু আমার ত হাত নয়, করি কি ? কারো জন্যেই আমি আমার রাধারাণীর মনে এক তিল কষ্ট সইতে পারি নে, সেই যে আমার সর্ব্বস্ব !’

সে দিন অপরাহ্ণে অম্বরনাথ সংশয়পূর্ণ চিত্তে মৃদু চরণে ঠাকুরদালানে পৌঁছিয়া দেখিল, সেখানে তাহার অধিকৃত মঞ্চাসন অপরে অধিকার করিয়া লইয়াছে। স্ফীত বক্ষে টগর ফুলের মালা পরিয়া কণ্ঠস্বরকে কখনও পঞ্চম কখনও সপ্তমে চড়াইয়া কখনও ভৈরবীতে, কখনও বেহাগে, কখনও বা আবার ললিত রাগিণীতে উঠাইয়া নামাইয়া হাসাইয়া কাঁদাইয়া নদীতরঙ্গের মত অবলীলায় যে ইহাকে বাহিত করিয়া দিতেছে, সে আশুনাথ। সে দিন কথকতার মণ্ডপে যেন অগ্নি পরীক্ষা চলিতেছিল। কথক কথার স্রোতে

প্রাণের স্রোত ঢালিয়া দিতে চাহিতেছিলেন। কথকতার বিষয় ছিল, 'অভিমন্যু বধ'। ক্ষমতাশালী বক্তা সেই অতি করুণ প্রাণস্পর্শী মর্ম্মবিদারী দৃশ্যাবলী করুণরসসিক্ত ভাষায় অঙ্কিত করিতেছিলেন। ছন্দে, তালে সে ভাষা নৃত্যনিপুণা নর্ত্তকীর লীলা-নর্ত্তনের ন্যায়ই নাচিয়া চলিতেছিল, ভাব-সৌন্দর্য্যে সজল শ্যামল নবীন মেঘমন্দ্রের মতই স্তব্ধকারী অনির্ব্বচনীয় আনন্দলহরী প্রতি বক্ষে জমাইয়া তুলিতেছিল। করুণার মন্দাকিনীধারা পাষাণ ভেদ করিয়া ছুটাইতেছিল। সে ভাষা প্রাণস্পর্শী, স্বর অনন্ত-সাধারণ। বীর বালকের অতুল সাহস, অমিত পরাক্রম, শ্রোতৃদলকে উত্তেজিত করিয়া যেন রণক্ষেত্রে টানিতেছিল। তারপর সে কি উৎকণ্ঠা, কি বিপুল উদ্বেগ! শ্বাস বুঝি কণ্ঠের মধ্যে চাপিয়া আইসে। সপ্তরথী মিলিয়া এক অসহায় বালককে একসঙ্গে ঘিরিল। উঃ কি পাষণ্ড! কি নির্ম্মম! পিশাচ! পিশাচ! দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত ও হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল। প্রতিকার নাই?—ইহার কি প্রতিকার নাই? ধিক্, যদি না ওই অন্যায়কারী শত্রুপক্ষ দলিত করিয়া সপ্তরথীর লৌহ নিগড় মধ্য হইতে সোনার হরিণটিকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারা যায়, তবে শত ধিক্ এই জীবনে! কিন্তু—হায় রে, কোন উপায়ই হইল না। অন্যায় সমরে ভারতের ভবিষ্য-রবি অকালে অস্তমিত হইয়া গেল! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতুল, পিতা সব্যসাচী, পিতৃব্য মহাবল ভীম যাহার সহায়, সে আজ অসহায় অনাথের ন্যায় সপ্তরথীর সপ্তশরে শোণিতরঞ্জিত বিক্ষতাঙ্গে বসুধালিঙ্গন করিল। হায়, কোথায় রে সুভদ্রা জননি! তোর অঞ্চলের নিধি যে আজ চির বিদায়গ্রহণোদ্যত, তুই একবার জানিতেও যে পারিলি না? ওমা, বধূ উত্তরে! সর্ব্বানন্দময়ী বালিকা বয়সেই আজ তোর সকল সুখের অবসান হইতে চলিল, দেখিয়া যা!

দর্শকদল নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছিল; কোন কোন পুত্রশোকাতুরা

জননী হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন। বাণী নীরবে চক্ষু মুছিয়া কথকের মুখের দিকে চাহিল। সে মুখে কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য হইল না। চিত্রকরের তুলি যেমন চিত্রের মুখে ভাব প্রদান করে, বর্ণ সমাবেশে ইন্দ্রলয় নন্দনকানন রচনা করে, কিন্তু নিজে সে ভাল সম্পদের ধারও ধারে না যে এতগুলা লোকের বক্ষতলে এতখানি শোকস্মৃতিজাগ্রৎ করিতেছিল, সে নিজে যেন তাহার মধ্যে ধরা ছোঁয়াও দেয় নাই। সে বিস্মিত হইল, কিন্তু কথকের কথা-শাস্ত্রে অনন্য সাধারণ শক্তি দর্শনে নিরতিশয় প্রীতাও হইল। সে হইলে হয় ত এতক্ষণে আপনি কাঁদিয়া অপরের হাসির পথ মুক্ত করিয়া দিত।

সে দিন কথা শেষে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। সেই তাললয়যুক্ত মিষ্ট স্বর ও সঙ্গীতের উদ্দীপনা সঙ্গীত শেষ হইলেও বাণীকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিল। গীতটি ভক্তিরসে সরস। ভ্রাতৃরূপে পরিকল্পিত শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সদ্য পুত্র শোকাতুরা সুভদ্রার গীত। গীতটির মর্ম্ম এইরূপ :—সুখের উচ্চতম তুঙ্গ শৃঙ্গে স্থাপন করিয়া রাখিলে, এবার কি তমসান্ধকার অতল দুঃখগহ্বরতলে নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে চাও, তোমার ভদ্রা এই অসীম বেদনার অগ্নিজ্বালা সহিয়া তোমায় বিস্মৃত হয় কি না? হে কৃষ্ণ! হে যদুনাথ! সীতা, রাধা, সবার জন্যই ত তুমি যুগে যুগে এমনি পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়াছিলে। তবে জানিয়া শুনিয়া আজ আবার এই হীনাদপিহীনার জন্য এ আয়োজন কেন শুনি? হে অন্তর্যামিন্! জান না কি, তোমার দেওয়া এ জীবনের সকল আলোকও যদি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তথাপি তোমার আলো এ জীবন হইতে নিমিষের তরেও নিবিবে না। তুমিই আমার অভিমন্যু, তুমিই আমার অর্জ্জুন, তুমিই আমার বাসুদেব, তুমিই আমার আমি পদ-বাচ্য অহংজ্ঞান, তুমিই আমার সব, আমার সবই যে তুমি প্রভু!

কি সুন্দর! কি সুন্দর! বাণীর যুগ্ম নেত্র হইতে শিশির নির্ম্মল অশ্রুধারা তাহার সুকোমল আরক্ত গণ্ডতলে নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। যথার্থ—ইহা যথার্থ! আমি কি তোমায় আমার জন্ম ভালবাসি? তোমার জন্ম তোমায় ভালবাসি না? তবে হৃদয়ভরা অভিমান লইয়া কেন তোমার দ্বারে গিয়া দাঁড়াই? কেন পাইতে বিলম্ব হইলে, পাওয়া জিনিস খোয়া গেলে, তোমার উপর বিশ্বাসহীন হইয়া পড়ি? হে নাথ, হে প্রাণনাথ, অমনি দৃঢ় বিশ্বাস, ওই একনিষ্ঠ ভক্তি প্রেম আমায় দাও—আমায় দাও প্রভু! আর আমি কিছু চাহি না।

সঙ্গীতের শেষ কম্পন বৃহৎ খিলানের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ইহার পরেও কিছুক্ষণ কেহ বাক্যোচ্চারণ করিল না। সকলেই ভাবমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত রহিল। ক্ষণপরে হর্ষোৎফুল্ল মুখে চন্দন মাল্যাদি বিভূষিত নূতন কথক মহাশয় বিজয়দর্পিত চরণে তাম্রঘট হস্তে মহিলা মণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "মা জননীরা, শান্তিজল লউন, ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ!"

অন্য দিন শান্তিজল গ্রহণ করাইতে কথক-ঠাকুরের পদধূলি এখানে পড়ে না। আজ নূতন কথকের এই বিবেচনা বুদ্ধি দেখিয়া তাই বর্ষীয়সীগণ মহা সন্তুষ্ট হইয়া অঞ্চলে চরণাবৃত করিয়া বলিলেন, "দাও বাবা, দাও। আমার এই নাতনীটকে একটু ভাল করে মন্তর-টন্তর বলে-টলে দিও ত বাবা! মেয়েটা বড় ভুগচে; যদি তোমার ঐ শান্তিতে বাছা আরাম হয়ে যায়।"

পুরোহিত শান্তি পাঠ করিতে করিতে বাণীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ নেত্রে চাহিতেছিলেন। তাহার নত মুখে আশা ও আনন্দের ছায়ার মধ্যে একটা গভীর বিচলিত ভাবের চাঞ্চল্য স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। তাহা কি সেই শোণিতস্রোতরক্ত সরস্বতীকূলে বিশাল কুরুক্ষেত্রের বক্ষস্থলে অশ্ব-হ্রেষা-নাদ

শব্দিত অসি ঝন্‌ঝনান্বিত ভীষণ রণভূমে শত্রুসৈন্য বেষ্টিত অসহায় বীরকুমারের স্মৃতি ব্যথা ? অথবা পট্টশিবিরাভ্যন্তরবাসিনী সুখললিতা সদ্যোবিধবা বালিকা উত্তরার গভীর দুঃখে সহানুভূতি ?—অথবা এই জাগতিক আর কিছু ?

আত্মনাথ কহিলেন, "মা রাধারাণি, শান্তি জল নিন্ মা !"

বাণী বিস্মিতা হইয়া মুখ তুলিল। কথা থামিয়া গিয়াছে। সে এতক্ষণ যে ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই। এতক্ষণ সে মন্ত্রমোহে আচ্ছন্নাবৎ সুভদ্রার কথাই ভাবিতেছিল।—কি সে বিশ্বাসের দৃঢ়তা, কি অকৃত্রিম প্রেম ! মুখ তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে আত্মনাথ। ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "দিন্।"

আত্মনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনার মত ভক্তিমতী আমি ত এ পর্য্যন্ত কাকেও কখন দেখি নে। তা যেমন আপনার উচ্চবংশে জন্ম ! এ আর এমন বিচিত্র কি ? প্রবাদই আছে 'আকরে পদ্মরাগাণাম্ জন্ম কাচমনে কুতঃ'।"

বাণীর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আত্মনাথ যেন কি কুহক জানে। 'ভক্তি' এবং 'বংশ' এ দুইটাই যে বাণীর বড় গর্ব্বের ধন। তারপর নিজেকে ঈষৎ সামলাইয়া লইয়া একটু লজ্জার সহিত বাণী কহিল, "আপনিও ভক্তিতে কারও চেয়ে বড় কম নন। আজকার কথাগুলি কি মিষ্টিই শুনলাম ! এমন যেন আর কখনও শুনি নি। দিনটা যেন আজ সার্থক হয়ে গেল। কালও আপনি কিছু বল্‌লে বড় খুসী হব। বল্‌বেন ত ?"

আত্মনাথের সর্ব্বশরীর পুলকে শিহরিল। বৃহস্পতি গ্রহ এইবার বুঝি তাহার ভাগ্যাকাশের কেন্দ্রাভিমুখী হইলেন ! সে তখন মনের আনন্দ চাপিয়া স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর মুখে উত্তর দিতে গেল, কিন্তু পারিল না—সহসা একগাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, নিশ্চয় বলবো। আপনি খুসী

হয়েছেন ত? তাতেই আমার সকল শ্রম সার্থক হ'ল। ভক্তি—ভক্তির আমি কি জানি? তবে হ্যাঁ, এ কথা মানি যে বট বীজটি ক্ষুদ্র হলেও তারমধ্যে প্রকাণ্ড মহীরুহের শক্তি নিহিত আছে। যদি একবিন্দুও যথার্থ ভক্তি মনের কোণেও জাগ্রত থাকে, তবে একদিন না একদিন তা থেকে প্রেম সমুদ্র উথলে উঠতে পারে। যথার্থ ভক্তি—পরা ভক্তি, সেই পরা ভক্তিতে ভগবানের কাছে আপনাকে একেবারে সঁপে দিতে হবে। সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই চিন্তা। তাঁর সেবায় প্রাণ মন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা চাই। যদি প্রভুর প্রতি নিমেষের অবহেলা ঘটে, এ প্রাণ সেইক্ষণেই পরিত্যাগ করব। সে নিষ্ঠা এমন দৃঢ় হওয়া দরকার। শুধু তাঁকে নিয়ে খেলার সাধ মেটালে চলবে না ত। মা, এখন শান্তিজল নিন, আমি বিদায় হই।"

বাণী নীরবে মাথা নত করিয়া দিল, আত্মনাথের কথাগুলার মধ্যে যে খোঁচাটা ছিল, সেটা তাহাকে মর্ম্মের ঠিক মাঝখানে গিয়া বিঁধিতে ছাড়ে নাই। সঙ্কোচে লজ্জায় সে নিজের অধর দংশন করিল। এমন করিয়া তাহাকে ঠেস্ দিয়া কথা বলার জন্য আত্মনাথকে তীব্র ভাষায় দুই কথা শুনাইয়া দিতে তাহার ইচ্ছা হইলেও, কি ভাবিয়া সে কিন্তু ফলে কিছুই বলিল না।

নবম পরিচ্ছেদ

পূজা-পদ্ধতি, সৎকর্ম্মমালা এবং উপাসনা-খণ্ড পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়াও অম্বর তাহার দেবার্চ্চনার ভ্রম বাহির করিতে পারিল না। আচমন হইতে প্রণাম মন্ত্র সবই ত তাহার মনে মনে গাঁথা রহিয়াছে, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়। তবে? নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে পুঁথি কয়-খানি মলিন বস্ত্রে বাঁধিয়া সযত্নে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া সে নদীতীরে

একবার ঘুরিয়া আসিল। বর্ষার শ্যামলতায় পৃথিবী সরস হইয়া উঠিয়াছে, নদীর নির্ম্মল জল ঈষৎ পঙ্কিল, কিন্তু মহত্ত্বের গৌরবে অচপল। চিত্ররেখার বাঁধা ঘাটে জলের ধারে আসিয়া সে বসিল। ঘাট জনশূন্য ছিল। এমনই নির্জ্জন নদীর শোভা দেখিতে সে ভালবাসে। কিন্তু আজ সেই নববর্ষের সজল মেঘগৌরব, পরপারের গোলার্দ্ধের গাঢ় কৃষ্ণতার মধ্যে মধ্যে কদম্বের বিচিত্র বর্ণশোভা, কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। মন কেবলই বলিতেছিল, "কি ত্রুটি ঘটিতেছে, কে বলিয়া দিবে ?"

পরদিন পূজা করিতে যাইবার সময় মহেশ মণ্ডলের বেড়ার ধার হইতে আজও মহেশের কণ্ঠ শুনা গেল। সে ডাকিয়া বলিতেছে, "দাদাঠাকুর গো, ফুল কটা নিয়ে যাবেন নি ?"

"দিবি, আচ্ছা, দিয়ে যা।" অম্বর দাঁড়াইয়া সহাস্য মুখে মহেশের নিকট হইতে কদলী-পত্রে আবৃত জবা কয়টি গ্রহণ করিয়া ঠাকুর-বাড়ী চলিল। এত বড় পঞ্চমুখী জবাফুল সে অঞ্চলে কাহারও বাগানে ফোটে না।

সেদিন মন্দির মধ্যে একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বাণী আজ পূর্ব্ব-স্থানে নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে অম্বরের মনে হইয়াছিল, আজ শুধু উহারই নয়, মন্দির-সেবিকার নির্ভুল আয়োজনেও কি যেন ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু না—তাহারই ভ্রম। বাণী প্রতিমার পার্শ্বে নাই বটে, কিন্তু সে মন্দির ত্যাগ করিয়া যায় নাই, সে আজ পুরোহিতের আসনের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।

অম্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎশিখার ন্যায় বাণী সহসা তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল! অম্বরের দিকে চাহিয়াই তাহার প্রশান্ত ললাট গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিয়াছিল। অম্বরের হস্তস্থিত পত্রপুট লক্ষ্যে কঠিন স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওতে কি ?"

এরূপ ভাবে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় এবং স্বভাব বশেও কতকটা বটে, অম্বর একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল ; সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "ফুল।"

"ফুল! কি ফুল? ফুল আপনার যেখান সেখান থেকে বয়ে আনার দরকার বা কি? থালায় যে ফুল আছে, ওই ত পড়ে থাক্‌বে।"

বাণীর অধরে তীক্ষ্ণ শ্লেষের মৃদুহাস্য ক্রীড়া করিয়া উঠিল। সে হাসি চোখে না দেখিলেও তাহার কণ্ঠস্বরে ইহারই সুস্পষ্ট আভাস অনুভব করিয়া অম্বর অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া গেল, ঘাড় হেঁট করিয়া সে কোনমতে উত্তর দিল, "সেজন্য নয়। একজন লোক বড়ই শ্রদ্ধা করে দেয়, তাই ফেরাতে পারি নে। যদি—"

বাধা দিয়া তেমনি স্বরে বাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কে দেয় শুনি?"

"মহেশ মণ্ডল বলে একজন—"

"সে কি? তা হলে ত তিনি একটুও মিথ্যা বলেন নি! শূদ্রের ফুল দিয়ে আমার দেবতার পূজা হয়! কি ফুল ওগুলো, খুলুন ত দেখি।"

অম্বর পাতার মোড়ক খুলিয়া ফেলিল। ফুটন্ত রক্তজবা সম্মুখস্থ মসৃণ মর্ম্মর ভিত্তি গাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন ঘরের মধ্যে একমুষ্টি আবির ছড়াইয়া দিল। দুই পা পিছাইয়া গিয়া কেশর ফুলান সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বাণী ডাকিল, "পুরুতঠাকুর!"

অম্বর বিস্ময়ে এককালে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল চোখ দুইটা ঈষৎ উচ্চ করিল।

বাণী কহিল, "পুরুতঠাকুর! তুমি যে অত্যন্ত মূর্খ, তা জেনেও কোন মতে সয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আর নয়। যাও, তুমি এ মন্দির থেকে এখনি বেরিয়ে যাও। কাল বাবা তোমায় এত করে সাবধান করে দিয়েছেন, আবার আজ সেই কাজই তুমি করতে এলে। উঃ, কি সাহস তোমার! যাও তুমি, আমার ঠাকুর না হয় অমনি থাকবেন, সেও ভাল,

তবু অমন পূজা চাই নে।” বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত ক্রোধাভিমানে অভিভূত হইয়া সে মুখ ফিরাইল।

নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ অম্বরনাথ কিছুক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অপরাধটা যে কি, এতক্ষণে সে তাহা বুঝিয়াছে। শূদ্রের ফল গ্রহণের শাস্তি ভুলিয়া আবার সেই শূদ্রেরই ফুল গ্রহণ করিয়াছে, এমনি সে আহম্মক! আর তাহাও বরং মার্জ্জনীয় হইলেও হইতে পারিত। ইহার উপর আবার শ্যামের অঙ্গে শ্যামার প্রিয় চিহ্ন সে লিখিতে আসিয়াছিল। হায় রে মূর্খ! হায় রে অজ্ঞ! তোর এ অপরাধে কে ক্ষমা করিতে পারে, বল দেখি? শ্যাম যে শ্যামা নহেন,এ জ্ঞানটুকুও তোর এতখানি বয়সে জন্মিল না—তবে আর তুই কবে শিখবি?

বাণী তখন ক্রোধে গর্জ্জিতেছিল। সে অম্বরকে তদবস্থ দেখিয়া ভাবিল, বোধ হয় মূর্খ পুরোহিতটা এখনই নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া বসিবে। না, একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে? যেমন করিয়াই হোক ইহার হাত এড়াইতেই হইবে। বিশেষতঃ কল্যকার সুভদ্রা-সঙ্গীত তখনও প্রাণের তন্ত্রীতে ঝিম ঝিম করিয়া বাজিতেছিল। আদ্যনাথের তুলনায় অম্বর—চাঁদের কাছে খদ্যোতিকা! সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া দাসীকে ডাকিয়া আদেশ দিল, “আদ্দ ঠাকুরকে শীগ্‌গির ডেকে আন্। বলিস্ যেন স্নান করে পূজার জন্য একেবারে তৈরি হয়েই আসেন। একে নিয়ে আমার চলবে না।”

শূন্য মন্দিরের মর্ম্মর বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়া পুরাতন পুরোহিত দেব-চরণোদ্দেশ্যে প্রণিপাত পূর্ব্বক নূতনের জন্য আসন ছাড়িয়া দিল। এইরূপে তাহার পুরোহিতগিরির সমাপ্তি ঘটিল।

কারাগার হইতে বাহির হইবার জন্য বন্দীর মনে আগ্রহের সীমা থাকে না; আবার অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, মুক্তির হুকুম

আসিলে সেই কঠোর স্মৃতিপূর্ণ আশ্রয়টির জন্য চিত্ত একবারও অন্ততঃ পীড়িত হইয়া উঠে। দেবালয় হইতে বিতাড়িত অম্বরের মনেও আজ তেমনি একটা বিষাদ দুঃখ সঞ্চারিত হইতেছিল। দুঃখ? না, ইহাকে ঠিক দুঃখ বলিতে পারা যায় না। যেখানে মানুষের সুখ নিহিত থাকে, দুঃখ শুধু সেইখানেই। সুখের অভাবেই দুঃখ। তবে কি সেখানে তাহার সুখের কোন কারণ বর্ত্তমান ছিল? চতুষ্পাঠীর রন্ধনশালায় বসিয়া করলগ্ন-কপোলে বহুক্ষণ চিন্তা পূর্ব্বক এ কথার সম্পূর্ণ মীমাংসা সে করিয়া উঠিতেই পারিল না। সুখ! বুঝি কিছুই ছিল না। কই? সেই দেবগৃহে ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য ও বাদ্যভাণ্ড কোলাহলের মধ্যে ধ্যানের মন্ত্রবিস্মৃতির ব্যথাতেই ত সে কতদিন পীড়া বোধ করিয়াছে। সুখ ইহার মধ্যে কোথায় নিহিত ছিল? তবে কি পৌরোহিত্যের সম্মানহারা হইয়া সে আজ দুঃখিত? ভগবান রক্ষা করুন! বড়লোকের পুরোহিত হইবার আশা বা সাধ তাহার মনের কোণেও ত কখন উঁকি মারে নাই। ঘরের ক্ষুদ্র শালগ্রাম শিলাটুকুর মধ্যে নিরিবিলি বসিয়া সহস্রশীর্ষ পুরুষের প্রতিষ্ঠা করাতেই তাহার যথার্থ পূজাসুখ। অত বড় জাঁকালো মন্দির তাহার কাছে রাজপ্রাসাদের মতই প্রবেশ-কুণ্ঠায় দুরধিগম্য। তবে এ ব্যথাটুকু কিসের? অপরের মর্ম্মবেদনার পাত্র হইয়াছে, তাহারই লজ্জা? না, গুরুর বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া মনে একটা ক্ষোভ জন্মিয়াছিল? তা এ দুইয়ের কোন একটা, অথবা এ দুইটাই মনে জাগা কিছু আর এমন আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু সেটুকু ক্ষোভ মনে জাগিলে কি হয়, সেই সঙ্গে সে একটা অননুভূতপূর্ব্ব তীব্র আনন্দও সেই মুহূর্ত্তে অনুভব করিল। আর একজনের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের মধ্যে সে যে অন্যায়রূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে ত্রুটিটুকু যে মিটিয়া গিয়াছে, ইহাতেই সে চরিতার্থ হইয়াছে। বেশ হইয়াছে, এইবার অধ্যাপনার অযোগ্য ভারটুকু

হস্ত স্খলিত হইলেই সে নিশ্চিন্ত মনে শাপমুক্ত নক্রের মত অহিংস্র আত্ম-শরীর গ্রহণ করিতে পারে। মন্দিরোদ্দেশ্যে উৎফুল্ল মানসদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে যেন প্রত্যক্ষ করিল, ভক্তিভারনতা মন্দির-চারিণী স্মিত প্রসন্ন দৃষ্টিতে নূতন পুরোহিতের ত্রুটিহীন সাড়ম্বর পূজা সন্দর্শন করিতে করিতে আনন্দপরিপ্লুতা হইতেছেন। সেও তখন মন হইতে অবশিষ্ট ক্ষুদ্র গ্লানিটুকু ঝাড়িয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপ শান্ত চিত্তে নিজকার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

দশম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অম্বরনাথের অধ্যাপনা গ্রহণের প্রারম্ভে তাহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে অনেকেই অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ইহাদের অনেকগুলা আপত্তির মধ্যে একটা যুক্তি এই ছিল যে, তাহাদের চেয়ে বয়সে ছোট অধ্যাপককে তাহারা পণ্ডিতের সম সম্মান দিতে প্রস্তুত নহে। যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের লইয়াই এ কয়মাস এক রকম করিয়া চতুষ্পাঠী চলিতেছিল। আর এখানে তেমন পাঠ-কোলাহল নাই; চতুষ্পাঠীর প্রাণস্বরূপ আদ্যনাথের দলই চলিয়া গিয়াছে, কাজে কাজেই সেই সঙ্গেই কোন্দল, কোলাহল, হাস্য এবং পরিহাস সকল দিকেই ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছিল। এ ঘটনায় অনেকেই দুঃখিত। কেবলমাত্র দুই-একটি নিরীহ ছেলে নিশ্চিন্ত হইয়া বিনা বাধায় আহার নিদ্রা ও পাঠ সম্পন্ন করিতে করিতে হাঁফ ফেলিয়া বলিতেছিল, "দস্যুগুলা গিয়াছে, না বাঁচাইয়াছে।" যে কয়জন অন্তর্বিপ্লবের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া তিষ্ঠিয়া রহিল, সে কয়টি ছেলের মধ্যে অনেকেই যে অপেক্ষাকৃত নম্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট এবং বয়সেও তরুণ, তাহা বলা বাহুল্য। আজকাল অধ্যাপকের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা ইহারা কিছু প্রসন্ন হইয়াও

আসিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে পাঠ লইবার কালে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভূমিলগ্নচক্ষে চাহে না; সরাসর তাঁহার মুখের পানেই চাহে, অধ্যাপকের সঙ্গে কথা কহিতে হইলে নিজেরাই কহে, একজনকে মধ্যস্থ মানে না! আবার কখন কখনও আপনা হইতেই তাঁহার কাছে গিয়া দুরূহ বিষয়গুলা বুঝাইয়া লইতে দেখা যায়। তবু এখনও প্রায় অধিকাংশের বক্ষেই গুপ্ত আগ্নেয়গিরি অগ্নি-নিঃস্রাবের প্রতীক্ষা করিয়া সুপ্ত আছে, একেবারেই নিবিয়া যায় নাই। ঈর্ষা জিনিষটা এমনই ভয়ানক, যে ইহা দ্বারা প্ররোচিত মানব নিজের নাসিকাচ্ছেদন করিয়াও পরের যাত্রাভঙ্গ করিতে প্রস্তুত। এইরূপ ঈর্ষা জ্বালা দগ্ধ চিত্ত দু-একজন আত্মনাথের গোয়েন্দাগিরি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখানেই ছাত্রদলভুক্ত রহিয়া গিয়াছিল।

যেদিন অম্বরের পৌরোহিত্য ফুরাইল, সেদিন দ্বিপ্রহরে সে যখন খানকয়েক পুরাতন পুঁথি খুলিয়া কি একটা বিষয় সন্ধান করিতে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় একটি ছাত্র একখানা বটতলার ছাপা জরা জীর্ণ পুঁথি হাতে করিয়া সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছাত্রটির নাম সুধাকর। সুধাকর হরিবল্লভ-চতুষ্পাঠীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী ও বিনীত যুবক। অধ্যাপক পদারূঢ় হওয়ার পূর্ব্বে এবং পরে একমাত্র এই ছেলেটির নিকটেই সহপাঠী ও অধ্যাপকের প্রীতি এবং শ্রদ্ধা অম্বরনাথ লাভ করিয়া আসিয়াছে। সুধাকর আসিয়া কাছে বসিল, "ব্যস্ত আছেন কি? আমার কিছু বুঝিয়া লইবার ছিল।"

"বেশ ত, প্রশ্ন কর না, আমার এ কাজ পরেই হবে।"

সুধাকর পুঁথির মসীলিপ্ত অস্পষ্ট ছাপার অক্ষরে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিল, "বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসৎ" এ স্থানটা কিরূপ যেন গোলমাল ঠেকিতেছে। একটু বুঝিয়ে দেন দেখি!"

অম্বর পুঁথি উঠাইয়া রাখিয়া সম্মুখে একটু সরিয়া বসিল। তারপর অধ্যাপক ছাত্রে খুব ঘটা করিয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। ঘট পট, মৃত্তিকা তন্তু, কুলালচক্র, কুম্ভকার প্রভৃতি, কার্য্য কারণ উপাদান সমুদয় সঘন আলোচিত হইতে হইতে বিশ্বজগতের সৃজন হইয়া গেল। কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িলে একটা তর্ক উঠিল, আত্মা 'গুণপদার্থ' হইতে পারে কি না? ন্যায় বলিয়াছেন—আত্মা অচেতন ও আকাশের ন্যায় গুণবিশিষ্ট দ্রব্যরূপ; অচেতন হইলেও চৈতন্য গুণের সত্তা হেতু আত্মাকে সচেতন বলা যায়। কিন্তু আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা এবং সাংসারিক সুখ দুঃখের ভোক্তা। এই হেতু তিনি পরমেশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন। ন্যায়ের এই যুক্তির বিরুদ্ধে অম্বর সসঙ্কোচে নিজের স্বভাবসিদ্ধ বিষণ্ণ হাসি হাসিল—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ। ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।—সে কি এই গুণপদার্থ?"

"কেন নয়?"

কেন নয়! আনন্দময়-কোষ সুষুপ্তিকালে পঞ্চকোষের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে। পঞ্চকোষের মধ্যে তাহাই প্রথম। তাই তাহাকে আত্মা বলা হইয়া থাকে। চেতন প্রভৃতি তাঁহারই গুণ। অতএব ইহাদের মতে আত্মা চেতন-গুণবিশিষ্ট অচেতন পদার্থ। কিন্তু শ্রুতি আত্মার অচেতনত্ব সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্ব পুনঃ পুনঃই অস্বীকার করিয়াছেন। পঞ্চকোষ যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর লইয়া, সাংখ্য পাতঞ্জল ও বেদান্ত-কার ইহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। "আনন্দ-প্রতিবিম্ব-চুম্বিত-তনুবৃত্তিস্তমোজৃম্ভিতাস্যাদানন্দময়ঃ প্রিয়াদিগুণকঃ স্বেষ্টার্থ-লাভোদয়ঃ— হইতে "নৈবায়মানন্দময়ঃ পরাত্মা ইত্যাদি ইহার বিপরীত প্রমাণ।"

সুধাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এই শ্লোকটি কাহার রচিত? এ সকল কোন্ প্রমাণের অন্তর্গত?"

কোন্ প্রমাণের? কেন, আপ্ত। ভগবান শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত 'বিবেক চূড়ামণি' গ্রন্থে এ বিষয়ের তিনি যথেষ্টই বিচার করেছেন।"

"আপ্ত! কিন্তু শুনেছি শঙ্করাচার্য্যকে অনেকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে থাকেন। আমি অবশ্য এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। কারণ শঙ্কর সম্বন্ধে আমার নিজের জ্ঞান কিছুই নাই—কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি নাকি মায়াবাদী, তিনি—এমন কি ব্রহ্মবাদও সুস্পষ্টরূপে স্বীকার করেন নাই।

অম্বরের শান্ত মুখে ঈষৎ বেদনার চিহ্ন প্রকটিত হইল। সে একটু বেগের সহিত উত্তর করিল, "তাঁহার সমালোচনা করিবার আমরা কি যোগ্য, যে তাঁকে বিচার করিব? তিনিই না নিরীশ্বর শূন্যবাদী বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্লাবন হইতে আসমুদ্র হিমাচল এই ভারত-ভূমিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন? তিনি না সংস্কৃত ভাষায় দেবদেবীগণের যত সুললিত স্তবমালার রচয়িতা? কেমন করিয়া বলিব যে, তিনি ব্রহ্মবাদীও নহে?

সুধাকর এই কথায় কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিল; পরে বলিল, "তা সত্য, "নিত্যানন্দকরী" বলিয়া তিনি যে প্রকৃতি-মাতার স্তব করিয়াছেন, তাহাতে তাঁর দেবী-ভক্তির অভাব ত দেখা যায় না। কিন্তু সেদিন আদ্যনাথ ঠাকুরের নূতন চতুষ্পাঠীতে বেদান্তশাস্ত্র সম্বন্ধে এক পণ্ডিতের সহিত ঘোরতর বিচার চলিতেছিল। আমিও সেখানে তখন উপস্থিত ছিলাম। শুনিলাম আদ্য ঠাকুর শঙ্করাচার্য্যের তত্ত্বকে নাস্তিক্যবাদ বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শঙ্কর বহুস্থানে ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তে-হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি" প্রভৃতি পদপ্রয়োগ দ্বারা ব্রহ্মকেও অনিত্য এবং মায়াকল্পিত বলিয়াছেন না? অন্ততঃ তিনি তো এই লইয়াই মহাতর্ক জুড়িয়া দিয়াছিলেন।

অম্বর প্রতিবাদ করিল না, করা উচিত নয় বিবেচনা করিল বলিয়াই তাহাতে নিবৃত্ত রহিল, মনে মনে ভাবিল, এ সকল বিষয় লইয়া তর্ক না

তোলাই ভাল। এই জন্যই ত শাস্ত্রে, বিশেষতঃ বেদান্তশাস্ত্রে আছে, শিষ্য অর্থাৎ যে সম্পূর্ণরূপে শাসন স্বীকার করিয়াছে, তাহাকে ভিন্ন অপরের কাছে বেদান্তমত প্রচার করিতে নাই ; এবং এই এক কারণেই সকলকে বেদে অধিকার দেওয়া হয় না। প্রকৃতি স্বতঃই বিভিন্না। কাজেই জগতে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হওয়া ব্যতীত উপায়ই বা কি ?

তাহাকে নীরব দেখিয়া সুধাকর ভাবিল, হয় ত তাহার মন্তব্য অধ্যাপককে একটু ব্যথিত করিয়াছে। সে জানিত, অম্বর এই মতটার বিশেষ পক্ষপাতী। তাই একটু লজ্জিত হইয়া ত্রুটি স্বীকারের ভাবে সে বলিয়া ফেলিল, "আদ্য ঠাকুর নিজের মতের বিরুদ্ধে লাঠি চালাতেও গররাজি নহেন। তার কথা আমি ধরি নে। আপনি তা হলে আত্মা ও ঈশ্বরের একত্ব স্বীকার করে থাকেন ?"

অম্বর কহিল, "আত্মা ও ঈশ্বরের ? আত্মা ও পরমাত্মার বল। আমি কি স্বীকার অস্বীকার করিব ? বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ গীতা এই অখণ্ড সত্যই প্রমাণ করিতেছেন যে—"

অম্বরের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নবীনমাধব গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ অখণ্ড সত্য প্রমাণ করিতেছেন ?"

হঠাৎ তৃতীয় ব্যক্তির অভ্যুদয়ের দুই জনেই একটু চমকিত হইয়া গিয়াছিল। সুধাকর সর্ব্বাগ্রে বিস্ময়ের ভাব সামলাইয়া লইয়া অম্বরের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিল, "এমন কিছুই নয়, আমি এই পড়াটুকু পণ্ডিতমশায়ের নিকট জানিয়া লইতেছিলাম।"

নবীন মুখ টিপিয়া একটুখানি বক্র হাসি হাসিল, বলিল, "পড়া জানিতে ছিলে, সে ত বেশ করিতেছিল। তাহাতে 'এমন কিছু নয়' বলিয়া 'শাক দিয়া মাছ ঢাকা' দিবার দরকার কি ? তোমার গুপ্ত বিদ্যা ত কাড়িয়া লইব না। তা ঠাকুরমশায় কি যে প্রমাণের কথা বলিতে-

ছিলেন, বলুন না। চুপ করিলেন কেন? হইলই বা সুধাকর আপনার প্রিয় ছাত্র 'অর্জ্জুন', তাই বলিয়া 'দুর্য্যোধনে'র কি একটু আধটু শুনিতে সাধ যায় না? আপনাদের কিসের কথা হইতেছিল?"

সুধাকর অধ্যাপকের জন্য ভীত হইতেছিল। সে জানিত যে, নবীন-মাধব আস্তনাথের নিয়োজিত গুপ্তচর, এই নবীন অধ্যাপকের ছল ধরিবার জন্যই উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছে। সহসা উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি একশোবার 'প্রিয়ছাত্র' কর? প্রিয় বা অপ্রিয় হয় মানুষ নিজের নিজের ব্যবহারে। আর কিছুতেই সেটা হওয়া যায় না।"

এই সময় অম্বর ধীরস্বরে উত্তর দিল, "আমাদের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কথা হইতেছিল! সুধাকর আত্মার একত্ব অস্বীকার করায় আমি তাকে বুঝাইতেছিলাম যে বেদান্ত উপনিষদাদি গ্রন্থ এই অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য—"

"তিনি যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁর বাক্য ত আপ্তোক্তি নহে—"

অম্বর অতি মৃদু হাসিল—"শঙ্কর শঙ্করসাক্ষাৎ—আর তিনি বৌদ্ধ হইলেই বা ক্ষতি কি? বুদ্ধ-শিষ্যগণের বুঝিবার ভ্রমে যে নিরীশ্বরবাদ স্থাপিত হইয়া দেশের ক্ষতি করিতেছিল, তাহা তাঁহার দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে।"

এই উত্তেজনা বিহীন অতি সহজ, অথচ অখণ্ডনীয় যুক্তিটুকুকে উড়াইয়া দিবার কিছু পথ না পাইয়া নবীনমাধবের চোখ মুখ পরাজয়ের রাগে রাঙ্গা হইয়া উঠিল, "বুদ্ধের প্রতিও আপনার অগাধ ভক্তি দেখিতেছি যে! আপনার মতটতগুলা আমাদের মত মূর্খের ধারণা করাই দুরূহ। বৈষ্ণব হইয়া শাক্তাচার গ্রহণও করিয়া থাকেন। ন্যায় পড়াইতে বসিয়া বেদান্তের যুক্তি টানিয়া আনিয়া তাহার খণ্ডন চেষ্টাও করেন। আবার বুদ্ধমতকেও আস্তিক মত বলিতেও দেখি আপত্তি নাই! আপনি তাহা হইলে আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেন না! কেমন?"

"আত্মার বহুত্ব! আমি কি স্বীকার অস্বীকার করিব? আমি অতিক্ষুদ্র ব্যক্তি, কিছুই আমার জ্ঞান নাই। শাস্ত্র নিজেই ইহা অস্বীকার করিয়াছেন।"

"এ অধ্যাপকের নিকটে আমরা শিষ্যত্ব স্বীকারে অপারক! তৃণাদপি তৃণতুল্য সামান্য প্রাণী হইয়া বামনের চাঁদ ধরবার সাধের মত এত বড় স্পর্দ্ধার কথা যে মুখে উচ্চারণ করিতেও সাহস করে, সে কি না পারে? এ কথা আমাদের মত কীটস্য কীটগণের কর্ণে শুনিলেও পাপ—মহাপাপ হয়। আজই ইহার প্রতিবিধান হওয়া উচিত। নচেৎ এই শাস্ত্রশিক্ষার চতুষ্পাঠী খৃশ্চান মিশনারীর মিশন স্কুলে পরিণত হইতে কিছুই বাকি থাকিবে না। এ আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি।" নবীনমাধব রাগে ফুলিয়া আটখানা হইয়া চলিয়া যায় দেখিয়া, সুধাকর তাহার উত্তরীয় ধরিল, সবিনয়ে কহিল, "আরে দাদা শুধু শুধু চটেই গেলে যে! বলি কথাটাই শোন না—

"আমি তোর মত খোসামুদে নই। ভণ্ডের সংস্রবে থাকিতে ঘৃণা বোধ করি। এখনই এই জমিদার বাড়ী চলিলাম। দেখি প্রতিকার হয় কি না। আঁ, আত্মা ও পরমাত্মা এক! এই কৃমিকীট তুল্য হেয় মনুষ্য ও সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরে ভেদ নাই? মহাভারত! মহাভারত! অশ্রাব্য! এ গর্ব্বিত প্রলাপ একেবারেই অশ্রাব্য!"

নবীন চলিয়া গেলে, সুধাকর কহিল, "আদ্দি ঠাকুর ওকে চর রেখেছে। ও নিশ্চয় আমাদের সব কথা আড়াল হতে শুনিয়া ঝগড়া করিবে বলিয়া তৈয়ার হইয়াই ঘরে ঢুকিয়াছিল।"

অম্বর কেবলমাত্র উত্তর করিল, "তা বেশ ত!"

সুধাকর তাহার অবিচলিত ভাবে ঈষৎ বিস্ময়বোধ করিয়া পুনশ্চ কহিল, "সত্যে মিথ্যায় ওরা অনেক কথাই রটনা করে আপনাকে বিদায় কর্ব্বার ফিকিরে আছে সেটা আপনি দেখছেন না?"

একটুখানি ক্ষমাপূর্ণ হাস্য অম্বরের রক্তিম অধরপ্রান্তে প্রকটিত হইল, এবারও সে তেমনি নিরুদ্বেগে শান্তস্বরে কহিল, "ক্ষতি কি সুধা ?"

সুধাকর শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, মনে মনে বলিল, "এমন লোকেরও সংসারে শত্রু হয় ?" প্রকাশ্যে আর কিছুই সে বলিল না। জানিত বলা বৃথা !

সেই দিনই রমাবল্লভ অম্বরকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, বড় দুঃখিত হইলাম, কাল আমার কাছে অঙ্গীকার করিয়া গেলে, আজই সে প্রতিশ্রুতি রাখিতে পারিলে না ? রাধারাণী ত কোন ক্রমেই আর তোমায় পূজা করিতে দিতে সম্মত হয় না। টোলের ছাত্রেরা তোমার নিকট পড়িতে অসম্মত। আমি একা আর কাহার সহিত কত যুঝিব, বল ? তার চেয়ে উইলের নিয়মানুসারে এখন অন্যলোক নিয়োগ করাই বোধ করি ভাল। কি বল তুমি ?"

নতমুখে অম্বর কহিল, "যে আজ্ঞে।"

রমাবল্লভ নালিশ ফরিয়াদের জ্বালায় অতিশয় উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিযা-ছিলেন। অম্বর এত বড় পদটা এক কথায় ছাড়িয়া দিতে এতটুকু মাত্র আপত্তি করিল না দেখিয়া তিনি খুসীই হইলেন। কতকটা বিস্ময়ের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রসন্নস্বরে বলিলেন, "তোমার দোষ নাই, তুমি ত তোমার অক্ষমতার বিষয় প্রথম হতেই জানিযেছিলে। তা যাক্, তুমিও ত এজন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নও ? তখন, যে এ পদ চাহিতেছে এবং যাহাকে সকলেই চাহিতেছে, সেই-ই এটা লউক না কেন ? কি বল ?"

অম্বর তাঁহাকে বিনম্র নমস্কার করিয়া পুনশ্চ ঐ একই উত্তর দিল, "যে আজ্ঞে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

একটি অনতিবৃহৎ উদ্যানের মধ্যে মধ্যমাকারের একটি দ্বিতল অট্টালিকা। তাহার বহির্ব্বাটির ঘরটি বিচিত্র সাজে সজ্জিত ; দ্বিতলের মুক্ত বাতায়ন হইতে উজ্জ্বল দীপালোক অন্ধকার গৃহোদ্যানের অস্ফুট-জ্যোৎস্নালোকের ন্যায় বিকীর্ণ হইয়াছে ! সেই আলোটুকুতে স্থানে স্থানে সুগন্ধি ফুলে ফুলে ভরা গাছ কোথাও বা পাতা-বাহার বৃক্ষশ্রেণীতে পাতার বাহার দৃষ্ট হইতেছিল। আবার মধ্যে মধ্যে কক্ষমধ্যস্থ লোকজনের উঠা বসা চলা ফেরার চলন্ত ছায়ায় সে আলোটুকুও নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছিল। যেন অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের খেলা চলিতেছে।

কক্ষমধ্যে ঢালা বিছানা, মোটা তাকিয়া, ঝাড়ের আলো, টানা পাথার হাওয়া কিছুরই অভাব ছিল না। এক পাশে একটা শুভ্র আস্তরণ-যুক্ত বিবিধ বর্ণের কাঁচের সাজসরঞ্জামপূর্ণ টেবিল, তাহার দুই পার্শ্বে দুই চারিখানা কেদারাও আছে। গৃহ-ভিত্তি চিত্রমণ্ডিত, পুষ্প ও পুষ্পসার সুরভিতে কক্ষ বায়ু অতিভারগ্রস্ত, এস্‌রাজ, বেহালা ও পাখোয়াজের মধুর রাগে গৃহাকাশ প্রতিধ্বনিত। সেই সব শিক্ষিত হস্তের সম্মিলিত যন্ত্রস্বরের সহিত মিষ্ট কণ্ঠস্বর মিলাইয়া প্রসিদ্ধ সুন্দরী জহরা বাই গায়িতেছিল, "যমুনাকি তীরওয়া কালা বাঁশরী বাজাবে হো।"

গৃহমধ্যস্থলে মোটা তাকিয়ার উপর হেলিয়া পড়িয়া গৃহস্বামী মৃগাঙ্ক-মোহন বন্ধুপরিষদবেষ্টিত হইয়া একাগ্র চিত্তে সেই গান শুনিতেছিল। বন্ধুরা কেহ হাতে তালি দিয়া, কেহ ভূমে চরণাঘাত দ্বারা তাল দিতেছিল। কেহ বা ভাবাবেশে সঙ্গে সঙ্গে মস্তকান্দোলন পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ ও উৎসাহ প্রদান করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আলবোলায় অম্বরী তামাকু পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইতেছিল।

অনেক রাত্রে নৃত্য গীত বন্ধ হইল, পান ভোজন সমাপ্ত হইল, এবার বিশ্রামের পালা। বন্ধুগণ স্থানীয়, যে যাহার গৃহে ফিরিয়া গেল। দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া বাইজী ওস্তাদ সমভিব্যাহারে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গৃহস্বামী স্ফূর্তিযুক্ত সুপ্রফুল্ল চিত্তে গুন্ গুন্ করিয়া খাম্বাজ রাগিণীতে একটা নূতন সুরের গান গায়িতে গায়িতে অন্দর মহলে প্রবেশ করিল।

'বাহিরে কোচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তন' বলিয়া যে কথাটা মেয়েলি শাস্ত্রে প্রচলিত আছে, অনেক সময়েই সেই শাস্ত্রার্থটা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; কিন্তু এ বাড়ীতে সেটুকু যেন আরও একটু সুপ্রত্যক্ষ। বাহিরে যত আলো যত আড়ম্বর, যত আনন্দ; ভিতরে তেমনি অন্ধকার, অনাড়ম্বর ও নিরানন্দ। সহসা দেখিলে মনে হয়, বুঝি এখানে কোন মনুষ্য বাস করে না। মৃগাঙ্কমোহন সম্মুখের অন্ধকারাবৃত লম্বা দালানটায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "দিদি গো—" কেহ উত্তর দিল না। একটা চামচিকা সেই শব্দে চকিত হইয়া কড়িকাঠের ফাটাল হইতে বাহির হইয়া উড়িয়া গেল। বাহিরে গাছের মধ্যে একটা কালপেঁচা কর্কশ শব্দে ডাকিয়া উঠিল। যেন তাহারা দুইজনেই এক সঙ্গে এই কথাটা বলিতে চাহিতেছিল যে, রাত্রের এই নিভৃত অবসর শুধু আমাদের জন্য, এখানে এখন তুমি কেন? কিন্তু সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। তাহার আধিপত্য সকল সময় এবং সবার উপর, সে ঐ যুক্তিটুকুতেই বা দমিবে কেন? পঞ্চমের স্বর সপ্তমে চড়াইয়া সে আবার ডাকিল, "দিদি, ওগো দিদি, শুনে যাও।"

এবারও কেহ সাড়া দিল না। যেহেতু প্রমোদমগ্ন ব্যক্তিটির হিসাব না থাকিলেও রাত্রি তখন গভীরা এবং 'দিদি' নাম্নী জীববিশেষটি সে সময় গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিতা। কিন্তু একটু পরেই খট্ করিয়া একটা ঘরের খিল খোলার শব্দ শুনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ মুক্ত দ্বার পথে গৃহমধ্যস্থ

প্রদীপালোক সেই নিবিড় অন্ধকারের উপর তীক্ষ্ণধার ছুরিকার ন্যায় মুহূর্ত্তে পতিত হইয়া তাহার অখণ্ড বপু ঈষচ্ছিন্ন করিয়া দিল। মৃগাঙ্কমোহন মুহূর্ত্তে সেইদিকে ফিরিল, দ্বারের দিকে চাহিতেই তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া অপ্রসন্নতায় পরিণত হইয়া আসিল ; কিন্তু একটু ইতস্ততঃ করিয়া পরিশেষে সে সেইদিকেই অগ্রসর হইল। বোধ করি মনের মধ্যে তখন কিসের এতটুকু একটু লজ্জা ও স্বার্থ সাধনের দায়িত্ব দুই-ই এক সঙ্গে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

ঘরখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, গৃহসজ্জাও দারিদ্র্য-ব্যঞ্জক নহে। খাটের উপর অব্যবহৃত পরিচ্ছন্ন শয্যাটি বিস্তৃত, ঘরের মেঝেয় বিছানো মাদুরের উপর একখানা পুস্তক খোলা রহিয়াছে, তাহার নিকটেই পিত্তলের পরীমূর্ত্তি পিলসুজের মাথায় মৃন্ময় দীপ তৈলাভাবে ম্রিয়মাণ। মৃগাঙ্ক-মোহন দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে দেখিতে পাইল একপার্শ্বে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আধখানা মুখ ঢাকা দিয়া একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি বুঝি ঘুমিয়েছেন ?" উত্তর না পাইয়া আবার সে কহিল, "তাঁকে বলো, আমি ভোরের গাড়ীতেই বেরিয়ে যাব, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না বলে তিনি যেন রাগ না করেন।"

গৃহমধ্যবর্ত্তিনী অল্পবয়স্কা, বয়স সতের-আঠার বৎসরের অধিক হইবেনা, দেখিতে বড় সুন্দরী—সচরাচর এমন সুন্দরী চোখে পড়ে না। সে এই অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কিছুই বলিল না, কথাটা কানে গিয়াছে কিনা, এমন কোন চিহ্নও প্রকাশ করিল না। যেমন ছিল তেমনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লজ্জায় জড়সড়ও হইল না, অথবা কোন প্রকার আনন্দের ভাবও ব্যক্ত করিল না, তাই এ ব্যক্তির সহিত তাহার যে কি সম্বন্ধ সেটাও ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। কেবল তাহার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের সমতাল সহসা একটুখানি দ্রুত হইয়া উঠিয়াছিল এইটুকুই

জানা গেল। সে একটুখানি ঘাড় নাড়িয়া একটা স্বীকারোক্তি করিলেই সহজে সব চুকিয়া যাইত; কিন্তু এইটুকুর অভাবে বক্তাকে একটু যেন বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইল। আসল কথা, দিদি লোকটিকে ঈষৎ মাত্রায় ভয় রাখিতে হয়, উঁহাকে না জানাইয়া চলিয়া গেলে, ফিরিলে দুর্দ্দশাটা যে কিরূপ দাঁড়াইবে, সেটা ভালরূপই জানা আছে। কাজেই বিরক্তি ঈষৎ ক্রোধে পরিণত হইলেও সেই তাচ্ছল্যকারিণীর দ্বারের ত্রিসীমা ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করা খুব নিরাপদ বোধ হইল না। বিরক্তস্বরে পুনরায় সে বলিল, "ওগো শুন্‌তে পাচ্চো, দিদিকে বল্‌তে যেন ভুলো না, আমি বিশেষ দরকারে যাচ্ছি, ফিরে এসে তাঁকে সব বলবো, সন্ধ্যেবেলা তারে খবর পেলুম, তখন মজলিস্‌টা ভারি জমে এসেছে; তাই তাঁকে আর সে সময় এসে জানাতে পারি নি। বলো, ভুলে যেয়ো না। বল, বল্‌বে ত?"

এবার সে নারী কথা কহিল; অবেণীবদ্ধ রুক্ষ চুলের একটা গুচ্ছ ললাট হইতে অপসারিত করিয়া মুখ তুলিয়া সে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে?"

এ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে মৃগাঙ্ক কিছু বিস্মিত হইল। কারণ, তাহার সম্বন্ধে যে এ রমণী মনের মধ্যে কোনরূপ কৌতূহল পোষণ করিতেও পারে, এমন সন্দেহ ইতঃপূর্ব্বে তাহার আর কোন দিন মনে জাগে নাই। বিস্ময় দমন করিয়া সে সেই ক্ষীণালোকে চাহিয়া দেখিল, কুঞ্চিত কেশরাশি মধ্যে লুপ্তপ্রায়, মেঘে ঢাকা চাঁদের মত মুখ, অচপল অতি স্নিগ্ধ স্থিরদৃষ্টি। সে দৃষ্টি যেন সংসারের সকল তাপ দাহ জুড়াইয়া দিতে পারে। পাছে ইহার সম্মোহন শক্তিতে পড়িয়া যায় তাই বুঝি সে নিমেষে নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল; কি ভাবিয়া একটু যেন সঙ্কোচের সহিত মৃদুস্বরে বলিল, "একটা কাজে যাবো।"

"কোথায় ?"

"সে এক জায়গায়।"

"কোন্ জায়গায় ?"

স্বরে তীব্রতা নাই, কৌতূহলও নাই ; কিন্তু বেশ একটু দৃঢ়তা ছিল।

শ্রোতা ইহাতে বিরক্তি এবং বিপত্তি দুই-ই বোধ করিল। সক্রোধে সে উত্তর দিল, "তুমি কি পৃথিবীর সকল জায়গার সব খবরই জানো ? না, তোমার কাছে আমার সব কাজের হিসাব দাখিল করিতে আমিই বাধ্য ?"

রমণীর সূক্ষ্ম অধরে ঈষৎ একটুখানি হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কথা কহিল না।

"ওঃ, সেই কথা! দায়ে পড়ে তোমায় আমি বিয়ে করেছি বটে, তা সে হিসাবে তোমার ওসকল অধিকারই থাকতে পারত বই কি। সংসার শুদ্ধ সবারই থাকে শুনতে পাই। ঐ ভয়ে ত ফুলশয্যার রাত্রেই তোমায় সব কথা খুলে বলেছিলাম, আর তুমিও ত খুসী হয়েই তখন স্বীকার করেছিলে যে, কখনও আমার কাছে স্ত্রীর অধিকারের দাবী তুলবে না, তবে আবার এখনও সে কথাটি মনে করে রেখেছ কেন বলতো ?"

সহসা গৃহমধ্যস্থ দীপালোকে বাহিরের দমকা হাওয়া আসিয়া লাগিলে তাহা যেমন মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই গৃহখানিকে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, মৃগাঙ্কমোহনের শেষ কথাটা—তাহার 'দায়ে পড়িয়া বিবাহ করা'—স্ত্রীর মুখের উপর তেম্‌নি একটা মুহূর্ত্তের উজ্জ্বলতা আনিয়া দিয়া পরক্ষণেই ঘনীভূত অন্ধকার জমাইয়া তুলিল। সে অন্ধকারে লজ্জা অভিমান এবং ক্রোধ যুগপৎ মিশ্রিত ছিল। সে ক্রোধটা একমাত্র নিজেরই উপর। সে কিছু না বলিয়া নত হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের সলিতা উস্কাইয়া দিতে মনোনিবেশ করিল ; কিন্তু তাহার কম্পিত অধরের ঈষৎ স্ফুরণ ও নেত্র পল্লবের আকস্মিক নতি মৃগাঙ্কর

দৃষ্টি এড়াইল না। সে কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। যেন কি একটা দ্বিধার ভাব একবারের জন্ম তাহারও মনে জাগিতেছিল, কিন্তু অল্প পরেই জোর করিয়া সেটাকে তাড়াইয়া দিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "রাগ হ'ল না কি? কেন অস্বা, তোমাতে আমাতে ত রাগ অভিমানের সম্বন্ধ নয়। মনে আছে, সেই ফুলশয্যার রাত্রেই তোমায় আমি সব কথাই বলেছিলাম। কেমন, বলি নি? মা বাবা মারা গেলে দিদিই আমায় মানুষ করেন, সংসারে আমি একমাত্র তাঁকেই ভালবাসি, তিনি ছাড়া আমার আর নেইও কেউ। তাঁর একান্ত ইচ্ছা আমার বিবাহ দেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস, তা হলে আমি আর বওয়াটে হ'তে পারব না। আমার কিন্তু কোন দিনের জন্ম বিবাহের তৃষ্ণা ছিল না। একটা ক্ষুদ্র বালিকাকে সারা জীবনের একমাত্র অবলম্বন করে, তারই আঁচলে বাঁধা হয়ে থেকে সংসারের সকল সাধে জলাঞ্জলি দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়। নিতান্তই যখন তোমার বাপের পীড়াপীড়িতে বিবাহ করতেই হ'ল, তখন মনে করলাম যে, এই পর্য্যন্তই বাস্। দিদি বউ চান, তাঁকে বউ এনে দিলাম, তোমার কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব বাপ কম খরচায় দায় উদ্ধারও হলেন, আব কার কি বেশী চাই? আমি স্বাধীন থাকলে কার কি ক্ষতি? তুমি খাও, পর, ঘর সংসার দেখ, আমিও ত আর তোমার সঙ্গে কিছু মন্দ ব্যবহার করি নে—তুমিই বল না, করি কি? বন্ধুর মত দেখা সাক্ষাৎটাও হয়, অথচ কেউ কারও কাছে কিছু দাবী দাওয়া করি নে, দুজনেই বেশ আছি, কি বল? নেই? আচ্ছা, তা হলে দিদিকে সব তুমি বুঝিয়ে বলো—আর তুমি—নেহাৎ যদি তোমার শুনতে ইচ্ছা হয়েই থাকে, কোথায় যাব, তবে না হয় শোনই। বন্ধু তুমি আমার, তোমার মনে কি আমি কষ্ট দিতে পারি? যা ভেবেছ তা নয়। অন্তবারের মত বন্ধুদের সঙ্গে এবার কলকাতায় আমোদ আহ্লাদ করতে যাচ্ছি নে।

রাজনগরে মার মামার বাড়ী যাবো তিনি পত্র পাঠ যেতে বলেছেন। তাই ভাবছি, কি জানি, কেনই বা অমন করে ডেকেছেন বিলম্ব অবিধেয়।"

কথাগুলা শেষ করিয়া মৃগাঙ্কমোহন শীষ দিতে দিতে প্রফুল্লচিত্তে চলিয়া গেল। বেশীক্ষণ অপ্রফুল্ল থাকা তাহার স্বভাব নয়। সে চলিয়া গেলে তাহার স্ত্রী বা বন্ধু অজা প্রদীপের উপর হইতে অখণ্ড মনোযোগ ফিরাইয়া মাথা তুলিল। তাহার আকর্ণ ললাট লজ্জা ও ঘৃণায় তখনও আরক্ত হইয়া রহিয়াছিল। একটা ব্যথিত নিশ্বাস সদ্যপ্রাপ্ত অপমানের জ্বালায় ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়া সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। আত্মধিক্কারে পরিপূর্ণ হইয়া নিজের প্রতি তিরস্কার করিয়া ভাবিল, "ছিঃ, এমন আমি! আমার মনে এতটুকুও কি সম্মানবোধ নেই? কেন ওভাবের ছায়াও আমার মুখে ফুটতে দিয়েছিলাম? এবার খুব সাবধানে থাকতে হবে, আর কখনও এমন ধারা না হয়ে পড়ে। আমার মা বাপ কন্যাদায় হতে উদ্ধার হয়েছেন, আমার আইবুড়া নাম খণ্ডন হয়েছে—যথেষ্ট! আর কে কি চাইতে পারে?"

ক্লান্তভাবে সে বিছানার উপর আসিয়া বসিল। দীপ নির্ব্বাপিত প্রায়, অর্দ্ধ গৃহ ইতঃমধ্যেই অন্ধকারের রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বাকি অর্দ্ধাংশও গৃহসজ্জার দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়ায় ছায়ালোকে পূর্ণ। সেই জনহীনা অর্দ্ধ রাত্রে স্তিমিতালোক-গৃহে শয্যাতলে বসিয়া পূর্ণবয়স্কা সুন্দরী মনে মনে ভাবিল, "জগতে বৈধব্যকেই স্ত্রীলোকের পক্ষে সব চেয়ে দুঃখ বলা হয়; কিন্তু আমার চেয়ে কোন্ বিধবার কষ্ট বেশী? তাদের স্মৃতির সুখও হয় ত এক-আধ ফোঁটা কোথাও আছে। আমার কি আছে! না, না, ছি, এ কি আমি ভাবিতেছি? যত দুঃখই হোক আমার, তবু ত আমি সধবা। ওকে ত তবু কখনও কখনও দেখিতে পাই। তারা যে তাও পায় না। সেইটুকুই বোধ করি তাদের সব চেয়ে দুঃখ।"

মৃগাঙ্কমোহন মানুষটা চিরদিনই নিজের খেয়ালে কাজ করিতে অভ্যস্ত; তাহার ডাকসাইটে দিদিটাও তাঁহার শাসন-বজ্র নিক্ষেপে এ মৈনাকের পক্ষচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। পড়াশুনা সে এক রকম চলনসই করিয়াছিল, কিন্তু সুযোগসত্ত্বেও কাজকর্ম্ম কিছুই করিল না। সুবক্তা বলিয়া নাম অর্জ্জন করিতে না করিতে ছাত্রসভা হইতে নাম কাটাইয়া লইল। ইংরেজি সংবাদপত্রে একবার একটা প্রবন্ধ লিখিয়াই যশোলাভ ঘটে, কিন্তু এইখানেই তাহার লেখার সাধ মিটিয়া যায়। ইহার পর আর কোন ভাল কাজের মধ্যে তাহাকে কেহ কখন দেখিতে পায় নাই। কখনও বা নিজের বাড়ীতে, কখনও বা বন্ধু গৃহে নাচ গান আমোদ প্রমোদ সন্ধ্যা যাপন ও দীর্ঘ দিবানিদ্রায় কালক্ষেপ করিতেই দেখা গিয়াছে। দিদি প্রসন্নময়ী কঠোব নীতি অবলম্বনেই ভাইকে মানুষ করিয়া আসিয়াছেন। এখন সাবালক ভাইয়েব নাগাল না পাইয়া ব্যর্থ আক্রোশে মন্ত্রনিরুদ্ধবীর্য্য সর্পেব ন্যায় ফুঁসিতেছিলেন, এমন সময় দৈবক্রমে তাঁহার সেই আভ্যন্তরিক উত্তাপ বাহির কবিবাব এক সুযোগ্য পাত্র জুটিয়া গেল। তিনি যখন ভাইয়ের বিবাহেব জন্য ভাল সম্বন্ধ খুঁজিতে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং রূপ গুণ, কুল, শীল ও ধনের খুঁৎ ধরিয়া শতকন্যা তাঁহার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণা ও প্রত্যাখ্যাতা হইতেছিল, সেই সময় সহসা সে এক কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতাব কাতরতায় গলিয়া গিয়া একটা শুভ বা অশুভ লগ্নে অজাকে বিবাহ কবিয়া ঘরে আনিল। কিন্তু স্বভাববশে সেই সঙ্গে নিজে সে গৃহবাসী হইতে পারিল না। দিদি অতিশয় রাগ করিয়া বধূ ঘরে লইলেন। ফুলশয্যার রাত্রে নবোঢ়া পত্নীকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া এবং বিবাহিত জীবনের গণ্ডগোল হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবার ইচ্ছায় তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সে বলিল, "গহনা কাপড় যখন তোমাব যা ইচ্ছা হবে, চাহিও সাধ্যমত না বলিব না—কিন্তু

দোহাই তোমার, আমায় তুমি চাহিয়া বসিও না। কেমন, এ সর্ত্তে তুমি রাজি আছ ত ?”

নববধূ নিতান্ত বালিকা নয়, স্বামীর এই প্রথম সম্ভাষণে সে চমৎকৃতা হইল ; কিন্তু আহত নারী গর্ব্বে নিবিড় অভিমানের মধ্যে হইতে দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ইহাতে সে সম্পূর্ণ-ই সম্মতা আছে। মৃগাঙ্ক কহিল, “আঃ বাঁচা গেল ! বিবাহ মানেই স্বাধীনতা হারানো। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সেই যে বইয়ে পড়ে আসছি, ‘স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় !’ ও জিনিসটাকে আমি সেই থেকে বড়ই ভয় করি। এই দেখ না, এই জন্যই ত দিদির অত বকুনি খেয়েও চাকরী করি নে। তা এ-সর্ত্তে ভেবে দেখ্‌লে তোমারও উপকার ভিন্ন কোনই অপকার নেই। আচ্ছা, মনে করে দেখ দেখি, কত সুবিধাই তুমি পাচ্ছ। ধর, প্রথম ত তোমার চাকরী করতে হবে না, পরে তোমার ভরণপোষণ করবে। তারপর দেখ আইবুড় থাকলে লোকে নিন্দা করত, সিন্দুর পরতে পেতে না, আরও কত কি যে নিষেধ থাকত, সে সব আমি ঠিক ঠিক জানিও নে ; তবে শুনেছি নাকি কি কি সব নিষেধ আইবুড়দের আছে। এখন সে সবই পারবে, অথচ কারও হুকুম খাটা নেই, ঝগড়া ঝাঁটি নেই, একেবারেই নির্ঝঞ্ঝাট। আহা, তোমার খুবই সুখের জীবন। ভারি মজায় থাকবে। বেশ ভাল লাগবে বলে মনে হচ্ছে না ?”

নববধূ আবার সগর্ব্ব শিরঃসঞ্চালনে নিজের সম্মতি জ্ঞাপন করিল। এত বড় হৃদয়হীন সর্ত্ত স্থাপনে তাহার মন ভিতরে ভিতরে খুব বেশি রকমই আঘাতানুভব করিয়াছিল, কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ হইতে দিল না। সেই দিন হইতে এই দম্পতি-যুগল পতি-পত্নীর পরিবর্ত্তে বন্ধু। কিন্তু বিধাতা অসম প্রাণীমধ্যে বন্ধুত্ববন্ধন লেখেন নাই বলিয়াই বোধ করি,

ইহাদের এই অভিনব বন্ধুত্ব বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। পুরুষমানুষ মৃগাঙ্ক নিজের কেন্দ্রের মধ্যে ঘুরিতে থাকে, অজা গৃহকর্ম্মের প্লাবনে হাবুডুবু খায়, তা ভিন্ন তাহার ননন্দা তাহাকে বড় একটা চোখের আড় হইতেও দেন না। এক একজন মানুষ ছেলের বিবাহ দেয়, কিন্তু ছেলে পাছে বধূর বশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সদা শঙ্কিতচিত্তে তাহার হৃদয় রাজ্যের দ্বারে দ্বারে পাহারা দিয়া ফিরিতে ছাড়ে না। মৃগাঙ্কমোহনের দিদিও সেই প্রকৃতির লোক। তিনি যখন নববধূর অতুল রূপযৌবনের সজ্জিত অর্ঘ্য তাহার স্বামী-দেবতা পদাঙ্গুলি স্পর্শেও পবিত্র করিল না, তখন মুখে তিনি তাহাকে দুই-একটা ধমক চমক করিলে কি হইবে, মনে মনে বেশ একটুখানি খুসী হইয়াই পাঁচজনের কাছে বলিলেন, "এই দেখ, কি রকম ভাই হতে হয়! পাছে আমার উপর টান কমে যায়, তাই বউটার দিকে একবার চোখের কটাক্ষে চেয়েও দেখলে না। ছেলে ত আমার মৃগু!" আবার এটাও বড় সত্য যে এ সংসারে যাহার একজনের কাছে আদর আছে, জগতের সকল স্থানেই তাহার সেই আদর বৃদ্ধি পায়। এ জিনিষটা যেন মূলধনের মত; থাকিলেই সুদ ও তস্য সুদে বাড়িয়া চলে, না থাকিলে শূন্যের ঘরে কিছুতেই জমা বসে না। স্বামীপ্রেমবঞ্চিতা অজা ননন্দা এবং পরিজনবর্গের ঝাল ঝাড়িবার পাত্রী হইয়া রহিল; ঘরের লক্ষ্মী বধূটি ঠিক হইতে পারিল না। এই জন্য স্বামী হারাইয়া রতি বলিয়াছিল, "নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ।"

একদিকে স্বামীটি যেমন অদ্ভুত খেয়ালি, অপর পক্ষে স্ত্রীটিও তেমনি মর্য্যাদাজ্ঞানশীলা, ধৈর্য্য ও কোমলতার আধার। তাহার প্রতি স্নেহলেশহীন স্বামীর প্রতিও তাহার ভক্তি ভালবাসার খুব বেশী অভাব ছিল না। সে যে বৎসরাধিক কাল এ বাড়ীতে এই অনাদৃত অবমানিত জীবন বহন

করিতেছে সে শুধু তাহার সেই অসাধারণ আত্মমর্য্যাদা ও সহিষ্ণুতারই সহায়তায়। নহিলে হয় ত কোনদিন কান্নাকাটী করিয়া না খাইয়া বাপকে মরিবার ভয় দেখাইয়া এ বাড়ী হইতে জন্মের মত বাহির হইয়া যাইত। বাহিরে নিত্য নূতন নূপুর নিক্কন ও ডিকাণ্টার গ্লাসের ঠুন্‌ঠান্ শব্দ উঠিয়া তাহার স্থির হৃদ্‌পিণ্ডের গতি অস্বাভাবিক করিয়া তোলে, কত রাত্রিশেষে গৃহে অনুপস্থিত ভাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রসন্নময়ী নিজের সাধা গলা অষ্টমে তুলিয়া গালি বর্ষণ করিতে করিতে তাহার অনুসন্ধানার্থে লোক খুঁজিতে থাকেন, সে দন্ত দ্বারা তীব্র ক্ষোভে অধর চাপিয়া তাহা শোণিতাক্ত করিয়া তুলে। মনের মধ্যে গভীর আত্মগ্লানি তখন কঠোরস্বরে তিরস্কার করিয়া বলে, কেন তুই না বুঝিয়া অত বড় একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলি? স্ত্রী হইয়া স্বামীকে যত্ন ভালবাসায় বশ করিতে পারিবার ক্ষমতাটুকুও নিজের হাতে রাখিলি না? কিন্তু এখন আর উপায় কি? সে এই সমস্ত নীরবে সহিয়া যাইবে, তবু কখনও একটু প্রতিবাদমাত্র করিবে না, ইহা স্থির। তথাপি সে দিন নিজেরও অলক্ষ্যে কেমন করিয়া মনের ভাব কোথায় কোন ছিদ্রপথে বাহির হইয়া গিয়াছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফলও ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। সংসারে মানুষের অনেক রকম দুঃখ। কেহ রিক্ত সর্ব্বহারা হইয়া দুঃখের দহনে দগ্ধ হইতেছে; কেহ বা সর্ব্ব-সৌভাগ্য সম্মুখে করিয়া যক্ষের মত তাহা আগলাইয়া বসিয়া আছে—ভোগ করে, ললাটে এমন লিখন নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মন্দিরে এখন আর বিদ্রোহ বিপ্লব নাই; শান্তিদেবী এখন শান্তিময়ের ধামে আসন পাতিয়াছেন। পূর্ব্বের মত পুরাতন স্থান আবার নূতনের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মলোক হইতে নরলোক অবধি এইরূপে

পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। নৃত্যশীলা প্রকৃতির প্রতি নর্ত্তন তালে এ বিশ্ব তাহার কোটী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহাদির সঙ্গে নিয়ত সৃষ্ট ও অস্তমিত হইতেছে। অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের বক্ষে সেই গড়া উঠা নামার নাম নব যুগ ও যুগান্তর। সেই যুগের মধ্যেও আবার সেই উদয়াস্তের খেলা, কাল সমুদ্রের লীলা-লহরী বৎসর মাস পক্ষ ও দিবা রাত্রি রূপে বিভক্ত। ইহারা সকলেই সঞ্চরণশীল, সকলেই গত হয়—আবার তাহাদের স্থল আর একজন আসিয়া পূর্ণ করে। যাহা কালসাগরে মিশিতে চলিয়া যায়, তাহা আর ফিরিয়া আসে না। কেবল নিজের পরিচয়টুকু হাসি-কান্নার স্মৃতিতেই মানব চিত্তের মাঝখানে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া যায়; কিন্তু তাহার মধ্যে আবার একটা বিশেষত্ব আছে, যে স্মৃতি তীব্র দুঃখে অথবা গভীর সুখে বিজড়িত, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল; অপরাপর ক্ষুদ্র স্মৃতির কণাগুলি শীত প্রত্যুষের হিমকণিকার ন্যায়ই নবরবি কিরণ সম্পাতে মরণশীল।

অম্বরনাথের স্বল্প কয়মাসের অধিকারের মধ্যে এ রকম কোন একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই, যাহাতে নিয়মাচারী নবীন পূজারীর একচ্ছত্র রাজত্বের কালে সে কাহারও স্মৃতির মন্দিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। বাণী এখন নিশ্চিন্ত চিত্তে ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা গাঁথিতেছে, কুসুমস্তবক দিয়া দেবালয় সজ্জিত করিতেছে, নব পুরোহিত তাহার স্বহস্ত প্রস্তুত সেই সকল ফুলের রাশি দেবতার উপর চাপাইয়া আরও ফুলের বোঝার ফরমায়েস দিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিতেছেন। কন্যাকে প্রফুল্ল দেখিয়া পিতা মাতা সন্তুষ্ট, আবার পুরোহিত মহাশয় স্কন্ধ ত্যাগ করায় তুলসীমঞ্জরী সর্ব্বাপেক্ষাই আনন্দিতা। একটী অতি নিরীহ যুবকের বিদায়ে দেশে একসঙ্গে এতগুলি চিত্তের নষ্ট শান্তি পুনঃস্থাপিত হইয়াছে, এ কি কম সুখের কথা! তা ছাড়া সুধাকর ব্যতীত অপর সমস্ত ছাত্রের

দল ত খুবই সন্তুষ্ট! কেবল যে দিন যাহার রাঁধিবার পালা পড়ে, সেই দিনই একান্ত চটিয়া উঠিয়া অঘরের গুণ কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু আশুনাথের ভয়ে তাহা গোপনেই করিতে হয়।

কিন্তু বিধাতা মানুষের জন্ম শান্তি লিখেন নাই। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে, 'মানবজাতির আদি পিতামাতার পাপের জন্য সমস্ত মানবজাতি অভিশপ্ত হইয়াছিল।' আমরা অনন্ত পাপ পুণ্য মানি না, তাই এ সমস্ত শাস্তির কথায় আমাদের মনের মধ্যে সন্দেহ আইসে; তথাপি শান্তিহীনতা যে মানবের ভাগ্যফল ইহা আমরা যথেষ্ট দেখিয়া আসিতেছি, কাজেই ইহাকে অস্বীকার কবিবারও কোন উপায় নাই। রমাবল্লভের মনের অশান্তি অনল এতদিন শুধু তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীকেই ভিতবে ভিতবে পোড়াইতেছিল, এখন তাহা বাহিবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়া আরও একটি জীবনেব শান্তি হরণে লেলিহান হইয়া উঠিল। একদিন অকস্মাৎ বাণী শুনিল, আর এক মাসেব মধ্যে তাহার বিবাহ হইবে, ইহার আর কিছুই অন্যথা হইবে না। সম্মুখে বিনামেঘে বজ্রপাত হইলেও মানুষ যত না স্তম্ভিত হয়, এই সংবাদটা বাণীকে তদপেক্ষা অধিকতর স্তম্ভিত করিল। শুনিয়া প্রথমে সে বজ্রাহত হইয়া রহিল, তার মার কাছে গিয়া কাঁদিতে বসিল, বলিল, "আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, এ জন্মে বিবাহ করব না।" মা যখন তাহাকে বিরুদ্ধ যুক্তি দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সে রাগ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বারে খিল লাগাইয়া দিল। কিন্তু ইহাতেও আজ কোন ফল ফলিবে এমন লক্ষণ দেখা গেল না। যাহার এতটুকু ম্লান মুখ এ সংসার তরণীর কর্ণকে মুহূর্ত্তে বিপরীত মুখে ফিরাইয়া দেয়, আজ তাহার সকল আব্দার উপেক্ষিত হইয়া গেল। স্ত্রীর মুখে কন্যার এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া রমাবল্লভ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আসল কথাটা

খুলিয়া বলিলেন, অবশেষে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ত বড় হয়েছ মা, আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি, তুমিই বল এখন কি করি? এই পৈতৃক ঘর বাড়ী ধন মান সমুদয় ত্যাগ করব, না, তোমার প্রতিজ্ঞা রাখব? আমি কি করব বল মা? বাবা' আমার হাত পা বেঁধে রেখে গিয়েছেন। আমার কি কখনও সাধ যে, তোমার ইচ্ছার ব্যাঘাত করি?"

মহা সমস্যা! এ সমস্যা কে পূরণ করিবে? এদিকে এই বিপুল ঐশ্বর্য্য, সবার উপর এই মন্দির, হৃদয়শোণিততুল্য প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ওই দেবমূর্ত্তি। আর এক দিকে? সেও এমনিই এক ভয়ানক ব্যাপার! তাহার দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গিত মনঃপ্রাণ কোন্ এক ক্ষুদ্র মানব চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ সমর্পিত এ জীবন যৌবন নরভোগ্য করিয়া তবেই এ আশৈশবের আশ্রয় ক্রয় করা। তাহার সর্ব্বশরীর যেন একটা বিস্ময় পূর্ণ আতঙ্কে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। মনে মনে সে এটা ভালরূপে ধারণা করিবার জন্যই যেন নিজেকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, "এ কি ভয়ানক অবস্থা আমার! আমার নিজের পৈত্রিক গৃহে, আমার—এমন কি, আমার বাপেরও দাঁড়াইবার স্থান আমায় আজ আত্মবিক্রয় করিয়া কিনিতে হইবে? নহিলে এই বংশানুক্রমিক মান-সম্রম সমস্ত হইতে, বাবা আমার, আমার জন্যই বঞ্চিত হইবেন? দাদাবাবু! তোমার সেই গভীর স্নেহ কি এমনি করিয়াই প্রতিদান লইল? এখান হইতে চলিয়া গেলে এখানের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ফুরায় জানি; কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বেই কি তোমার মনের সমস্ত ভালবাসা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল?" অবাক্ হইয়া সে ভাবিতে লাগিল, সহসা তাহার জীবনে এ কি সীমাহীন অকূল পাথার দেখা দিয়াছে? নিশ্চিন্ত নির্ভরতাপূর্ণ যে সুখের জীবন এতদিন সে উপভোগ করিতেছিল, সহসা আজ কাহার মন্ত্রবলে তাহার জীবন হইতে সে সুখের সূর্য্য অস্তমিত হইয়া গেল?

অনেকক্ষণ আকাশ পাতাল ভাবিয়া কাঁদিয়া সে শেষে এই স্থির করিল যে এত ভয়ই বা কিসের? এই ঐশ্বর্য্য সে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত পরিত্যাগ করিবে সেও ভাল, তবু এ দেহ কাহাকেও দান করিতে পারিবে না। এ কার্য্য তাহার দ্বারা সংঘটন হওয়া অসম্ভব। কোথাকার কে একটা মানুষ শ্রীবিষ্ণু! সে তাহার মালিক-মোক্তার হইয়া বসিবে? তাহার মা বাবা, আর সেই কয়জন যিনি আজ স্বর্গে গিয়াছেন, এই একজন ভিন্ন তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইবার যোগ্য লোক এ পৃথিবীতে অপর কেহ আছে না কি? কখনই সে ইহাদের বাহিরের কোন লোকের কাছে নিজেকে নত করিবে না।

এ বিসর্জ্জনের মন্ত্র কিন্তু সে বেশীক্ষণ জপ করিতে পারিল না, মন্দিরের দৃশ্যটা মনে আসিতেই মনটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও তাহার মনে হইল—সে এতক্ষণ কেবল নিজের কথাই ভাবিয়াছে, পিতার কষ্ট ও অপমান সে ত এ পর্য্যন্ত কল্পনাও করে নাই! তাহার পিতৃ পিতামহের জন্ম-মৃত্যু-লীলাপূর্ণ পবিত্র গৃহে আর মাসাবধিকাল পরেই কোথাকার কে একটা লোক—নামটা শুনা হয় নাই—সে-ই আসিয়া নাকি বাস করিবে! আর তাঁহারা? কোন্ অচেনা নগর প্রান্তে ভাড়া করা একখানা সামান্য গৃহে সামান্য গৃহস্থ ভাবে সারা জীবন দারুণ দুঃখে কষ্টে অনুতাপে কাটাইয়া কোন্ এক অপরিচিত শ্মশান-শয্যায় ঘুমাইয়া দুর্ব্বিসহ জীবনের ভার নামাইয়া দিবেন। হায় চিত্রলেখা! তোমার ওই বাঁধা ঘাটের পাশে এই শুভ্র বালুকার বিছানা যে এ বংশের সন্তানের চির প্রলোভনের বস্তু। সে নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিয়া মনে মনে বলিল, "বাবার এতদূর কষ্ট ত বাঁচিয়া থাকিয়া এই দুটো চোখে দেখিতে পারিব না। এখন আমি করি কি?"

মৃগাঙ্কমোহন আসিয়াছে। সে বহুদিন পূর্ব্বে কর্ত্তার জীবৎকালে

আরও দুই-একবার এখানে আসিয়াছিল; সেজন্য সকলকেই সে অল্পবিস্তর চিনিত, সকলের নিকট সেও পরিচিত ছিল।

এবার আসিয়া বাণীকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। কৃষ্ণপ্রিয়াকে ডাকিয়া বলিল, "কিগো মাসি, রাধুর বিয়ে দিচ্ছ কবে? ওটা যে মস্ত হয়ে উঠেছে। এত বড় মেয়ে ঘরে থাকলে শুনেছি তোমাদের গলা দিয়ে জল নামতে নাকি বাধা পায়। তা তোমার তেমন কিছু হয় নি ত?"

কৃষ্ণপ্রিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সেই ভাবনায় ত অস্থির হয়ে উঠেছি বাবা; তারই একটা সৎপরামর্শ করতেই ত তোমাদের ডাকা।"

"বটে, বটে, সেই জন্য বুঝি আমায় ডেকেচ? আচ্ছা, আমি পরামর্শ দিচ্ছি বিয়েটা শীঘ্র শীঘ্র দিয়ে ফেল।"

কৃষ্ণপ্রিয়া তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, "ও রকম পরামর্শ সবাই দিতে পারে, এর জন্য তোমায় ডাকা হয় নি।"

মৃগাঙ্ক যেন সচকিত হইয়া উঠিল, বলিল, "তাও ত বটে, এর জন্য ডাকার ত কোন দরকারই ছিল না। তা সত্য! তবে কি রকম পরামর্শটা চাও তাই বল দেখি?"

বাণী তাহার বিবাহের ভাবনা এ আগন্তুককে শুদ্ধ বিশেষ করিয়া ভাবিতে দেখিয়া অত্যধিক বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণপ্রিয়া মৃগাঙ্কমোহনকে বসিতে বলিয়া তাঁহাদের আসন্নপ্রায় বিপদের সমস্ত বার্তা একে একে তাহার নিকট খুলিয়া বলিলেন, এই কয়দিনের মধ্যে বিবাহ দিতে না পারিলে তাঁহার শ্বশুরের বিপুল সম্পত্তি যে মাসার্দ্ধমাত্র পরে তাহাকেই অর্শিবে। সে খবরটাকেও তিনি উহ্য রাখা কিছুমাত্র প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন না। কিন্তু এত বড় একটা বিস্ময়পুলকসঞ্চারী সংবাদ শোনার পরও শ্রোতা বিন্দুমাত্র

বিচলিত হইল না। সে দিব্য সহজ ভাবেই উত্তর দিল, "উইলের কথা কে জানে জিজ্ঞাসা করি ?"

"শুনেছি, বেশী লোক জানে না—উকিলবাবুই বোধ করি শুধু জানেন।"

"তবে আর কি, তাঁকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে দাও, কে আর জানবে ?"

কৃষ্ণপ্রিয়া এই অনায়াস মন্তব্যে শিহরিয়া উঠিলেন ; আবার তাহার এই নিস্পৃহ ঔদাস্তে অধিকতর বিস্ময়বোধও করিলেন, কহিলেন, "তা কি হয় বাবা ? এ ধর্ম্মের সংসার, এত বড় অধর্ম্ম করলে সইবে কেন ?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "অধর্ম্ম কিসের ? কর্ত্তামশায়ের বৃদ্ধ বয়সে বাহাত্তুরে ধরেছিল, তা না হ'লে এমন উইল কেউ কখনও করে, তুমি আর কখন শুনেছ ?"

কৃষ্ণপ্রিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিলেন, "না বাবা, তিনি যা ভাল বুঝেছিলেন করেছেন, আমরা তাঁর বিচার করবার অধিকারী নই, আদেশ পালন করতেই বাধ্য। তা এখনও ত এর একটা উপায় আছে, আর সে উপায় একমাত্র তোমার হাতে।"

"বলো কি মামি! আমার হাতে ? আমি আবার এর কোন্ খানটায় হাত দিতে পারি মামি ? একবার এক—থাক্, মোদ্দা পনেরো দিনের মধ্যে বিবাহের শেষ লগ্ন, সেই লগ্নে এক নিকষ কুলীন সন্তান জামাই তোমার চাই-ই—না হলে পরদিন মামামশায়কে দেশত্যাগী হতে হবে। এ মন্দ ব্যবস্থা নয়! তা নিকষ কুলীন শুধু হলেই ত হবে না, মেল টেল সে সব আবার ঠিক্ ঠাক্ মেলা চাই ত, সেও ত সব বিস্তর লেঠা আছে। আজকালকার বাজারে পাশ বিক্রী হচ্ছে, কুল বিক্রী ত এখন আর হচ্ছে না। হুকুম দিলে পৌনে সাত গণ্ডা বি-এ, এম-এ এনে দোর

গোড়ায় হাজির করে দিতে পারি, কিন্তু এ জিনিষটা আজকাল যে বড়ই দুষ্প্রাপ্য !"

কৃষ্ণপ্রিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "কেন বাবা, তুমি ত আছ।"

"আমি !" মৃগাঙ্ক এবার যথার্থই চমকিয়া উঠিল, সবিস্ময়ে কহিল, "বল কি মামি, আমি আছি ? হ্যাঁ, তা আছি বইকি আমি, কিন্তু আমি যে নেহাৎ লক্ষ্মীছাড়া মামি ! আমায় নিয়ে কি করবে তোমরা ? নেহাৎ যাদের মেয়ের দর নেই, জলে দেওয়ার সামিলই মনে করে, তারাই এই আমাদের তল্লাস করবে। তোমরা কিসের দুঃখে এমন কথাটা মুখে আনলে বলো দেখি ? আঁ্যা।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বড় দুঃখের হাসি হাসিলেন, কহিলেন, "শোন মৃগাঙ্ক, জগতে কোন জিনিসের দাম নেই বলে পড়ে থাকে, কারও বা বড্ড বেশী দর বলে বিকোয় না, আমরা এখন সেই সব 'দর নেই' মেয়ের মা-বাপেরও বেহদ্দ হয়েছি। তোমার অমত কিসের ? আমরা যখন নিজেরাই দিতে চাচ্ছি, তখন কি আর না জেনে বুঝেই বলছি ?"

মৃগাঙ্ক হাসিয়া উঠিল, "আমার অমত কিসের ? হরি হরি ! মতই বা কিসের ? তোমার ভাগ্‌নে আছি, জামাই হব ? বল কি তুমি ? এ কি সাহেব বাড়ী ? ভাই বোনে বিয়ে ? আরে রামোঃ—"

"তাতে বাধে না, কুলীনের ঘরে এ রকম ত সর্ব্বদাই হয়ে থাকে, আমি ত কত দেখেছি ! সে এর চেয়েও নিকট, এমন কি পিসে মেসোর সঙ্গেই কুলীনের মেয়ের বিয়ে হয়।"

কৃষ্ণপ্রিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, ব্যস্তভাবে পুনশ্চ কহিলেন, "তুমি এতে অমত করলে আমরা পথের ভিখারী হব সে কথা তোমায় পূর্ব্বেই ত বলেছি বাবা। এখন তোমার যা বিবেচনায় ভাল বোধ

হয়, তাই কর। জান ত, আমার শ্বশুর অনেক পূর্ব্বেই এ বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।"

"তা জানি, তখন আমি বওয়াটে হয়ে যাব এমন কতকগুলি পূর্ব্ব-লক্ষণ আমার মধ্যে দেখা গিয়েছিল বলে তোমরা বিয়ে দাও নি—তা যাক্—সে কিন্তু বড় যে বিশ্রী হবে মামি। আমার কিন্তু বড্ড হাসি পাবে। তুমি যখন আমায় বরণ করতে দাঁড়িয়ে 'কড়ি দিয়ে কিনলুম' বলে 'ভ্যা' করতে বলবে, আমি কিন্তু সে সময় নিশ্চয় হেসে ফেলব। আর বাণীটাকে ছোটবেলা কত কোলে পিঠে করেছি, এখন সেইটে ঘোমটা দিয়ে আমার সঙ্গে শুভদৃষ্টি করবে! বলো কি তুমি? ভারী কিন্তু হাসির কথা এ। থিয়েটারে এ রকম হলে কিন্তু সেটা সত্যির চাইতে ঢের বেশী মানাত, তা আমি স্বীকার করছি।"

কৃষ্ণপ্রিয়া তাহার কথার ধরণে এত উদ্বেগের মধ্যেও হাসি চাপিতে পারিলেন না, মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তা না হয় হেসো বাবা, তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। তা আমি ওঁকে বলে আসি যে, তুমি বিয়ে করতে রাজি আছ। ভাবনায় উনি যে কি হয়েছেন, সে কথা আর কাকেও বলবার নয়।" কৃষ্ণপ্রিয়া উঠিয়া গেলেন; মৃগাঙ্ক তাঁহাকে কিছু বলিল না। সে তখন কি যেন একটা ভাবিতেছিল, কিছুক্ষণ পরে আপনা আপনি আর খানিকটা হাসিয়া লইল।

সেই দিন তুলসীমঞ্জরী বাড়ীর দাসীদের নিকট কি একটা অস্পষ্ট গুজবের আভাস পাইয়া সন্দেহকে নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে জমিদার-বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিক খুঁজিয়া কিন্তু কোথাও সে বাণীকে দেখিতে পাইল না। বাণীর আজ কাল কিছুই ভাল লাগে না; সে ঠাকুর পূজার সময় ভিন্ন বড় একটা ঘরের বাহিরই হয় না। বই খাতা রেশম পশম সূচিকার্য্য সমস্ত জড় করিয়া একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া বিছানায়

শুইয়া অথবা জানালার নিকটে বসিয়া কোন মতে দিনগুলা কাটাইয়া দেয়। মন ভাল নাই এ কথা অবশ্য বাহিরে অপ্রকাশ্য। কাহার ঘাড়েই বা দুইটা মাথা আছে যে, এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করিবে? কাজেই সকলে বলিতেছে, তাহার শরীর ভাল নাই। সে নিজে কিছুই বলে না। কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সবেগে উত্তর দেয়, "কোথায় আবার কি হয়েছে?" যেন প্রশ্নকর্ত্তার দৃষ্টিরই সবটুকু দোষ! মনের মধ্যে গর্জ্জিয়া বলে, সে কেন তাহার উপর নজর রাখিতে আসিল? আর কি কোন কাজ নাই?

আজ মঞ্জরী আসিয়া তাহাকে বিছানার মধ্যেই গ্রেপ্তার করিল, হাসিয়া রঙ্গ করিয়া বলিল, "ওগো রাধারাণী! আজ এ কি শুনি? ও কি, অমন করে মুখ ফেরান হ'ল যে? সই, তবে একটা গান গাই, শোন—
"কেন গো ফিরালে আঁখি, কেন এত অভিমান? ওগো কার—"

বাণী তখন উঠিয়া বসিয়া দ্রুত হস্তে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, সক্রোধ তর্জ্জনের সহিত বলিল, "থাম্ থাম্, আমার গান-ফান ভাল লাগছে না। তোর সব সময় যেমন রঙ্গ! আমি মরছি, উনি এসে গান গাইতে বস্‌লেন।"

"তুই বলিস্ কি সই। এমন খবরেও একটু রঙ্গ করব না, তবে আর কবে করব ভাই? আচ্ছা, কবে বিয়ের দিনস্থির হয়েছে বল্ ত? এখনও স্থির হয় নি—বোধ হয়, না?"

বাণী কহিল, "হয় নি, কে তোকে বললে? হয়েছে বৈ কি। ২৭শে ফাল্গুন ডাকের শেষ দিন যে।"

"অর্থাৎ?"

"শেষ দিনের আবার অর্থ কি নতুন কিছু সৃষ্টি হয়েছে?"

মঞ্জরী তবুও কিছু বুঝিল না, কিছুক্ষণ সে হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ও তাহাকে হাসিতে দেখিয়া বুঝিল যে, সে তামাসা

করিতেছে। তাই সে চটিয়া বলিল, "তোর হেঁয়ালির ছন্দ মুখ্যু মানুষ আমি ভাই কিছুই বুঝতে পারি নে। যাই, সইমার কাছে জিজ্ঞাসা করি গে।"

"যা, তা হ'লে আমিও বাঁচি।" বলিয়া বাণী বিছানায় শুইয়া পড়িতেছিল, এমন সময় "রাধারাণী" বলিয়া ডাক দিয়া মৃগাঙ্ক সেই ঘরের দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জরী তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বাণী শয়নবিরত থাকিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর দিল, "কি?" এমন অসময়ে তাহার নিজের এলাকার মধ্যে নিতান্ত অমায়িকভাবে এই অর্দ্ধ-পরিচিতের প্রবেশ তাহার মনটাকে চটাইয়া তুলিয়াছিল।

"বাড়ীতে কি আজ লোকজন খাবে! বড় ঘটা লেগেছে বলে মনে হচ্ছে যে?"

বাণী এতক্ষণে সহজভাবে উঠিয়া বসিয়া আপনার মনের মধ্যকার নিদারুণ চাঞ্চল্য গর্ব্বস্ফীত দৃঢ় চিত্তে চাপিয়া ফেলিবার জন্য যত্ন করিতেছিল। সর্ব্ব শরীরের শোণিতবাহী শিরাগুলার মধ্যে উষ্ণ প্রস্রবণের ন্যায় রক্তস্রোত ফুটিয়া বেড়াইলেও বাহিরে সে তাহার তাম্বুলরাগহীন শুষ্ক অধরে মৃদু হাসি ফুটাইয়া তুলিতেও অক্ষম হয় নাই। প্রায় তখনই সে হাসিয়া ফেলিয়া উত্তর দিল, "আজ নয়। আর দশ দিন পরে।"

"দ-শ-দিন! বড় বেশী দেরী হবে, না? এদিকে মালপো, মালসা-ভোগের লোভটাও ত ছাড়তে পারি নে, কাজেই ঐ কটা দিন আমায় থেকে যেতেই হচ্ছে। তবে একটু বসাই যাক্।"

মৃগাঙ্ক আসিয়া সে গৃহে প্রবেশ করিল।

বাহিরে যথাসাধ্য শান্ত ভাব ধারণ করিলেও বাণীর মনের ভিতরকার ঝড় একটুও থামে নাই। সে মৃগাঙ্কর আত্মীয়ভাবে বিশেষ একটু অপ্রসন্ন হইল। কিন্তু আজকাল তাহার মনের এমন অবস্থা নহে যে, কোন কারণেই কাহারও সহিত অহেতুক কতকগুলা বাক্য ব্যয় করে। বিরক্তি গোপনের

চেষ্টায় নিজের আঁচলের ছিলাগুলা সজোরে টানিয়া টানিয়া সে ছিন্ন করিতে লাগিল। মৃগাঙ্ক একটা আসন টানিয়া বসিয়া পড়িয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া প্রশংসা সূচক স্বরে কহিয়া উঠিল, "বাঃ, ঘরখানি বেঁড়ে সুন্দর সাজিয়েছিস্ ত! জানালার ধারে বাহিরের দিক থেকে লতাগুলি ফুটন্ত ফুল বুকে করে ভিতরে আসবার চেষ্টা করায় আরও চমৎকার হয়েছে। তুই যখন শ্বশুর বাড়ী যাবি, তখন এদের দশা কি হবে?"

রাজনগরের জমিদার-কন্যা শ্বশুর বাড়ী যাইবে? সে আর সহিতে পারিল না; সবেগে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি কোথাও যাব না।" তখন তাহার ললাট হইতে কণ্ঠ অবধি আবিরমাখার মত রঞ্জিত হইয়া উঠিল। মৃগাঙ্ক সকৌতুকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, তাহার সগর্ব্ব উত্তর শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বিয়ে হলে তারা তোকে না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে কেন রে?"

"তবে বিয়ে হবে না।" এ উত্তরের জন্য কিছুমাত্র সময় লাগিল না।

"মামা মামী শুনবেন?"

"নাঃ, শুনবেন না বৈ কি!" এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে বাণীর অধরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসির অর্থ, তুমি আমাকে চেন না, আর তোমার মামা মামীকেও চেন না তাই এসব সন্দেহ প্রকাশ করিতেছ। ইহার পর দুইজনে একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা দুইজনেই একসঙ্গে হাসিয়া ফেলিল। বাণী হৃদয়োত্থিত ক্রোধ দমনের চেষ্টায় মৃগাঙ্কর কৌতুক হাস্যে যোগ দিয়াছিল মাত্র, তাহার মনে হাসির লেশও ছিল না। অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের মত তাহা কয়দিন ধরিয়া কেবল ধূমায়িত হইতেই ছিল।

সহসা মৃগাঙ্ক বলিয়া উঠিল, "তা হলে তোর বিয়ে হবে না, রাধে! লোকে বিয়ে করে গৃহিণীর জন্য, বিয়ে করে স্ত্রীকে ঘরে আনবে না এমন

মূর্খ জগতে কেউ নেই। আমার মত লোকেও যা করতে প্রস্তুত নয়, আর কে তা স্বীকার করবে বল দেখি!"

ঘোর অবিশ্বাসে বাণী হাসিয়া বলিল, "তেমন মূর্খ সংসারে অনেক আছে। নিজেকে সকলের সেরা ভেবে বড়াই করো না। তোমার বিয়ে হয়েছে মৃগুদা?"

"বিয়ে! কেন বল্ দেখি? আমার মতে পুরুষমানুষের বিয়ে হওয়া ভাল নয়।"

"আর মেয়েমানুষের হবে?"

"নিশ্চয়! শাস্ত্র বলেছে, স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার, তার পরে স্বামীর, তস্য পরে পুত্রের অধীন থাকবেন, তাঁর স্বতন্ত্র্য থাকার বিধি শাস্ত্রে লেখা নেই।"

"খুব এক চোখো শাস্ত্র ত! মেয়ে পুরুষে এত তফাৎ! কিন্তু তাই বলে শাস্ত্রের এমন আদেশ নয় যে, পুরুষ অবিবাহিত থাকবে, আর মেয়েরা শুধু বিবাহিতা হবে? সে যে সোণার পাথর বাটি।"

"ঠিক তাই! কিন্তু কেন তা হবে না? মনে কর, আমি যদি কাকেও বিবাহ করি, তারপর তার সঙ্গে স্ত্রীর সম্বন্ধ ছেড়ে বন্ধুত্ব পাতাই, তবে সে আমার স্ত্রী হ'ল না, বন্ধু হ'ল ত? অথচ তার বিবাহ হয়েছে কে না বলবে?"

সমুদ্রে নিমজ্জনোন্মুখ বিপন্নের সম্মুখে কে যেন একখানা ভারসহ কাষ্ঠখণ্ড ফেলিয়া দিল। চমকিতা হইয়া বাণী দুই নেত্র বিস্ফারিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তা কি হয় মৃগুদা? তেমন কেউ আছে?"

মৃগাঙ্ক হাসিয়া বলিল, "কেন, এই আমিই আছি।"

"তুমি! তোমার বিয়ে হয়েছে না কি?"

"হয়েছে বৈ কি। কন্যাদায় ঘাড়ে যে অনেকেরই, এ জিনিষটা নামাতে স্থান অস্থান বিবেচনা করা ত চলে না। যেখানে হোক্ ফেল্‌তে পারলেই লোকে বাঁচে। তাই আমার মত আস্তাকুঁড়েও এ রত্ন ছড়াতে বাধে নি।"

শেষ কথাগুলা বাণী মন দিয়া শুনে নাই। সে তখন ভাবিতেছিল, যদি বিবাহ নিতান্তই করিতে হয়, তবে এই রকম সর্ত্তেই। নতুবা এ জীবন লইয়া সে অন্যের দাসী হইতে পারিবে না। মৃগাঙ্ক তাহার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে নাই। সে আপন ঝোঁকেই বলিতে লাগিল, "মেয়েদের বিয়ে না দিলে কেমন করে চলবে, বল না? একজন মহাপুরুষ বলেছেন, 'মেয়েমানুষের আত্মা নাই!' কাজেই পুরুষমানুষের গলায় তাদের গেঁথে দিতেই হবে, কারণ তারা তাঁদের সেবা যত্নে খুসী করলে সেই ফলে আত্মাবান্ পুরুষের কৃপায় স্বর্গ অবধি লাভ করতেও পারে। নতুবা এ সংসারের বাইরে ত তাঁদের একটি কাণাকড়িও মূল্য থাকে না।"

বাণীর নেত্রে ক্রোধের ঘন ছায়া পতিত হইল। সে রুষ্টভাবে বলিল, "এই জন্যই বিবাহে বিতৃষ্ণা হয়। সাধ করে কি বলি, বিবাহের নামই দাসীত্ব।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তা দাসীত্ব হউক আর যাহাই হউক, এবার কিন্তু বাণী মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিল যে, সে বন্ধন অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই। কৃষ্ণপ্রিয়া যখন মৃগাঙ্কমোহনের সহিত তাহাকে সহজভাবে মেলামেশা করিতে দেখিয়া বিস্মিতা হইতেছেন এবং সে এখনও এই খবরটা পায় নাই

বুঝিয়া কি ছলে সংবাদটা জানাইবেন, তাহাই মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছেন, এমন সময় সে আপনি আসিয়া বলিল, "আমায় যদি নেহাৎ —আমি কিন্তু এ বাড়ীর বাইরে একটি দিনের জন্য এক পাও নড়ব না। তা তোমায় এখন থেকে বলে রাখছি।"

কন্যার মতি ফিরিতেছে দেখিয়া খুসী হইয়া কৃষ্ণপ্রিয়া উত্তর দিলেন, "নড়তে কে তোকে বলেছে ?"

"এ না হলে বিয়ে হতেই পারবে না।"

কৃষ্ণপ্রিয়া ঈষৎ রাগ করিয়া বলিলেন, "কি যে সব বলিস্ তুই, সব কথার মানেই বোঝা যায় না। মৃগাঙ্ক আমাদের এখানেই থাকবে। ওর দিদির বাড়ী কি আর ওর পড়ে থাকা ভাল দেখায় ? তুই আবার কোথায় যাবি ?"

মা যেমন মেয়ের কথা অসংলগ্ন বলিয়া অনুযোগ করিলেন, মেয়েও মাতাকে সেই কারণ দর্শাইয়া বলিল, "কি যে তুমি বল ! ও এখানে থেকে কার কি উপকার করবে শুনি ?"

কৃষ্ণপ্রিয়া এবার যথার্থই রাগিয়া গেলেন, কহিলেন, "মৃগু যখন আমার জামাই হবে, তখন ও এখানে না থেকে কোথায় থাকতে যাবে ? তোর সকলই অনাসৃষ্টি আব্দার যে বাণি !"

শুনিয়া বাণী প্রথমে বুঝিতে পারিল না যে, সে সত্যই এই কথাগুলা শুনিল কি না, তাই কিছুক্ষণ মায়ের মুখের দিকে বিহ্বল নেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া যখন সে মাতৃ-বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হইল, তখন সবিস্ময়ে কহিয়া ফেলিল, "এ আবার কি বলচ ? আমি কিছু বুঝতেই পারচি নে—ওঃ বুঝেছি ! সে কিন্তু হতেই পারে না।"

"সে কি ?"

"না, সে হবে না—আমি তা হ'লে মোটেই বিয়ে করব না, তা বলছি কিন্তু। মেয়েমাহুষের উপর ওর যা শ্রদ্ধা! না—কক্ষনো না।"

কৃষ্ণপ্রিয়া সক্রোধে বলিলেন, "যা তুমি জান তাই কর, আমি কিছু জানি নে বাছা!"

রাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া মেয়ের নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "এ বাড়ীর সব সমান! যেমন জেদী বংশের মেয়ে, তেমনি ত হবে। আমাদের বাপু অত শত ত ছিল না। যে যা বলে এখনও ভাল মনে করে মেনে নি। নিজের উপর অত বিশ্বাস, মেয়েমাহুষের পক্ষে বড় খারাপ। মেয়ে আর তাঁর বাপ যা বোঝেন—করুন। আমি বোকা মানুষ, আমার এক পাশে সরে থাকাই ভাল।"

এইরূপ মনে করিয়া নিজের ঘরের দিকে তিনি চলিয়া গেলেন। একবার ভাবিলেন, স্বামীকে ডাকিয়া সব কথা বলেন, আবার পরক্ষণে অভিমানের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এই ভাবটা ভাসিয়া আসিল, দূর হউক—আমার কি!

বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়াছে শুনিয়া তুলসীমঞ্জরী আসিয়া প্রসন্ন মুখে বলিতে লাগিল, "বেশ হয়েচে! আচ্ছা ভাই, এখন কেমন মনে হচ্চে বল দেখি? বলি নি কি যে, এক মাঘে শীত পালায় না?"

বাণী মনের অবস্থা গোপন করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "খুব ভাল। তোর যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনি।"

"আমার!" বলিয়া মঞ্জরী একটু সলজ্জভাবে হাসিয়া কহিল, "তা ঠিক নয়। আমার, সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ের কথায় একটুও ভাল লাগে নি।"

"কেন?"

"কেন? বুঝে দেখ!"

"কি? বুড়ো বর?"

"ভাই।" মঞ্জরীর উভয় গণ্ডে শোণিত-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। বাণী তাহাকে ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া সহাস্যমুখে অথচ কোপ দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "দূর হ হতভাগি! আমি যদি অমন একটি বুড়ো পেতাম ত বর্ত্তে যেতাম।"

মঞ্জরী হাসিয়া উঠিল, "এখনও নে না কেন ভাই?"

"সে যে হয় না ভাই।"

"কেন?"

"আমার যে সতীন থাকবার হুকুম নেই।"

"মানা করলে কে?"

বাণী কথাটা ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "বিধাতা। আচ্ছা, এখন তোর কি মনে হয় যে, বুড়োর সঙ্গে বিয়ে না হলে ভাল হ'ত?"

"দূর, তা কেন? এখন মনে হয়, ওঁকে না হলে আমার চলতেই পারত না। সত্যি ভাই—এমন নিরীহ মানুষ কোথায় পেতাম যে, আমার মত স্ত্রীকে এমন করে সহ্য করত?"

বাণী সে কথার কোনই উত্তর দিল না; কি একটা ভাবিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহাকে বিমনা দেখিয়া তুলসী কথা ফিরাইয়া বলিল, "যাক ভাই, এখন পচা পুরাণ কথা রেখে তাজা তাজা খবর দাও দেখি আগে—সয়াটি কেমন?"

"সয়া! তা খুব ভাল!"

মঞ্জরী এ সংবাদে আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সে সাগ্রহে বলিল, "ভাল ত হবেই। ভাল না হ'লে আর তোর মা বাবা মত করেছেন। এতদিন পরে তা হ'লে তোর বিয়ের ফুল ফুটল! বড়লোকের ছেলে ত? কোথায় বাড়ী?"

"বড়লোকের ছেলে কি না জানি নে, নিজে খুবই বড়লোক; আর বাড়ী? এমন স্থান নেই, যেখানে তাঁর বাড়ী নয়!"

"ওঃ! তা হ'লে মস্ত লোক! খুব ভাগ্যবান পুরুষ, বল্? তা তাঁর ভাগ্যের যেটুকু বাকি ছিল, এবার তোমায় পেয়ে যথার্থই তিনি পুরাপুরি লক্ষ্মীমন্ত হবেন—নামটি কি তাঁর, এখন ত আর বল্‌তে দোষ নেই, চুপি চুপি বল্ না ভাই শুনি?"

"যম।"

"যাঃ! যা মুখে আসে তাই বলিস্।"

তুলসী রাগ করিয়া উঠিয়া গেল, এবং একটু পরে মান খোয়াইয়া নিজেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তোর সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা হয় না। আচ্ছা, শুধু একটা বল্—আট-দশ দিন পরেই বিয়ে, তা, ঘটা-টটা ত কিছুই তেমন দেখছি নে? আমি সইমার কাছে যাই, সব জান্‌তে পারব। তোর কাছে ত আর কোন কথাই পাবার যো নেই, নিজের পেটে সব রেখেই দিবি।"

বাণী হাসিয়া বলিল, "কি আবার জানতে বাকী আছে? ঘটার ভাবনা কি? হরিসংকীর্ত্তন—ঠাকুর নাটমন্দিরে হাজির আছেই, উঠোনে তুলসীমঞ্চ, ঘরে তুলসীমঞ্জরী—" মঞ্জরী এবার যথার্থই রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে বাণী ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বুঝিল, বাড়ীতে বিবাহের 'ঘটা' আরম্ভ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ধামা ধামা বড়ির ডাল দাসীরা নদীর ঘাটে ধুইতে চলিয়াছে, বৃহৎ বৃহৎ পাত্রে কাটিবার জন্য সুপারি ভিজানো হইল। আরও কত কি! বাণীর শুভ্র মুখ আরক্ত হইয়াই এবার একেবারে পাংশু হইয়া গেল, দন্ত দিয়া ক্রুদ্ধ রোষে অধর দংশন করিয়া কোনমতে সে নিজেকে শুধু সকলকার সম্মুখে খাড়া

রাখিল। দ্রুত পদে ফিরিয়া আসিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর একেবারে সে লুটাইয়া পড়িল। ক্ষোভে রোষে তাঁহার সূক্ষ্ম ধমনীর রুদ্ধ শোণিত ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সমুদ্র তরঙ্গের মত তাহার সর্ব্ব শরীরকে আলোড়িত করিতে লাগিল। দেবতা বা মানব, কেহ তাহাকে রক্ষা করিল না। যথার্থ ই তাহাকে বিবাহ করিতে হইল!

মৃগাঙ্কমোহনও বাড়ীতে যে বিবাহের উদ্যোগ চলিতেছিল, তাহা বেশ বুঝিল।

ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া যখন দ্রব্য সামগ্রীর ফর্দ্দ করিতে করিতে একান্ত মনে কন্যার অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতার প্রশ্রয়দাতা কন্যার পিতার অপরাধের পরিমাপ করিতেছিলেন, তখন মৃগাঙ্কমোহন আসিয়া বলিল, "সুবিধা করতে পারলাম না মামি, আমায় তুমি মাপ কর।"

কৃষ্ণপ্রিয়া সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কি সুবিধা করতে পারলে না বাবা ?"

"এই তোমার জামাই হওয়া। না মামি, যা আছি, এই ভাল ; বেশী আদর আমার সহ্য হবে না। তা ছাড়া তোমার মেয়েটিকে ছোট বোনের মত আপ্যায়ন করে যাওয়াই ভাল। ও যা চক্রধরা সাপ, ওর খুব বেশী কাছে যাওয়া সুবিধা নয়। আর ও কি সতীন সইতেই পারবে ? আমি বন্ধুই বলি, আর যা-ই বলি, ও ত মনে করবে যে, সে ওর সতীন।"

অকস্মাৎ ছাদ ফুঁড়িয়া গৃহে বাজ পড়িলে মানুষ যেমন স্তম্ভিত হইয়া যায়, কৃষ্ণপ্রিয়াও সেইরূপ হইয়া গেলেন। অতি কষ্টে তিনি বলিলেন, "সতীন! তোমার বিয়ে হয়েছে না কি ?"

মৃগাঙ্কর মুখে কৌতুক-হাস্য উথলিয়া উঠিল। সে বলিল, "লোকে সেই কথাই বলবে বটে। যদিও আমি জানি, আমি সাত পাকে জড়িয়ে একটি বন্ধু ঘরে এনেছি।"

কথার সুরে ও ভাবে কৃষ্ণপ্রিয়ার মনে ঈষৎ সন্দেহ জন্মিতেছিল। এই মাত্র যে 'কন্যার বিবাহের কথায় থাকিবেন না' বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ইহারই মধ্যে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়া এই সংবাদের তীব্রতায় তিনি একান্তই অভিভূতা হইয়া পড়িলেন। এখন মৃগাঙ্কর হাসি মুখ দেখিয়া একটুখানি যেন আশান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি বলছ ?"

সে কহিল, "মিথ্যা বলে আমার লাভ কি মামি। একবার একটু-খানির জন্য মনে হয়েছিল বটে যে, মিথ্যাই না হয় বলব ; সে বন্ধুর খবরটা না হয় এখন উহ্যই থাক। কিন্তু সেটা পোষাল না। আমি লক্ষীছাড়া বটে—তা বলে জুয়াচোর নই মামি! আমি ওকে বিয়ে কর্‌তে পারিনে। তবে আমি এইটুকু করতে পারি, আমাদের ওখানে একটি ছেলে নতুন একটি চতুষ্পাঠী খোলবার চেষ্টা করছে ; ছেলেটি বড়ই ভাল। আমার মত হতচ্ছাড়া নয়—জামাই করবার যোগ্য বটে! আর আমি জানি, সে আমাদেরই স্বঘর। যদি বল ত তাকেই এনে তোমার জামাই করে দিতে পারি। তোমাদের এ বিষয় সম্পত্তিতে আমার এক কড়ারও লোভ নেই। ওসব তোমাদেরই বজায় থাকুক, সেই আমি চাই। তবু বড়লোকের ভাগ্‌নে বলে লোকের কাছেও ত একটু বড়াই করতে পারি। নিজে বড়লোক হওয়ার মত পাপ আর জগতে কিছুই নেই। সে আমার ধাতে সইবেও না। মিথ্যে মিথ্যে দুদিনে সব ফুঁকে দেব কেন ?"

কৃষ্ণপ্রিয়ার গভীর কৃতজ্ঞতার নির্ঝর বাষ্পাকারে দুই নেত্রে উদ্ভূত হইয়া চারিদিকটা ঝাপ্সা করিয়া তুলিল। সাগ্রহে ভাগিনেয়ের হাত ধরিয়া তিনি কহিয়া উঠিলেন, "তা হলেও ত বাঁচাও বাবা! কে সেই ছেলেটি ?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "তার নাম অম্বরনাথ।"

এই কথাটা শুনিয়া প্রথম বহুক্ষণ নীরব নিথর থাকিয়া অবশেষে কোনমতে কৃষ্ণপ্রিয়া স্বামীর নিকট গিয়া কথাটা যখন বলিয়া ফেলিলেন, তখন তাঁহার মনে ঘোর সংশয় এবং এ বিষয়ে কিছু অসম্ভবত্বও জাগিয়াছিল ; কিন্তু স্বামীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার মনে কোথা হইতে যেন একটা বল আসিল। তিনি তখন নিজেই তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "ইহাতে এমনি দোষ কি ? কুলীনের ঘরে চিরকাল ধরিয়াই ত এই প্রকার হইতেছে। বিক্রমপুর হইতে তাঁহার পিসীদের জন্ত যে পাত্র আসিয়াছিল, তাঁহারা অম্বরের চেয়ে কোন্ অংশে ভাল ? মেয়ের যোগ্য ত হবেই না, তা সে আর কি করা যাইবে ? তবে এ কথাও একশত বার বলিব যে, মৃগাঙ্কর চেয়ে অম্বর শতগুণে শ্রেষ্ঠ। সে না হয় গরীব। তা হইলই বা ? মেয়ে কি শ্বশুর-ঘর করিবে যে, তাহার দুইটা ধন থাকা প্রয়োজন ? বেশ, ভালই হইবে। ঘর-জামাই করিতে হইলে এইরূপই ভাল। ইংরেজিতে পাশ টাস করে নাই ? তা না হউক—একটা বিত্তাও ত পূরাপূরি জানে। পূজা অর্চ্চনা ঠিক মত করিতে না জানা যদি এতই অপরাধ মনে করিয়া থাক, তবে তুমিও ত সে সব কিছুই জান না। হিন্দু ঘরের মেয়ে, বাপ মা যাহাকে দিবেন, তাহাকেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে। ঠাকুর নিজেও সর্ব্বদা এই কথা বলিতেন, সে ঠিকই কথা। সন্তানের সকল আব্দার শোনায় তাহার সর্ব্বনাশই করা হয়। অতটা বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নয়। মেয়ে বলেন, 'মেমেদের মত আইবুড়া থাকিব।' অমনি তোমারও সেই সাধ হইল না কি ? তাহা হইলে অবশ্য কিছুই উপায় নাই। কিন্তু এখন ত সে পথও বন্ধ—আর পাছে ঐরূপ ঘটে, সেই ভয়েই ঠাকুর এমনটা করিয়া গিয়াছেন। এখন আর খুঁৎ খুঁৎ করিবার সময় কোথায় ? একেবারে এ বিষয়ে মন ঠিক করিয়া ফেল।"

গৃহিণী "মন ঠিক করিতে" উপদেশ দিলে কি হইবে, রমাবল্লভ কিন্তু কিছুতেই মনকে বাঁধিতে পারিলেন না। একেবারে এত বড় দণ্ডটা পিতা হইয়া তিনি তাহাকে কেমন করিয়া দিবেন? কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডবল অনার্স পাশ সুসভ্য ধনীর সন্তান—আর কোথায় অযোগ্যতার জন্য বিতাড়িত তাঁহারই ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী অবজ্ঞেয় অম্বর! কোন্ সাহসে বা এ কথা তিনি বাণীর কর্ণগোচর করিবেন?

কিন্তু এ ভাবনাটা বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না। বাণী এ সংবাদ শীঘ্রই পাইল। প্রথমে এক দাসীর মুখে ইহা শুনিয়া নিষ্ঠুর পরিহাস মনে করিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছিল; পরে যখন যথার্থ বলিয়া জানিতে পারিল, তখন একটা দুর্দ্দমনীয় মানসিক যন্ত্রণায় সে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। যে অম্বর তাহার পিতার বেতনভোগী ভৃত্যমাত্র ছিল—তাহারই মন্দিরের অযোগ্য পুরোহিত বলিয়া এই সেদিন মাত্র সে তাহাকে অক্ষমতার জন্য তিরস্কার করিয়া বিদায় দিয়াছে—সেই ব্যক্তিরই পায়ে ধরিয়া তাহার পিতা তাহাকে দান করিবেন? আর এই দেব-চরণে উৎসর্গিত শরীর, তৎকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত সেই ভিখারীকেই সমর্পণ করিতে হইবে? বাণী ভাবিল, এ কথা শুনিবার পূর্ব্বে সে মরিয়া গেল না কেন?

কৃষ্ণপ্রিয়া তখন কাজে ব্যস্ত ছিলেন; বাণী তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, "মা! তোমাদের জ্বালায় আমি বাড়ী ছেড়ে বনে চলে যাব। আমি না থাকলে দাদাবাবুর উইল ত আর মানতে হবে না?"

"কেন কি হয়েছে?"

"তুমি নিশ্চয়ই সব জান; এ কক্ষনোই বাবার পরামর্শ নয়, নিশ্চয় তোমারই এ কাজ। যেখানে যত হাড়-হাবাতে হতচ্ছাড়া আছে, খুঁজে খুঁজে তুমিই ত সব বার কর্চ।"

কৃষ্ণপ্রিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "অবাক্ করলি বাণি!

ব্রাহ্মণ সজ্জনকে গাল দিচ্ছিস্ কোন্ সাহসে বল্ দেখি? এতদিন পূজা-জপ করে তোর এই বিদ্যে হল?”

ঘোর অবজ্ঞায় বাণী রাঙা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, “ভারী ব্রাহ্মণ! বড় সজ্জন! বলে কি না, ‘আত্মা আর পরমাত্মা এক!’ তার মানেই ত ঈশ্বর না মানা। যারা ঈশ্বর মানে না তাদের নাম ত নাস্তিক? তা নাস্তিক নৈলে হরিপূজায় জবা ফুল আর কোন্ আস্তিকে দেয়? তখনি আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, ও নিশ্চয়ই ভাল ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণের ঘরে কচিছেলেটিরও এ জ্ঞান থাকে। ছোট মেয়েরাও তুলসী দিয়ে শিবপূজা জবা দিয়ে বিষ্ণুপূজা করে না। সে দিন আহ্ ঠাকুর যখন এসে খবর দিলেন—নতুন ঠাকুর টোলে বসে বৌদ্ধ মত প্রচার করছেন, তখনি বুঝলাম যে, উনি কি! এমন স্পর্দ্ধা ওঁর—পরমেশ্বরের সঙ্গে উনি এক হ’তে চান! আর স্বচ্ছন্দে দাদাবাবুর চতুষ্পাঠীতে ব’সে সেই নাস্তিক মত প্রচার করতে সাহস করেন! অনেক কষ্টে তাকে বিদায় করেছি। রক্ষা কর মা, দোহাই তোমাদের, যোড়হাত করছি—সে পাপকে আর সাধ করে সেধে পড়ে ডেকে এনো না।”

কৃষ্ণপ্রিয়া বহুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এত বড় বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও কি এ বিবাহ সম্বন্ধ করা উচিত হইবে? বাণী মাকে নীরব দেখিয়া সক্রোধে চলিয়া গেল। দুঃখে অভিমানে অপমানে তাহার চোখ ফাটিয়া আগুন বাহির হইতেছিল। যাইবার সময় পথিমধ্যে একজন দাসী “দিদিমণি শোন” বলিয়া হাসিমুখে কি একটা খবর দিতে আসিতে-ছিল, সে তখন তাহাকে যাহা খুসী বলিয়া অন্তর্দ্দাহের সামান্য একটুখানি ঝাল মিটাইল। দাসী অকারণে এতখানি লাঞ্ছিত হইয়া বুঝিল, দিদিমণির মন ভাল নাই; এবং ইহাও বুঝিল, যখন মনের ঝাঁজ কমিয়া যাইবে, তখন সে এই বকুনি খাওয়ার ফলে কিছু পুরস্কৃতও হইতে পারে; তাই সে

আশার সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। লোকের সামান্ত ত্রুটি ধরা এবং নিজের ত্রুটির দণ্ড দেওয়া দুইই তাহার স্বভাব।

তালে ছন্দে গ্রথিত পরস্পরের সহিত সমঞ্জস বাক্য-প্রবাহের নাম সঙ্গীত এবং তদ্‌বিপরীতেই কোলাহল। জগতের প্রাণস্পন্দন হইতে আজিকার এই মুহূর্ত্ত অবধি যে কোন কার্য্য চলিতেছে, তাহা তাহাদের নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট তালে ও ছন্দেই সম্পন্ন হইতেছে। পৃথিবীর গতি, গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিচরণ, জাগতিক বস্তুসমূহের বিবর্ত্তন, নদীর স্রোত, জীব ধমনীর উত্থান পতন—সমস্তই এক অবিচ্ছিন্ন ছন্দে তালে নিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি নির্দ্দিষ্ট ছন্দ ও তাল আছে; তাই তাহাদের স্ব-ছন্দ। স্বভাব ও স্ব-ছন্দ একই পর্য্যায়-ভুক্ত। যে সংসারে সকলেই সঙ্গীতপরায়ণ অর্থাৎ স্বচ্ছন্দচিত্ত, সে সংসারে সুখের সীমা নাই—সেই সংসারই স্বর্গ। আর যে সংসারে সঙ্গীত ফুরাইয়াছে, সকলই নিজ নিজ ছন্দভ্রষ্ট হইয়া কোলাহলপরায়ণ হইয়াছে, সেখানে কাহারও সুখের আশা নাই। অস্বচ্ছন্দতা সেখানে আধিপত্য বিস্তার করিবেই করিবে। রমাবল্লভের সংসারে ছন্দভ্রষ্ট সঙ্গীতের তাল কাটিয়াছিল, তাই সেখানে পিতা পুত্রী জননী সকলেই অসুখী। কৃষ্ণপ্রিয়া স্বামীর অত্যধিক সন্তান-বাৎসল্যে বিরক্ত, বাণী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রমাবল্লভ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। বিপদ কিন্তু বেশী সব চেয়ে রমাবল্লভেরই। কৃষ্ণপ্রিয়ার মন ভাল; তিনি মন্দটাকেও ভালভাবে গ্রহণ করিয়া ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তনে আত্মসমর্পণ করিতে জানেন বলিয়া কোন অবস্থাতেই বড় একটা দুঃখ ভোগ করেন না। বাণী সহজেই বড় কষ্ট পায়, কিন্তু সে একা একা এতটুকুও ক্লেশ ভোগ করিতে রাজী নয়; রাগিয়া কাঁদিয়া অভিমান করিয়া মাকে আব্দারে আব্দারে অস্থির করিয়া ফেলিয়া সে, সে ক্ষতির শোধ তুলিয়া তবে ছাড়ে। কিন্তু পুরুষমানুষ রমাবল্লভ গৃহিণীর

সহিষ্ণুতা ও বালিকার অধৈর্য্য এ দুইয়েরই বাহিরে। তিনি জমিদার-সন্তানের স্বভাবসিদ্ধ আত্মাভিমান ও উচ্চশিক্ষার ঈষৎ গর্ব্ব লইয়া একপার্শ্বে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন ; তাই সংসারে তাঁহার একটিও বন্ধু নাই। বড়লোকের ছেলেদের আমোদের সঙ্গী অনেক থাকে, প্রকৃত বন্ধু প্রায়ই থাকে না। আমোদ-প্রমোদ-বীতস্পৃহ চরিত্রবান ধনী রমাবল্লভ তাই চিরদিনই নিঃসঙ্গ। একমাত্র সুখ-দুঃখভাগিনী কৃষ্ণপ্রিয়াই তাঁহার চিরসঙ্গিনী। কিন্তু আজকাল কন্যা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে ঈষৎ মনোমালিন্য চলিতেছিল। কৃষ্ণপ্রিয়া মা হইয়াও যতদূর না মোহের বশীভূতা, পিতা তদপেক্ষা শতগুণে অপত্য-স্নেহের অন্ধ মায়ায় জ্ঞানশূন্য। তাঁহার প্রথম হইতেই ইচ্ছা ছিল, মেয়েকে আধুনিক শিক্ষা দীক্ষায় গড়িয়া তুলেন ; পিতার জন্য তাহা সম্পূর্ণ করিতে না পারায় বরাবরই একটু দুঃখিত। তার পর আবার অযোগ্য পাত্রে কন্যার বিবাহ দিয়া তাহার চিরজীবন বিষময় করিতে তাঁহার বুক ফাটিতেছিল। রমাবল্লভ বড় সাধ করিয়াছিলেন, মেয়ের যোগ্য বর বাঙলা দেশ পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াও বাহির না হয়, বরং চিরকৌমার্য্য লইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করুক, তথাপি সামান্য ত্রুটি থাকিতে কেহ তাঁহার বাণীর পাশে দাঁড়াইবার অধিকার পাইবে না। সর্ব্বরূপগুণযুক্ত ডবল এম-এ, বা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ উপাধিধারী পাত্রের কমে তাঁহার মনঃপুতই হইতেছিল না। মেয়েও চিরদিন বাপের মুখে এই আভাষ পাইয়া আসিতেছে। তাই সে আবার আর একগ্রাম সুর চড়াইয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল, তাহার যোগ্য বর এ ভারতবর্ষে—এখনকার এ অধঃপতনের দিনে জন্মায় না। একমাত্র জগৎবল্লভ গোপীবল্লভই তাহাকে লাভ করিবার যোগ্য। তাই সে বড় নিশ্চিন্ত ছিল যে, মানুষকে কোনমতেই সে বিবাহ করিবে না।

কেবল একটা কথা ভাবিয়া সে মধ্যে মধ্যে মনে মনে একটু হাসিত। 'বাবা বলিয়াছেন, সতীনের হাতে দিবে না। তা রাধা ঠাকুরাণী যে পাশেই দাঁড়াইয়া আছেন, এখন বাবার বর পছন্দ হইলে হয়।'

সেদিন এই মহা সঙ্কটের সংবাদে রমাবল্লভ যখন বিহ্বল চিত্তে আকাশ-পাতাল ভাবিয়া অস্থির হইতেছেন, এমন সময় ঝড়ের বেগে দ্বার খুলিয়া জ্বলন্ত উল্কার মত তাঁহার আদরিণী কন্যা আসিয়া ডাকিল, "বাবা! এ কি রকম কথা উঠেছে? তার চেয়ে আমায় তোমরা চিত্রার জলে ভাসিয়ে দিতে পারতে না? সব লেঠা চুকে যেত।"

তাহার মন তখন অগ্নি-দগ্ধ লৌহের মত লাল হইয়া জ্বলিতেছিল। রমাবল্লভ ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "বাণি, মা আমার! সর্ব্বস্বধন আমার! এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত মা! তোর চেয়ে এতে কি আমারই বেশী অপমান নয় মা? আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, কিছুই কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছি না যে! বল দেখি, আমি কি করি মা?"

পিতার চোখে জল দেখিয়া বাণী আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। অশনিবর্ষী মেঘের মধ্য হইতে হিমকরকা বর্ষিত হইয়া গেল—অকস্মাৎ সুর বদলাইয়া ফেলিয়া সে বলিয়া উঠিল, "বাবা, তবে না হয় যা হয় হোক্ গে। কিন্তু তুমিও এই প্রতিজ্ঞা কর যে, সে এখানে একেবারে থাকতে পাবে না, আমিও যেমন আছি, ঠিক এমনি থাকতে পাব—জন্মের মত সে দেশ ছেড়ে চলে যাবে?"

রমাবল্লভ ইহা শুনিয়া যেন অকস্মাৎ একটা পথ দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "বাণি, আমায় তুই বাঁচালি মা! আচ্ছা, তাই হবে। তবে এই কথাই বলব। তোর এই পরামর্শ ই দেখছি সব দিকে ভাল।"

"কত তপস্যায় তোমার মত বাপ পাওয়া যায় বাবা! দাদাবাবু

কখনও আমায় তোমার মত ভালবাসতেন না। তা হ'লে কি এমন করে—বাবা! দেখো, তুমি এ কথা ভুলে যেওনা কিন্তু।"

রমাবল্লভ সস্নেহ নেত্রে তাহার জলদজালসন্নিভ কেশরাশিবেষ্টিত অন্ধকার মুখের আকস্মিক উজ্জ্বলতা লক্ষ্যে একটুখানি আশ্বস্ত হইলেন; বিষণ্ণভাবে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না রে না, এ কি ভুলে যাবার কথা?"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গোলপাতা ছাওয়া দুই-তিনখানি মেটে ঘর। সম্মুখে লালমাটির নিকানো আঙ্গিনা। চারিদিকে রাংচিত্রার বেড়া বাঁধা এবং তাহার বাহিরে অদূরে ঘেঁটু, কালকাসন্দা প্রভৃতির ঘন ঝোপে শ্বেত ও হরিদ্রা-বর্ণের বন্য পুষ্প সকল ফুটিয়া আছে; এদিকে ওদিকে দুই-একটা বাঁশঝাড় বাতাসে শন্ শন্ করিয়া উঠিতেছে। অঙ্গনপার্শ্বে একটি ঘোড়ানিমের গাছ ঝিরঝিরে বাতাসে শাখা দুলাইয়া মধ্যে মধ্যে গন্ধ ছড়াইতেছিল ও অজস্র পুষ্প বর্ষণ করিতেছিল; তাহার উপরে দুই-একটা পাখী কিচমিচ শব্দে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। অঙ্গনে দুই-একটা ম্যালেরিয়া-শীর্ণ উলঙ্গ শিশু একখানা কাঠের তক্তায় দড়ি বাঁধিয়া গাড়ি গাড়ি খেলিতেছিল। তাহার অর্দ্ধবয়সী জননী রন্ধনের চালায় পাকশাক করিতে ব্যাপৃতা ছিলেন, আর অন্য একখানা কুটীরাঙ্গনে একখানা ছেঁড়া কম্বলের উপর বসিয়া এক গৌরবর্ণ সুদর্শন-কান্তি যুবাপুরুষ কতকগুলি পুঁথি-পত্র লইয়া পড়াশুনা করিতেছিল। বইগুলির চেহারা হইতেই বুঝা যাইতেছিল সেগুলি ধর্ম্মপুস্তক। পুস্তকগুলি বোধ করি রাজা মান্ধাতার আমলের। অতি জীর্ণ—প্রায় গলিত। যুবা নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে পেন্সিল লইয়া পুঁথির গায়ে দাগ টানিতেছিল, কি সব লিখিয়া

রাখিতেছিল। সেই সকল শব্দ সাধারণের বোধ্য নয়। ইহাতে ‘প্রমাতা’ ‘প্রমেয়’, ‘অহাপ্তি’, ‘অজহাতি’ প্রভৃতি প্রমাণ প্রয়োগাদি সমেত বিবিধ জটিল তর্কজাল ছড়ান ছিল।

ক্রমে প্রথম গ্রীষ্মের প্রদীপ্ত সূর্য্যরাশি সরিয়া সরিয়া আঙ্গিনায় ক্রীড়াশীল শিশুদের মধ্যে আসিয়া পৌছিল। শিশুরা অপরিচিতের আগমন না সহিতে পারিয়াই হউক, অথবা শাস্তি বশতঃই হউক, খেলা ছাড়িয়া অধ্যয়নশীল যুবকের চারিপার্শ্বে আসিয়া জড় হইল। তখন কেহ তাহার পিঠের উপর পড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিল, কেহ তাহাকে বলিল, ‘একটা গল্প বল না’, কেহ পুঁথি-পত্রগুলা টানিয়া অপরকে কহিল, ‘আয় ভাই, ছবি দেখি।’

পাঠ-রত যুবক এ সকলে মন না দিয়া দুরূহ বিষয় সকল সহজীকরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই একটা পরিচিত শব্দ শুনিয়া তাঁহার সুদূর-প্রস্থিত চিত্ত অতি সহসাই রঙ্গস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। সকলের ছোট ছেলেটি কোথা হইতে হামা দিয়া আসিয়া তাঁহার একখানি পুঁথি দখল করিয়াছিল; এখন মহোল্লাসে তাহা ছিন্ন করিতে লাগিয়া গিয়াছে! —“ওরে কি করলি!” বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ছিন্ন পুস্তকখানা তাহার হাত হইতে টানিয়া লইলেন। যাহা গেল, তাহা আর পাওয়া যাইবে না। হৃদয়-শোণিত তুল্য প্রিয়, বড় দুঃখে সংগৃহীত ‘মহাভাষ্য’খানি জন্মের মতই গেল! এত দাম আর কেমন করিয়া জুটিবে? এক মুহূর্ত্ত ব্যথিত নেত্রে তিনি এই গলিত-পত্র খণ্ডিত-মূর্ত্তি বইখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন, তার পর একটা অতি মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া সহসা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় ক্রন্দনশীল শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন। অন্য ছেলেরা ভাইয়ের এই অকর্ম্ম দেখিয়াছিল, তাহারা মহাকোলাহলে তাহাদের জননীকে দুঃসংবাদ দিতে ছুটিল। সোরগোলে

ডাকাডাকি করিয়া খবর দিল, "মা, মা, খোকা অম্বরকাকার বই ছিঁড়েচে।"

অম্বর—যুবকই অম্বরনাথ। সে ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ওরে না না, তোরা থাম্। ও কি জানে ?" সে জানিত, তাহার বৌদি' এ অপরাধে শিশুর অজ্ঞতা মাপ করিতে রাজী হইবেন না।

এমন সময় সহসা সেই সমস্ত গোলমাল একসঙ্গে থামিয়া গেল, ছেলেগুলা মুখ শুকাইয়া যে যেখানে দাঁড়াইয়া পড়িল, গৃহিণী ব্যঞ্জন চালনার খুন্তি হাতে দ্বারের বাহিরে আসিয়া "কৈ, সে হতভাগাটা কোথায় গেল রে ?" বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন, তিনিও তৎক্ষণাৎ বামহস্তের কবজি দ্বারা কোনমতে মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অম্বর বুঝিল গৃহস্বামী গৃহে ফিরিয়াছেন। সেও একটু সন্ত্রস্তভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ক্রন্দনপরায়ণ শিশুটিও ইতিমধ্যে তাহার রাশভারি পিতার আগমন প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থামিয়া গিয়াছিল।

অম্বরের ভ্রাতৃ সম্পর্কিত গঙ্গারাম শর্ম্মা গ্রামের পুরোহিত। যজমান সাধিয়া তিনি ঘরে ফিরিয়াছিলেন ; অন্যদিন এ সময় নৈবেদ্য দক্ষিণার স্বল্পতায় ও গৃহের মধ্যে পরিবারবর্গের প্রাচুর্য্যে তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া থাকিত। সে সময় সম্মুখে যে ছেলেটা মেয়েটা পড়িত, তাহার উপরেই অনেকখানি মনের ঝাঁজ বাহির হইতে বাধিত না। তাই পিতৃ সন্দর্শনে শাসনভীত সন্তানেরা দণ্ডভীত অপরাধিদলের মত মুহূর্ত্তে তটস্থ হইয়া পড়িল। অম্বর ইহা দেখিত, এবং মনে মনে সে ইহাতে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিত। ইহা স্মরণে তাহার স্নেহতপ্ত হৃদয়ের করুণাধারা ঢালিয়া দিয়া অনাদৃত শিশুগুলিকে অন্তরালে বুকে টানিয়া লইত—সম্মুখে চুপ করিয়া দেখিত ও সহিত। আজ গঙ্গারামের মেজাজে ঝাঁজ ছিল না ; দারিদ্র্যের উৎপীড়নে উৎখাত চিত্তের প্রতিবিম্ব স্বরূপ

স্বাভাবিক অপ্রসন্ন মুখ আজ বড় প্রসন্ন। রন্ধনগৃহের দ্বারের নিকটে গিয়া উত্তরীয় সমেত নৈবেদ্যাংশ প্রভৃতি স্থাপনপূর্ব্বক গৃহিণীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ওগো, এই তোমার সামগ্রী-পাতি দেখিয়া শুনিয়া লও।" তারপর দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে অম্বরের ক্রোড়স্থ অশ্রুচিহ্নিত ছেলেটাকে সহাস্যে কহিলেন, "কিরে নিতে, কাকার কোলে চড়ে আবার কান্না হচ্ছিল যে বড়? ওহে অম্বর, তোমার ভূতপূর্ব্ব অন্নদাতা রমাবল্লভ-বাবু আজ যে, আমায় এক পত্র লিখেছেন—তোমায় অবিলম্বে একবার সেখানে পাঠাইতে অনুরোধ। আর তোমায় যদি সেখানে সত্বর পাঠাইতে পারি, তবে আমার জন্য মাসিক বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিবেন, এমনও তাহাতে আভাস আছে। কেন ব্যাপারটা কি বল দেখি।"

শুনিয়া অম্বর আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহাকে ডাকিযাছেন? তাহাকে?—কি প্রয়োজন?—কেন ডাকিলেন?—সে ত কখনই তাঁহাদের এতটুকু কোনও প্রয়োজনেও লাগে নাই। তবে আজ তাহার দ্বারা কি কার্য্য খুঁজিতেছেন? সে কি করিতে পারে?

তাহাকে নীরব দেখিয়া গঙ্গারামেব মনে একটু খটকা লাগিল; তবে কি যাইতে সে ইচ্ছুক নয়? অবশ্য ভিতরে বিশেষ কোন একটা কারণ আছেই—নইলে এতবড় একটা লোক তাহার মত সামান্য একজনকে এত কাকুতি মিনতি করিয়া কেন পত্র লিখিবেন? আবার পাঠাইতে পারিলে পুরস্কার! তবে হয় ত পাঠানটা খুবই সহজ নয়? ব্যগ্রভাবে তাহার মুখের ভাব পর্য্যবেক্ষণের চেষ্টা করিয়া তিনি কহিয়া উঠিলেন, "তুমি যাবে ত?"

অম্বর তাঁহার কথা শুনিতে পায় নাই। সহসা সে চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।—কেন ডাকিয়াছেন?—সত্যই কি ডাকিয়াছেন?—না, দাদার বুঝিবার ভুল? সে কিছুক্ষণ পরে চোখ তুলিয়া সংশয়াকুল চিত্তে গঙ্গারামের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন ত?"

গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ?"

"আমাকে যাইতে আদেশ করিয়াছেন ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় ! তোমাকেই !—তুমি যাইবে না, না কি ?" গঙ্গারাম রুদ্ধশ্বাসে উত্তর শুনিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অম্বর ঈষৎ বিচলিতভাবে একবার বাহিরের দিকে তাকাইল। বাতাসে তখন ঘোড়ানিমের ফুলের গন্ধ ভাসিতেছিল ; খর করজালে চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া গ্রীষ্মের প্রভা-দীপ্ত সূর্য্য আকাশের মধ্য পথে গড়াইয়া আসিতেছিল ; বিদ্যুতের মত তীব্র আলোয় গাছের পাতাগুলা নূতন পালিশ করা অলঙ্কারের মতই ঝক্‌মক্ করিতেছিল, ফুলের গন্ধে কোন্ সে এক অপরিচিত স্থানের কথা মনে জাগে। সে যেন এক স্বপ্নলোক ! সেখানের স্মৃতি ব্যথা পায় তবু আকর্ষণ ছাড়াইতে পারে না। সে মৃদু নিশ্বাস ফেলিল। কুণ্ঠিত চিত্তকে সহজ করিয়া লইয়া সে উত্তর দিল, "যাইব বৈ কি। তিনি প্রভু। যখন ডাকিয়াছেন, তখন যাইতেই হইবে। কি বলেন ?"

ব্রাহ্মণ মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "যাওয়া ত চাই, নহিলে অকৃতজ্ঞতা পাপে পাপী হইতে হইবে যে। শাস্ত্রে অন্ন-দাতাকে পিতার সমান সম্মান দিয়াছে।"

অম্বর রাজনগরে ফিরিয়া আসিল। সেই দুই পার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণী-ছায়াশীতল সুপ্রশস্ত রাজপথ, শস্য বোঝাই গো শকটের সেই অবিরাম যাতায়াত, সহরের বুকে সেই বিবিধ দ্রব্যজাতে সুসজ্জিত বিপণী, পার্শ্বে গ্রামের পাঠশালে সেই পরিচিত গুরুমহাশয় বিবিধ মুখভঙ্গী সহকারে অনুনাসিক ও তালব্য বর্ণের উচ্চারণ শিক্ষা দিতেছেন। সেদিন হাটবার। বেচাকেনার কোলাহলে মৎস্য গন্ধে মক্ষিকার ভন্‌ভনানিতে স্থান মুখরিত। অম্বর স্নেহপূর্ণ নেত্রে সেই সকল পরিচিতদের দেখিতে দেখিতে অগ্রসর

হইতে লাগিল। বন্ধু যেন বন্ধুর নিকটে ফিরিয়া আসিতেছিল। অদূরে ঐ বাগেদের খিড়কির পুকুর, ঐ মহেশ মণ্ডলের পাতাছাওয়া ঘরের পাশে জবার গাছ—গাছ ভরিয়া ফুল ফুটিয়া আছে, একটি শোণিতাক্ষরে লিখিত স্মৃতির মত তাহার মনের মধ্যে ঐ লালের রংটুকু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এইবার বৃক্ষ ব্যবচ্ছেদ পথে গ্রামের সীমানায় সরিষা ফুলে আলো করা ক্ষেত্রগুলি গ্রাম জননীর বিস্তৃত হরিদ্রাঞ্চলের মত মৃদু বাতাসে দুলিয়া উঠিয়াছে। চিত্ররেখার সলিল রেখাটুকু তাহারই স্বল্পদূরে জননীর বক্ষ-নিঃসৃত ক্ষীরধারার ন্যায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে। হয় ত পরাণ আজও তাহার সেই ছোট ডিঙ্গিখানি ভাসাইয়া মাছ ধরিয়া বেড়ায়, সে এখনও জানে না যে, তাহার দাদাঠাকুর আবার তাহাদের পার্শ্বে ফিরিয়া আসিয়াছে। অম্বরের বুকের মধ্যে হর্ষের সহিত একটা বিষণ্ন সংশয় জাগিয়াছিল, কেন এ আহ্বান?—এ আহ্বান কে করিয়াছে?—জমিদার নিজে?—অথবা আর কেহ?—আদ্যনাথ ভাল আছেন ত? কে জানে।—শেষ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ধমনীর মধ্যে রক্তসঞ্চালন মৃদু হইয়া আসিল! ভগবান করুন, যেন সে ভালই থাকে!

পথে পরিচিত দুই একজন 'কে, ছোট পণ্ডিত না?' বলিয়া সবিস্ময়ে অভ্যর্থনা করিয়া গেল। কেহ দাঁড়াইয়া, 'কবে আসিলে? কোথা থাকা হইয়াছিল?' ইত্যাদি আবশ্যক অনাবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া গেল। সে কাহাকেও আদ্যনাথ বা জমিদার-বাটীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। কি জানি, যদি তাহারা কোন দুঃসংবাদ দান করিয়া বসে।

প্রভাত সূর্য্যালোকে অপূর্ব্ব দীপ্তিশালী মন্দিরচূড়া অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টি ঝলসাইয়া দিল। প্রচুর শুভ্র মেঘপুঞ্জের ন্যায় নির্ম্মল নীলের মাঝখানে সে মন্দির তেমনই অচল হইয়া আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে তখন ঘণ্টা কাঁসর

শঙ্খ বাজিতেছিল, বাহিরে নাট-মন্দিরে করতাল সহযোগে বৈরাগিগণ নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছিল।—

"শচী মা। দেখ্ চেয়ে ঐ এলো গোরা—
ওমা উঠে যা মা, ছুটে যা মা, মুছে যা মা নয়নধারা,
তোর আঁধার ঘরে মাণিক জেলে,
দেখ্ চেয়ে ঐ এলো গোরা।"

অম্বরের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আরও স্থির হইয়া আসিল। এই কোলাহলময় মন্দির—পূজার মাঝখানে এক একনিষ্ঠ চিত্ত আপনার চির ভক্তিভরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে ত? তাহার নিষ্ঠার তেজে সকল ত্রুটিই যে ক্ষালিত হইয়া যায়। মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া সে ফিরিয়া আসিল এবং সেইখানেই দাঁড়াইয়া দেবতাকে প্রণাম করিল।

আবার সেই বৃহৎ কক্ষে জাজিম পাতা ঢালা বিছানায় তাকিয়ার সারি, মধ্যস্থলে পুরু গদির উপর বকপক্ষ শুভ্র শয্যায় জমিদার মহাশয় আসীন। অম্বর নত মস্তকে নমস্কার করিয়া সেইখানে দাঁড়াইল। বেলা পড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকের জানালা দ্বার মুক্ত। তিন দিকের দ্বারের মধ্য দিয়া গৃহোদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন অংশত্রয় দেখা যাইতেছে। সম্মুখেই মর্ম্মর-উৎসে শেষ বেলায় সূর্য্যকিরণের সঙ্গে জলের খেলা ও সেই সমুজ্জ্বল জলধারার নির্ঝরাকারে পতনের সঙ্গীত রব অস্ফুটভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া দর্শককে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। ইহা ভিন্ন বাগান ভরিয়া ফুলের বাহার, বারান্দায় খাঁচায় বদ্ধ পাখীর সহিত গাছের ডালের স্বাধীন বিচরণশীল পাখীদের সম্মিলিত গানের সুর, সেও কম মিষ্ট নয়। রমাবল্লভ কিন্তু এ সকল কিছুই দেখিতে বা শুনিতে ছিলেন না। তাঁহার মনের যে অবস্থা, সে অবস্থায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পৃথিবীকে গ্রাসোদ্যত বিকটাকার

কুম্ভীরের মত ও তাহার সমস্ত পোতা সম্পদকে তাহারই ব্যাদিত বদনের আভ্যন্তরিক তীক্ষ্ণধার দশন শ্রেণীবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে। তখন নিরাশা সহ্য হয় না, কিন্তু আশা করিতেও সাহসে কুলায় না; এমন অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিলে মানুষ হয় মরিয়া যায়, না হয় পাগল হয়। ধনীর এ দুঃখ দরিদ্রে বুঝিবে না। তাহাদের অনেক দুঃখ আছে, কিন্তু এ দুঃখের আস্বাদ তাহারা পায় না। মানসিক যন্ত্রণার এই চরম অবস্থায় যদি কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রতি রোগীর মনের ভাব যে কি হয়, তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে। মূর্ত্তিমান আশার ন্যায় অম্বর রমাবল্লভের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে আনন্দে রমাবল্লভ যেন কি এক রকম হইয়া গেলেন। —আসিয়াছে! তবে সে রাগ করিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে নাই! আজ তিনি পূর্ব্বের ন্যায় তাহার নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন না, ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন।

বিস্মিত স্তম্ভিত অম্বর ব্যাপারটা ধারণা করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে আরও বিহ্বল করিয়া তাহার ভূতপূর্ব্ব প্রভু কহিয়া উঠিলেন, "এসেছ! আঃ, আমায় বাঁচিয়েছ তুমি, আমি সন্দেহে মরছিলাম।"

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলে দুইজনেই কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। রমাবল্লভের মনে এখনও একটা সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে; তাহা এই, যদি অম্বর রাণীর ব্যবহার স্মরণে তাহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হয়? অম্বর ভাবিতেছিল, আবার তাহার উপর পূজার ভার পড়িবে। আশুনাথের বোধ করি জবাব হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন?

অবশেষে সঙ্কোচ সরাইয়া ফেলিয়া রমাবল্লভ কহিলেন, "তোমায় কেন ডেকেছি—হয় ত তুমি সে কথা এখনও জানই না? আমার সর্ব্বস্ব আজ তোমারই উপর নির্ভর করছে, তাই তোমায় ডেকেছি।"

অম্বর পূর্ব্ব অবিশ্বাসে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। রমাবল্লভ তাহা বুঝিলেন; বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না, হঠাৎ কেই বা বিশ্বাস করতে পারে? কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, তোমার দয়ার উপরই আজ আমার মান সম্ভ্রম সুখ ঐশ্বর্য্য সবই নির্ভর করছে।—থাক্, বাধা দিও না, সবই আমি ক্রমে ক্রমে বলছি। আগে তুমি বল—এখন তুমি কি করছ? নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই বা কি ভেবেছ?"

অম্বরের বিস্ময় বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাহার সহিত আজ এমন অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতা কেন? কিন্তু প্রভুর প্রশ্নে সে ত প্রতিপ্রশ্ন করিতে পারে না; তদ্ভিন্ন সেরূপ কৌতূহলী স্বভাবও তাহার নয়। তাই বিস্ময় অপ্রকাশ রাখিয়া সে একটা ঢোঁক গিলিয়া উত্তর দিল, "গঙ্গারামদাদার ওখানে আপাততঃ আছি। তাঁর অবস্থা ত তেমন ভাল নয়, শীঘ্রই ওখান থেকে চলে যাব। আমার গুরুদেবের—দীক্ষাগুরুর সম্প্রতি অমৃতলোক প্রাপ্তি ঘটেছে। তিনি আসামের ও-দিকে কুমিল্লায় আর আর দুই-এক স্থানে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপনের চেষ্টা করছিলেন, আমায় সেই চেষ্টা-ভার দিয়ে গিয়েছেন। তাই সেখানে গিয়ে কি করতে পারি দেখব মনে করেছি।"

"তিনি কি সে উদ্দেশ্যে কোনও সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন?"

"সামান্যই। ভিক্ষার ধনে কার্য্যোদ্ধার করতে হবে।"

রমাবল্লভ একটু উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। সাগ্রহে কহিলেন, "খুব ভাল মতলবই করেছ। দেশে সংস্কৃত চর্চ্চা না হলে দেশের লোকে সম্যক জ্ঞান পেতেই পারে না। সংস্কৃত ভাষা সাক্ষাৎ দেব-ভাষা, ও থেকে দেবতার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়। আচ্ছা, আমি তোমার কাজের জন্য বাৎসরিক—" একটু হিসাব খতাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "প্রায় দশ-বার হাজার টাকা আয় করে দিতে পারি।"

অম্বর আবার সেইরূপ বিস্ময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এ কি! এখানে

আজ একটা নাট্যাভিনয় চলিতেছে নাকি? রমাবল্লভ কহিতে লাগিলেন, "টাকা না হলে সংসারে কিছুই হয় না। টাকা হাতে থাকলে কত ভাল ভাল কাজ করা যেতে পারে। তোমার চতুষ্পাঠীর জন্ত বাৎসরিক বার হাজার টাকা আয় হলে তা থেকে কত কাজ হবে, ভাব দেখি?"

বড় প্রলোভনের কথা! শ্রোতা যেন এই কথাগুলির ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ সফলতার পূর্ণ চিত্র সেই মুহূর্ত্তে অঙ্কিত দেখিল। তাই আবেগবশে স্বভাবসিদ্ধ মৃদুতা অপেক্ষা একটু ব্যস্তভাবেই কহিয়া ফেলিল, "আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি!" কিন্তু কথাটা বলা হইয়া গেলে তাহার একটু লজ্জা করিতে লাগিল।

রমাবল্লভ মৃদু হাসিলেন—বিষণ্ণ অথচ জয়ের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তুমি এখনও ঠিক বুঝতে পার নি। আমার মধ্যে এ মুহূর্ত্তে 'মহত্বে'র কোন সম্বন্ধ নেই। এর বিনিময়ে আমার একটি মস্ত উপকার তোমায় করতে হবে।"

সত্য! প্রথম মুহূর্ত্তেই এতটা আনন্দ ও আশা করা তাহার উচিত হয় নাই। এখনও যে আসল কথাটাই শুনিতে বাকি রহিয়া গিয়াছে। জমিদার ত আর তাহাকে হাত গণিয়া তাহার প্রয়োজন বুঝিয়া বৃত্তি দিতে ডাকিয়া আনেন নাই। সে ঈষৎ মানসিক চাঞ্চল্য বোধ করিয়া কেবল মাত্র কহিল, "আদেশ করুন।"

"আমার পিতা আমার উপর রাগ করে এক উইল করে গিয়েছেন যে, পনের বৎসর বয়সের মধ্যে আমার কন্যা যদি আমাদের সমশ্রেণীর পাত্রে বিবাহিতা না হয়, তবে সেই বৎসরের শেষ দিনে আমার সমুদায় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি—দেব-সেবাধিকার পর্য্যন্ত যা কিছুই সবই—আমাদের একজন দূর-সম্পর্কীয় কুটুম্বে গিয়ে অর্শাবে। বাবা সেই ছেলেটিকে বড় ভালবাসতেন। একবার তাঁর ইচ্ছাও হয়েছিল যে এর

সঙ্গেই রাধারাণীর বিবাহ দেন; কিন্তু ছেলেটির চরিত্রগত দোষের কথা জেনে আমিই তাতে অমত করি। একেই শেষ পথ বলে ধরতে পারব, এমন স্থির করেই বোধ করি একে তিনি উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছেন; কিন্তু তাঁর সে চেষ্টাও এখন ব্যর্থ। সে এখন বিবাহিত, আমি দিলেও আর বিবাহ করতে সম্মত নয়। এখন আর কোনও উপায় নাই, কেবল এক—

অম্বর বিচিত্র উপাখ্যানের ন্যায় বিস্ময় কৌতূহলে এই কাহিনী শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে তাহার মনে কত ভাবের কত তরঙ্গই যে উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছিল তাহা কে বুঝিবে? ইহার মধ্যে সহানুভূতি ছিল, বিস্ময় ছিল; কিন্তু সব চেয়ে বেশী একটা সূক্ষ্ম বেদনা তাহার শান্ত চিত্তে সূচিকাবৎ বিঁধিতেছিল। শুধু যাহাকে সেই মন্দিরমধ্যে নিষ্ঠাবতী দেব-সেবিকারূপেই কল্পনা করিতে ভাল লাগে, রক্তমাংসের শরীরী মানবীর ন্যায় সাংসারিক সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাহারই আজ এ ঘনিষ্ঠ যোগ কেন? এ যেন মানায় না। সহসা বক্তা থামিয়া গেলে শ্রোতার হুঁস হইল। তখন সে সবিস্ময়ে তাঁহার দ্বিধাগ্রস্ত মুখের দিকে চাহিয়া নম্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি করতে পারি আমায় আদেশ করুন।"

"তুমি—তুমিই এক কথায় সব পার। আমাদের স্বঘর পাত্র কোথাও মেলে নি, সময় আর মোটে সাত দিন বাকি। এ অবস্থায় আমায় নিরাশ করো না—তুমি আমাদের পালটি ঘর, তুমি রাধারাণীকে বিবাহ কর।"

এ কথা যদি এ পৃথিবীতে অন্য কোন প্রাণী উচ্চারণ করিত, তবে অম্বর—এমন কি অম্বরের মত এমন ভালমানুষও হয় ত তাহার দিকে ঘুষি পাকাইয়া দুই পদ অগ্রসর না হইয়া থাকিতে পারিত না। কথাটা এমনই বিচিত্র! কিন্তু যে ব্যক্তি এই শব্দ কয়টা উচ্চারণ করিয়াছেন,

এমন মর্মান্তিক পরিহাস তাঁহার দ্বারা সম্ভবই নয়। তাই শ্রোতা তাড়িত-স্পৃষ্টের মত চমকিয়া শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুখে তাহার একটি কথাও ফুটিল না।

রমাবল্লভ তাহার মনের ভাব বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই সহসা বড়লোকের স্বভাবজাত তীব্র আত্মাভিমান সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনকে দুই হাতে নাড়া দিয়া উঠিল। ব্যাপারটা এমনই অসঙ্গত যে, কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করানো যায় না। আর ইহা তাঁহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে? ধিক্ এ ঐশ্বর্য্যে! কিন্তু এ সব কথা এখনকার নয়—যাহা লইয়া বুকের মধ্যে এই দুরন্ত মর্য্যাদাভিমান সিংহাসনাসীন ভূপতির গৌরবে বসিয়া আছে, সেই ভিত্তিমূলই যে আজ কম্পিত। তিনি কহিলেন, "বুঝ্‌লে অম্বর, তোমাকে এই কাজটি করতে হবে, না হলে আমার সব যায়।" কথাটা তিনি এমনভাবে বলিলেন, যেন তাহাকে একটা জিদের মকর্দ্দমার সাক্ষী মানিতেছেন—তাহার পক্ষে ইহা এমন কিছুই কঠিন নয়।

অম্বর তেমনি করিয়াই কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সে চোখ দুইটা নামাইয়া ধীর স্বরে উত্তর দিল, "আমায় ক্ষমা করুন—আমি পার্‌ব না।"

"পারবে না! কেন অম্বর?'

হতাশার এ বিলাপ স্বর নারীকণ্ঠেই শোভা পায়! অম্বর ইহাতে আহত হইল; কিন্তু সে কি বলিবে কিছু খুঁজিয়া পাইল না। তাই একবার ঘরটার চারিদিকে স্তম্ভিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজেও সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।—কেন? কেমন করিয়া সে বলিবে, কেন? কারণ ত একটা নয়, কত অশোভনতা, অসামঞ্জস্য যে এই 'কেন' প্রশ্নের কারণগুলাতে বর্ত্তমান, তাহা বুঝাইতে যাওয়ার মত হাস্যকর ব্যাপার আর কিছুই নাই।

অথচ কিছু না বলিলেও নয়! আবার সেই উদ্বেগ ব্যাকুল প্রশ্ন ফিরিয়া আসিল, "কেন অম্বর? কেন এ কথা বলছ?"

অম্বর যে যুক্তি দেখাইল, শত বিরুদ্ধ যুক্তির মধ্যে সেটার মত হালকা বোধ করি আর একটাও ছিল না! উহা ভিন্ন সে আর যে কোনটি দাখিল করিত, তাহার ওজন লইয়া জমিদার মহাশয়ের পাল্লা সমান করিতে কিছু সময় খরচ হইত। কিন্তু সে প্রধান বাধাগুলার সম্বন্ধে নিজের জিহ্বা খুলিতেই পারিল না; তাই ছোট দেখিয়াই একটা কারণ দর্শাইতে গেল, বলিল, "আমি যে কাজ নিয়েছি, তাতে এখন বিবাহ করলে কাযে বাধা পড়বে!"

বুভুক্ষিত ভারবাহী সদ্য-প্রাপ্ত প্রকাণ্ড মোটটা মাথায় তুলিতে গিয়া যদি দেখে,সেটা মোটে ভারি নয়—একমোট তুলামাত্র—তাহা হইলে যেমন খুসী হয়, অম্বরের কথায় রমাবল্লভের মনের উপরকার মস্ত বড় বোঝা তেমনই হঠাৎ তুলার মত হাল্কা হইয়া গেল। একটা বড় রকম বিশ্বাস লইয়া তিনি কহিলেন, "এতে আর বাধা কি? বরং তুমি আমাদের কাছে ও-বিষয়-টায় অনেক সাহায্যও ত পেতে পারবে। তা ছাড়া আমার মেয়ে—"

রমাবল্লভ যে কথাটা বলিতে যাইতেছিলেন, মধ্যপথে আপনিই সে কথাটাকে উবিয়া যাইতে দিয়া ফিরাইয়া কহিলেন, "আমার মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার সাহায্য করবার লোকজনের অভাব থাকবে না। বাৎসারিক বার হাজার টাকা আমি তোমায় স্বেচ্ছাস্বরূপ দানের জন্য দেব। তা ছাড়া তোমার নিজ খরচ স্বতন্ত্র। একটি কেন, পাঁচ-সাতটি চতুষ্পাঠী তুমি ইচ্ছা করলে ঐ টাকার সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।"

অম্বর নীরব রহিল। তাহার অনিচ্ছা সঙ্কুচিত চিত্তে ধীরে ধীরে একটা আশার তুলিকা বড় উজ্জ্বল বর্ণ চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে কিছুক্ষণ সেই আশার লিখন প্রত্যক্ষ করিল। তাহার মুখে চোখে সেই

স্বপ্ন্ ফুটিয়া উঠিতেও আরম্ভ করিয়াছিল, এমন সময় তদপেক্ষাও একটা উজ্জ্বল শুভ্র ছবি তাহার মানস-দর্পণে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার আশা-প্রদীপ্ত মুখখানাকে একেবারে বিরস পাণ্ডুবর্ণ করিয়া দিল। সে অতি ধীরে প্রভুর মুখের দিকে ম্লান নেত্র স্থাপন করিয়া কহিল, "আমায় প্রলুব্ধ করবেন না, এ আমার অসাধ্য! আরও অনেক বাধা আছে, সে সব কথা আমি আপনার কাছে বলতেও পারব না।"

বার বার প্রত্যাখ্যান! একটা ক্ষুদ্র পুরোহিত তাঁহার এ প্রস্তাবে আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে, তেমনি ভাবিয়া কোথায় আনন্দে নাচিয়া উঠিবে—তাহা না করিয়া সে মহামহিমান্বিত রাজার মত তাঁহার প্রস্তাব পুনঃপুনঃ ঠেলিয়া ফেলিতে চায়! অপমানে রমাবল্লভের আকর্ণ ললাট শোণিত-বর্ণ ধারণ করিল। তীব্র রোষ একটা কঠিন বাক্যকে ঠেলিয়া কণ্ঠে পাঠাইতেছিল; কিন্তু নিজের অবস্থার ত্বরিত স্মৃতি সেটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া ভিতরে পাঠাইয়া শান্ত সংযতভাবে বাহির হইয়া আসিল। তিনি কহিলেন, অবিচার করো না অম্বর! প্রলোভন কেন বলছ? আমার জামায়ের সম্মানরূপেও ত এটাকে ধরতে পার। না হয় সৎকর্ম্মে আমার দানই মনে ভাব।"

অম্বর নিজের মনে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করিল, 'দান' যে ইহা নয়, এ তর্ক তোলা তাহার পক্ষে সম্ভবই নহে। সে অগত্যা হতাশভাবে উত্তর দিল, "আমি গুরুদেবের এই কার্য্যভার লওয়ার সময় তাঁকে স্মরণ করে মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, যতদিন না তাঁর ঈপ্সিত কার্য্যে সফলতা দেখা যাবে, সে স্থান আমি কিছুতেই ত্যাগ করব না। কিন্তু সে স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। সামান্য দিনের জন্যও সেখানে কেউ পরিবার সঙ্গে রাখতে সাহস করে না। অথচ আমাকে হয় ত বহুকাল্ ধরেই সেখানে থাকতে হবে।

রমাবল্লভের মুখের উপর আবার একটা শোণিতোচ্ছ্বাস ঢেউ খেলিয়া গেল, নেত্র-তারকায় দীপ্তি চূর্ণ গর্ব্বের ক্ষুব্ধরোষে অনলকণা ছড়াইয়া দিল। মনের সে ভাবটা চাপিতে ঠোঁটের উপর দশন চাপিয়া অনেকক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইল। কি স্পর্দ্ধা! জমিদার রমাবল্লভের কন্যা তাহার দরিদ্র স্বামীর সহিত সেই অস্বাস্থ্যকর আসামের পর্ণকুটীরে গিয়া বাস করিবে? এই অগাধ সুখ সৌভাগ্য ছাড়িয়া তাহার সহিত সে সেই দূর প্রবাসে যাইবে? এ পাগল না কি?

তখন বাহিরে আকাশ পৃথিবী তপনের সহিত সন্ধির শান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। গাছগুলা অতি স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস লইতেছে, তাহাদের উপর হইতে সমস্ত সূর্য্যকিরণ ঝরিয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর বুকের শান্তিতে চরাচরের তপ্ত নিঃশ্বাস শীতল হইয়া গিয়াছিল। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া রমাবল্লভের বুকের তাপও যেন ঈষৎ জুড়াইয়া আসিল। তাহা ছাড়া উত্তরে বাতাস যখন জোরে বহিতে থাকে, তখন উত্তাপ সহজেই নিজের স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া ভয়াবহ পরধর্ম্মে আপনাকে বিলাইয়া দিতে বাধ্য হয়।

রমাবল্লভ বিরক্তিপ্রচ্ছন্ন হাস্যের সহিত ফিরিয়া জবাব দিলেন, "না হয় ততদিন আমার কাছেই থাকবে, তাতে আর এমন ক্ষতি কি? একটা কথা শুধু শুন্‌তে চাই। রাধারাণী এক সময় তোমার কাজের ভুল ধরে তোমার কিছু ক্ষতির কারণ হয়েছিল; তার জন্য তার প্রতি তোমার বিরক্তি স্বাভাবিক। কিন্তু যদি এ বিবাহ হয়—যদি কি, এ বিবাহ তোমায় করতেই হবে, তা ভিন্ন ত উপায় নাই, অবশ্য তা তুমি বুঝতেই পারছ? না হলে তোমায় আমি লজ্জার খাতিরেও অন্ততঃ আবার ফিরে ডাকতাম না।—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তুমি সে সব ভুলে যাবে ত?"

এই প্রশ্নটা অম্বরের বুকে বজ্র-বলে গিয়া বিঁধিল। সে আঘাতে এক

মুহূর্ত্তে তাহার শোণিত-সঞ্চয়-স্থান সবেগে আলোড়িত হওয়ায় পাণ্ডুমুখ ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল। সে মাথা তুলিয়া বলিল, "তাই বলছিলাম—কাজ নাই। আমার সম্বন্ধে আপনাদের যখন এ রকম ধারণা—"

"তা থাক—তুমি বল্‌লেই সেটা যাবে! আমি তোমায় একেবারেই যে না চিনি তাও নয়—তোমার কথার দর আছে, এটা আমি খুবই বিশ্বাস করি। শোন অম্বর, আমার যা বলবার ছিল, তা বলা হয়েছে। এখন তোমার ইচ্ছা না হয় তুমি বিবাহ করো না। সাত দিন মাত্র সময় আছে, তারপর আমরা পথের ভিখারী হব। তোমার সাহায্য তখন আমার দ্বারা হওয়া সম্ভবই নয়। আর তোমাতেও তখন আমার কোন প্রয়োজন থাকবে না। যা কিছু এই সাত দিনেরই ভিতর।"

এই বলিয়া রমাবল্লভ গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচনপূর্ব্বক নীরব হইলেন। এই কথাগুলা একান্ত মর্ম্মস্পর্শী। অম্বরের স্বভাবকোমল বক্ষে তাহা বাজিতেছিল। আবার সেই সঙ্গে একটা চিরপূর্ণ স্থানের শূন্য দৃশ্য তাহার মানসদৃষ্টিতে খোঁচা দিতে লাগিল। সে তখন নত দৃষ্টি উন্নমিত করিল, আবার সম্মুখস্থ প্রৌঢ়ের হতাশাঙ্কিত মুখের উপরকার নৈরাশ্য-রেখাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিল; তারপর দৃষ্টি আবার অবনত করিয়া সে কহিল, "আমায় ভাববার একটু সময় দিন।"

"বেশ, তা হলে কাল সকালেই উত্তর দিও—কিন্তু এখানে আর একটি কথাও আছে। বিবাহের পর আমার কন্যা অবশ্য আমার গৃহেই থাকবে, কিন্তু তার ইচ্ছা—আর তুমিও ত বিবাহে তেমন ইচ্ছুক নও—কেবল মাত্র আমাদের উপকারের জন্যই ত বিবাহ করছ, সে জন্য এতে তোমারও অসম্মতির কারণ না থাকাই সম্ভব যে—বিবাহের পর উভয়ে স্বতন্ত্র বাস কর। যেখানে বলবে, তোমায় আমি সেইখানেই বাড়ী করে দেব, খরচ-পত্র সব ত দেবই, কিন্তু আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার

বিবাহের পর থেকে আর কোন সম্বন্ধ থাকবে না। এতে কি তুমি স্বীকৃত আছ?”

অম্বরের ললাটের গুপ্ত শিরা ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুখ তুলিয়া সহজ স্বরেই উত্তর দিল, “না।”

“না! কেন? তুমি ত বিবাহে ইচ্ছুক নও।” বলিয়াই রমাবল্লভ সহসা চুপ করিলেন।

“বিবাহে আমার ইচ্ছা নাই সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু যদি তা করতেই হয়, শাস্ত্রশাসন ত্যাগ করতে পারব না। বিবাহ-মন্ত্র আমায় অগ্নি-দেবতা-ব্রাহ্মণ-সাক্ষাতে কোন্ প্রতিজ্ঞা পাঠ করাবে? ইহ এবং পরজীবনের জন্য আমায় যে পবিত্র বন্ধন স্বীকার করতে হবে—যার সমস্ত সুখ দুঃখের সঙ্গে এক হ'লাম বলে অঙ্গীকৃত হ'তে হবে, বিবাহের সে সমুদায় উদ্দেশ্য পালন করব না মনে রেখে, মুখে আমি সেই সব পবিত্র দেবমন্ত্র উচ্চারণ করব! পিতৃতুল্য আপনি—অন্নদাতা পিতা—আপনি আমায় এ আদেশ করবেন না—এত বড় মিথ্যাচরণ করতে পারব না। আমায় আপনি ক্ষমা করুন।”

তখন উদ্যান সীমার শেষে উচ্চশির দেবদারুর মাথায় অস্তগত সূর্য্যের যে ক্ষীণ রক্তচ্ছটাটুকু অন্তিম নিদ্রায় ঘুমাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তাহারই একটুখানি আলো অম্বরের ললাটে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার শান্ত অথচ দৃঢ় মুখের দিকে চাহিয়া রমাবল্লভের আর একদিনকার কথা মনে পড়িল—যেদিন সে 'গুরুর আদেশ' বলিয়া তাঁহার আসন গ্রহণ করিয়াছিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলে তিনি অপ্রকৃতিস্থভাবে উঠিয়া বহুক্ষণ গৃহমধ্যেই পায়চারি করিয়া বেড়াইলেন। তারপর সহসা গঠিত মূর্ত্তিবৎ স্তব্ধ অম্বরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধের উপর করতল রক্ষা করিয়া বলিলেন, “অম্বর! তুমি যা বলচ, সব সত্য। কিন্তু এর সঙ্গে

এইটুকু মনে কর যে, আমি বিপন্ন। তোমার কাছে আজ আমি সাহায্য-প্রার্থী। তোমার মন উচ্চ। পরের জন্ম নিজেকে আজ বাদ দিতে পারবে না কি? দেখ স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য-পালন যদি বল, এর চেয়ে আর কোন্ রকমে বেশী কে পারে? তার এই বিষয়-সম্পত্তি—পিতামাতার মান-সম্ভ্রম রক্ষা, এ সবই ত তুমিই তাকে দেবে। এতে কি তোমার ধর্ম্ম থাকবে না?"

অম্বর কথা কহিল না, নড়িল না; বহুক্ষণ তাঁহার ব্যাকুল দৃষ্টির তলে ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে তখন যে কি মিশ্র ভাবের তরঙ্গ বহিতেছিল, তাহা বলিবার নয়। তারপর সে তাঁহার দিকে না চাহিয়াই সহসা সন্দেহ-বেদনা-ভয়বিজড়িত কণ্ঠে বিহ্বলের মত কহিয়া ফেলিল, "আমায় আজ রাত্রিটা ভাবতে দিন।"

রমাবল্লভ কথা কহিলেন না। সে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

রমাবল্লভ দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখেই সন্ধ্যার নির্ম্মল আকাশে গোধূলির স্বর্ণরশ্মিরেণু চারিদিকে ছড়ান—বাতাস মৃদু, শান্ত। দ্বারের উপর উজ্জ্বল ফ্রেমে বাঁধান হরিবল্লভের বৃহৎ তৈলচিত্র। রমাবল্লভ সেই চিত্রের জয়োৎফুল্ল নেত্রের উপর নিজের খর্ব্ব হৃদয়ের বিষাদ-জ্বালাপূর্ণ দুই নেত্র সংস্থাপিত করিলেন। সে নেত্র যেন তাঁহাকে তিরস্কার-পূর্ণ উপহাস করিয়া বলিল, 'রমাবল্লভ! দেখ, আমিই জিতিলাম! বড় যে তখন তেজ দেখাইয়াছিলে। সে তেজ কই রাখিতে পারিলে না?'

রমাবল্লভ সহসা সেইখানে ভূমে বসিয়া পড়িলেন। চিত্রের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার হৃদয় মন যেন এক গভীর অবসাদপূর্ণ বিষাদে ডুবিয়া আসিল। চিত্রমূর্ত্তি যেন সজীব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন মৃদু বিলাপপূর্ণস্বরে তিনি কহিলেন, "বাবা! এম্‌নি করেই কি তোমার

রাধারাণীকে সুখী করবে ভেবেছিলে? আজ যদি জান্‌তে, আমাদের মনে কত যন্ত্রণা! কি অপমান আজ সইতে হচ্চে! কার কাছে মাথা নীচু করচি যদি একবার দেখতে পেতে—"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাবধূ ধূসর কৌষেয় বসনের প্রান্তটি মাথায় টানিয়া আকাশ পথে তাহার প্রদীপ জ্বালাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় বাণী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। আরতির বিলম্ব আছে, মন্দির জনশূন্য; উর্দ্ধে স্বর্ণমণ্ডিত স্ফটিক-ঝাড়ে বাতির স্নিগ্ধ আলো জ্বলিতেছে—সেই আলোক ও প্রতিমার পার্শ্বস্থ সুবৃহৎ মনুষ্যাকৃতির সুবর্ণাধারের আলোয় গৃহ দিনের মতই আলোকিত। সে বিগ্রহের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া ম্লান নেত্র-তারকাদ্বয় উন্নমিত করিয়া উর্দ্ধমুখে সেই চিরহাস্যাধার প্রসন্ন-মুখকান্তি দেবতার পানে চাহিতেই তাহার আবর্ত্তময় হৃদয়ের ফেনিলতরঙ্গ সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া দুই জ্বালাপূর্ণ নেত্র দিয়া তপ্ত অশ্রুর আকারে ছুটিয়া আসিতে চাহিল।

সে ত কিছুই চাহে নাই। তাঁহার পাশের ঐ ধূপটুকুর মতই নিজের সমস্ত যে সে ঐ দেব চরণে উৎসর্গ করিয়াছে। নিজের সুখ শুধু নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দেওয়াতেই। তবে কেন সে সুখেও সে বঞ্চিতা হইবে। কেন এ সার্থকতাটুকুও তাহার মিলিল না? হে প্রভু! কি পাপে তাহাকে এত বড় দণ্ড দিলে? যন্ত্রণাপূর্ণ তীব্র অভিমানে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। আমি তোমার কাছে জানিয়া ত কোন দিন কোন অপরাধ করি নাই। তবে বলিয়া দাও, কোন্ অজ্ঞাত পাপের জন্য আমার তোমার দাসীত্ব

হইতে বঞ্চিত করিয়া মনুষ্য-কীটের সেবায় নিযুক্ত করিতেছ? জান না কি আমি তোমারই—শুধু তোমার, আর কাহারও হইতে পারিব না?

দেবতা হাসিলেন। বর্ত্তিকালোকে সে স্নিগ্ধ হাস্যচ্ছটা শত চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণদ্যুতি প্রকাশ করিল। মহাপ্রকৃতি রাধা স্মিতমুখে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'পাপিষ্ঠা! প্রকৃতি স্বয়ং পুরুষের দাসী, তুই এমনই কি যে, ঠাকুরাণী হইয়া থাকিবি—দাসী হইবি না? গুমর ছাড়িয়া সবাই যাহা করিতেছে, তাহাই করিতে যা।'

তখন অশ্রুপরিপ্লুত নেত্রে যুক্তপাণি বাণী দেবতার উদ্দেশে কহিল, "তুমি কি শুনিতেছ, আমি অন্য কাহাকেও স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না? তুমি যদি আমার পণ না রাখ, আমি নিজেই রাখিব। যদি বিবাহ করিতেই হয়, করিব। কিন্তু এ দেহ প্রাণ যখন তোমায় দিয়াছি, তখন এ কেবল তোমারি থাকিবে। এগুলা বাদ দিয়া যদি কেহ শুধু স্বামী নামটা লইতে রাজী থাকে, তবেই তাহা দিতে পারিব; নতুবা আমার ভাগ্যে পথে দাঁড়ান ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই।"

দেবতার মধুর অধরে আবার অমৃতময় হাস্য আলোকের লীলারূপে বহিয়া গেল। সে হাসি আশ্বাসের কি অবিশ্বাসের তাহা কিছু বুঝা গেল না।

এমন সময় দ্বারের সুবর্ণ শৃঙ্খল ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। যেন একান্ত সঙ্কোচ-পীড়িত হস্তে অতি ধীরে ধীরে কে তাহা স্পর্শ করিয়া দ্বার খুলিবে কি না ভাবিতেছে। ঐ যে নিঃশব্দে দ্বারও খুলিয়া গিয়াছে না? ঐ না কে একজন ভিতরে আসিতেছে? ও অম্বুনাথ নয় ত? সর্ব্বনাশ! বাণীর চোখে জল না? এ দৃশ্য এ জগতে কেহ না দেখিয়া ফেলে। সে ত্রস্তে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, মুহূর্ত্তে শুভ্র শুক্তি হইতে স্থূল মুক্তাগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল।—সে দেখে নাই ত?

বাণী মুখ ফিরাইয়া দেখিল, যে প্রবেশোদ্যত হইয়াছিল, সে বোধ করি আশুনাথ নয়; কারণ প্রবেশ না করিয়াই সে চলিয়া যাইতেছে। আশুনাথ হইলে অতটা শান্তভাবে আসিত না এবং চলিয়াই বা যাইবে কেন? তবে কি আগন্তুক তাহার আত্মবিহ্বল অবস্থা দেখিতে পাইয়াছে? তাই তাহার এ শোকোচ্ছ্বাসে বাধা দিবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল? লোকগুলা মনে করে কি? সে কি সকলের করুণার্হ? স্থির হইয়া বসিয়া সে ডাকিয়া বলিল, "ফিরছ কেন? ঠাকুর প্রণাম করতে এসে থাক ত প্রণাম করেই যাও না।" স্বরে পূর্ণ বিরক্তি প্রকাশ পাইল। কিন্তু এ আমন্ত্রণে যে ফিরিতেছিল, সে আর ফিরিল না, সেইখানেই স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া যেন একটু ইতস্ততঃ করিল, তারপর ধীরভাবে সে ফিরিয়া আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। তখন বাণী চিনিল—সে অম্বর।

অদৃষ্টের এত বড় নিষ্ঠুর খেলা আর কখনও কেহ কল্পনা করে নাই। গল্পে পড়া যায়—কাল যে ভিখারী ছিল, আজ পাটহস্তীর কল্যাণে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা সে, দেশের সে রাজা। তবে জগতে ঠিক এমনটা ঘটিতে কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু বাণীর অদৃষ্টে তাহাই হইয়াছিল। এই মন্দির হইতে সাত মাস পূর্ব্বে যাহাকে তিরস্কার দিয়া বিদায় দিয়াছিল, আজ এই কয়েকটা দিনের চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তের সঙ্গে তাহারই নিজের অবস্থা কি অভাবনীয়রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! কাল যে প্রভু ছিল, আজ সে প্রভু ত নাই-ই, উপরন্তু সে-ই আজ সেই লাঞ্ছিতের কৃপা-ভিখারিণী। অহল্যার মত যদি এই মুহূর্ত্তে পাষাণে পরিণত হইতে পারিত, তবেই বুঝি তাহার একটুখানি শান্তি মিলিত।

কিন্তু এ পরিতাপ এখন একেবারেই বৃথা। নির্ম্মম ভাগ্যের পরিহাস এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর-হৃদয় দাদামশায়ের অলঙ্ঘ্য বিধান তাহাকে আজ

করিতেই হইবে। কেন না, এ মন্দির মরণের পূর্ব্বে ত সে ত্যাগ করিতে পারিবে না। তবে এ কথাটা কিন্তু তেমনি সত্য—তাহার এ শরীরটাও সে অন্যের নিকট বেচিতে পারিবে না।

একটু বিপন্নভাবে থমকিয়া থাকিয়া অম্বরনাথ দেব প্রণাম করিল; তারপর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া পিছন ফিরিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা কথা শুনিয়া নিজের কান দুটাকে সে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না বটে, তথাপি আর পা উঠিল না। সে শুনিল, "দাঁড়াও, একটা কথা আছে।"

ধবক্ করিয়া তাহার বুকের মধ্যে তাড়িতের একটা ঘা পড়িল—বেগবতী নদীর জল অকস্মাৎ স্রোত বন্ধ হইয়া গেলে যেমন নিথর হইয়া পড়ে, অম্বরও সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। মুখ তুলিল না, ভাল করিয়া ফিরিতেও পারিল না—সঙ্কোচে সে যেন মরিয়া যাইতেছিল। বাণীরও চোখ মুখ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল—তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত সর্ব্বাঙ্গে টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া বেড়াইতেছিল। কোনমতে না বলিয়া ফেলিলে আর বলা হইবে না, অথচ না বলিলেও তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিতে যেটুকু বাকী থাকিতে পারে, তাহাও আর থাকিবে না। তাই সে সমস্ত ক্রোধ ক্ষোভ একসঙ্গে মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, "বাবার সঙ্গে বোধ করি দেখা হয়েছে?"

অম্বর মাথা হেলাইয়া জানাইল, "হাঁ।"

আবার ধিক্কারের সহিত তীব্র জ্বালা হৃদয়ের মধ্যে সবেগে উথলিয়া উঠিতে চাহে।—"তাঁকে উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে?"

অম্বর যেন অপরাধীর মত এতটুকু হইয়া গেল; সে বলিল, "কাল দেব বলেছি।"

বাণীর মুখ অকস্মাৎ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। 'কাল দিবে'

বলিয়াছে?—কাল! কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তাহার পক্ষে ভাবিবার বুঝিবার কিছু আছে না কি? সে কি ইহাতেই কৃতার্থ হইয়া যায় নাই?

অম্বর যেমন পূর্ব্বে ছিল, সেইরূপই দাঁড়াইয়া রহিল; চলিয়া যাইবে, কি আরও কিছু শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিবে, তাহা সে ঠিক মত বুঝিতে পারিতেছিল না।

বাণী আপনার বিরক্তি দমন করিয়া লইল; তাহার মনে পড়িল, এখনই আদ্যনাথ আসিয়া পড়িবে। একে ত এ বিবাহের কথায় দেশে—বিশেষ করিয়া আবার আদ্যনাথের দলে, কেমন ঢেউ উঠিয়াছে তাহা বলিবারই নয়। তাহার উপর এই অবস্থায় তাহার চোখে পড়া—সে কোনমতেই তাহা সহিতে পারিবে না। তাই একটু ব্যস্ত হইয়া বাণী বলিল, "আমার একটা কথা ছিল—" একটু থামিয়া পরে আবার বলিল, "এই সময়ই সেটা বলা ভাল, যদি—বাবা যা বলেছেন, তাই করতে হয় তবে বিবাহের দিন থেকেই আমি স্বতন্ত্র থাক্‌তে ইচ্ছা করি। সেই দিন ছাড়া এ জন্মে আর দুজনের মধ্যে দেখাশোনা হবে না, দুজনের কেউ কারও খোঁজ খবর নেবে না—এই আমার ইচ্ছা।"

সেই বাতির আলোকে অকস্মাৎ অম্বরের মুখখানা পাংশু হইয়া গেল। এত বড় নিষ্ঠুর সর্ত্তে কেহ কি কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে? সে জোর করিয়া সেই সুগন্ধভারাকুল মন্দির-বায়ু হইতে একটা উর্দ্ধশ্বাস গ্রহণ করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "আচ্ছা।"

শুনিয়া বাণী একটু প্রীতা হইল; বলিল, "প্রতিজ্ঞা কর—এই মন্দিরের মধ্যে শপথ কর—বিবাহের দিন হতে—" সহসা সম্মুখে বজ্রপতন হইলে মানব যেরূপ স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, অম্বরনাথের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বাণীর কথার ভাবার্থ বুঝিয়া সে তন্মুহূর্ত্তেই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিয়া উঠিল, "না—সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান শেষ হবার পর থেকে—"

বাণীর উজ্জল চক্ষে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। সেদিনের সেই মূক লাঞ্ছিত—আজ সে তাহার কথায় দৃঢ় প্রতিবাদ করিতে আইসে! সে কি এখন হইতেই তাহার প্রভু হইয়া বসিল নাকি? ভাগ্যে মৃণ্ডদা সেই কথাটা বলিয়াছিল; তাই সে আত্মরক্ষার উপায়টুকু মনে হইল; নহিলে একেবারেই সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছিল আর কি!

কুন্দ-দন্তে গোলাপী অধর চাপিয়া কোনমতে সে বলিল, "তাই হবে। বিবাহের পর থেকে দুজনের মধ্যে কোন সম্বন্ধই থাকবে না।"

অম্বর কহিল, "শপথ করলাম।"

সে রাত্রে কৃষ্ণপ্রিয়া আহার কালে কন্যাকে না দেখিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার নির্ব্বাপিতালোক রুদ্ধ কক্ষের দ্বারে গিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে উত্তর আসিল, "আমি খাব না।" এ ব্যাপার আজকাল নিত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "রোজ রোজ খাবি নি কেন? হয়েছে কি?"

হইয়াছে কি? ইহার চেয়ে আবার কাহার কি বেশী হইতে পারে? বাণী মনের মধ্যে গুমরিয়া রহিল, সাড়া দিল না।

উত্তর না পাইয়া কৃষ্ণপ্রিয়া পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন, "উঠে আয়, রাধারাণি—অনর্থক আর আমায় জ্বালাস্ নে।" বাণী তথাপি উঠিল না, ক্রন্দনের তীব্রস্বরে মায়ের উপর মনের সমস্ত ঝাল ঝাড়িয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আমি তোমাদের আপদ্ হয়েছি। আমি ম'লে তোমরা বাঁচ, আমিও বাঁচি। এত লোক মরে, আমারই শুধু মরণ নেই।"

"ষাট্, ষাট্।" বলিয়া ক্ষুব্ধা জননী মা-ষষ্ঠীকে স্মরণ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ঘরের জানালা খোলা। নিকটে দীপ জ্বলিতেছে। সম্মুখে একখানা পুস্তকের পাতা খুলিয়া রাখিয়া জমিদারের ভূতপূর্ব্ব পুরোহিত গভীর চিন্তা-মগ্ন। ইতঃমধ্যেই চারিদিকে গুজবটা রটিয়া গিয়াছিল। জমিদার নিজে নায়েব হলধর চক্রবর্ত্তীকে অম্বরের আদর-আপ্যায়নের ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—যেন কোন বিষয়ে ত্রুটি না হয়। মৃগাঙ্কমোহন নায়েবখানায় আসিয়া চুপি চুপি কি কথা বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। খিড়কির দ্বারের দিকে দুইজনকে যাইতে দেখা গিয়াছিল। সেই সময় পরাণে চাকরটা অন্দরমহলে বাতি জ্বালাইয়া ফিরিতেছিল। সে দেখিয়াছে রান্নাবাড়ীর একটা পড়ো ঘরের দ্বারের নিকট অশ্রু মুছিতে মুছিতে বাড়ীর গৃহিণী সেই মুখচোরা পুরুৎঠাকুরের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কথার স্বরে ও ভাবে বোধ হইল, ঠাকুরমশায় ব্রতের দক্ষিণায় পাঁচ সিকা দাবী করিয়া যুক্তি দেখাইতেছেন না—এ ক্ষেত্রে গৃহিণীই যেন তাঁহার কাছে কিছু প্রার্থনা করিতেছেন। ঘরের দাসীদের মধ্যেও কেহ কেহ এ দৃশ্য দেখিয়াছিল। বেশীর ভাগ তাহারা শুনিয়াছে যে, গৃহিণী বলিতেছেন, "বাবা, তোমা ভিন্ন আমাদের আর অন্য গতি নাই—পাগলি মেয়ে বাণীর কথা কিছু মনে রেখ না বাবা! সে তোমার সঙ্গে অনেক অসঙ্গত ব্যবহার করেছে—তা সে কথা নিজগুণে ভুলে এ বিপত্তি হতে আমাদের রক্ষা করে যথার্থ ব্রাহ্মণের ছেলের কাজ কর!" অম্বরনাথের সে সময়কার অবস্থা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইত যে, ঐ সকল কথার অধিকাংশই তাহার কর্ণে পৌঁছায় নাই! কিয়ৎক্ষণ তেমনি অস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সে-কথার উত্তর না দিয়া কৃষ্ণপ্রিয়াকে প্রণাম করিয়া সে চলিয়া আসে।

অম্বরনাথ যখন একাই নায়েবখানায় ফিরিয়া আসিল, তখন মুহুরী সরকার খানসামা ও অবশ্য-প্রতিপাল্য বেকার কুটুম্বগণ মিলিয়া সেখানে বড় রকম একটা সভা ফাঁদিয়া বসিয়াছিল। ইউরোপের নিহিলিষ্ট সভার স্থায় এ সভার কার্য্যও ইসারা ইঙ্গিতে, ফিস্‌ফাস্‌ ও মুচকি হাসি দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া ইসারা ইঙ্গিত প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল এবং সকলের মুখে মুখে বিদ্যুৎ-রেখার স্থায় একটা সকৌতুক তীক্ষ্ণ হাস্ত ফুটিয়া উঠিল। সেই মলিন বস্ত্র ও মলিন উত্তরীয়ে অর্দ্ধাচ্ছাদিত অঙ্গে বোধ করি অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়া থাকিবে? নাহিলে চির-পরিচিতগণ অতখানি বিস্ময় কৌতূহলে তাহার পানে অমন করিয়া চাহিয়া দেখিবেই বা কেন? তা সংসারে সকল জিনিসের রূপই অমন একটু পরিবর্ত্তিত হয়। মৃত্তিকা যখন ঘটরূপে পরিণত তখন তাহার প্রয়োজনীয়তা বর্দ্ধিত হয় এবং ঘটরূপ মৃত্তিকারূপের চেয়ে দেখিতে অনেক সুন্দর দেখায় —আবার যখন সেই ঘট দেবোদ্দেশ্তে ব্যবহৃত হয়, তখন ভক্তের নিকট তাহার সৌন্দর্য্যের আর তুলনা নাই। গরীব পুরোহিত অম্বরনাথ ও রমাবল্লভের জামাতৃরূপে মনোনীত হইয়া দর হিসাবে যেন তেমনি অধিকতর সুন্দর হইয়াছে।

অম্বর কিন্তু চারিদিককার এই সহজ চাঞ্চল্য উত্তেজনা লক্ষ্য করে নাই। আজ পরাহ্ণ হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত তাহার জীবনে যে সকল অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিতেছিল, তাহার অভিনবত্বে সে এককালে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছে। প্রথমবার রাজনগরে প্রবেশ হইতে আজিকার এই অতীতপ্রায় সায়াহ্নমুহূর্ত্ত অবধি সমস্তই তাহার যেন কেমন একটা হেঁয়ালি বলিয়া বোধ হইতেছিল। সে ভাবিতে লাগিল, সে অনাথ দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। জ্ঞাতির দয়ায় কোনমতে প্রতিপালিত। আপনার চেষ্টায় কাশীধামে এক দয়ালু পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেছিল—এমন

সময় সেই পণ্ডিতের মৃত্যু ঘটে। পণ্ডিত বেদান্ত সিদ্ধান্তে পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তিনি বেদান্তবিদ্ হইবার দুর্লভ সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই —কয়জনই বা এ সংসারে তা পারেন? তাই সাধারণ শ্রেণীর লোকের ন্যায় তাঁহারও গোঁড়ামির অভাব ছিল না। দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে তর্কস্থলে অনেক সময় প্রমাণ স্বরূপ লাঠিপ্রয়োগ করিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন না। অম্বর বুঝিল, তখনও তাহার নিজের শিক্ষা উপযুক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাই দেশে ফিরিবার পর জ্ঞাতিভ্রাতা গঙ্গারামের পরিচয় পত্রের বলে রাজনগরে ন্যায় পড়িতে আসিয়াছিল। কারণ ন্যায় সাংখ্যই বেদান্তের সোপান।

আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র থাকিলেও যদি তাহার নীচে মেঘের স্তর জমাট বাঁধিয়া থাকে, তবে উপরের আলো সেই অস্বচ্ছ আবরণ ভেদ করিয়া নীচে নামিতে পারে না। মর্ত্ত্যে বসিয়া মর্ত্ত্যবাসীরা কেবল বাহিরের কালো মেঘটাকেই দেখিতে পায়। অম্বরের মধ্যে পাণ্ডিত্য ছিল, বেদান্ত-শাস্ত্রও তাহার শিক্ষাগুরুর চেয়ে অর্থবোধ করিয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া তাহার চিত্তে "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ" এই বৈদান্তিক ভাবটি —পূর্ণমাত্রায় না হউক, কিঞ্চিন্মাত্রায়ও বর্ত্তমান থাকায় স্বভাবতঃই সে কতকটা বৈদান্তিক। কিন্তু গুরুর কাছে শুনিয়া শুনিয়া দেবমূর্ত্তি আরাধনার বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্বেষের ভাবটি যে সে কতক পায় নাই, এ কথা নিশ্চিন্তরূপে বলা যায় না। কাজেই এইখানে সে প্রকৃত বৈদান্তিক হইতে পারে নাই। তবে এ কথাটা সে বুঝিত, নিত্য-ক্রিয়াকলাপ যে যাহাই করুক না কেন, সবই সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এ সত্য সে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিত বলিয়া জগতের সকল দ্রব্য সকল প্রাণীই তাহার প্রিয় ছিল। কিন্তু সকলে তাহার এই উদার প্রাণটার ঠিক পরিচয় পাইত না। বাহিরের দীন

নম্রতা তাহার এই অন্তরের আলোককে মেঘের মত ঢাকিয়া রাখিয়াছে বলিয়া লোকে তাহার হৃদয়ের আভ্যন্তরিক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় নাই—এই নগণ্য দরিদ্র মূর্ত্তিকে. সঙ্কুচিত স্বভাবের জন্য চিরদিন উপবাস অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে নিরীহ স্বভাব লইয়া একপাশে যে দাঁড়াইয়া থাকে, উচ্চ-নীচ কোন জীব-জগতেই তাহার সুখ সম্প্রাপ্তি ঘটে না।

তা হউক, তাহাতে ত সে কোন দিনই কাতর ছিল না। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর মা-ই যাহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন, আজন্ম অভ্যস্ত অবহেলাটাই সকল অবস্থার চেয়ে তাহার নিকট অধিকতর পরিচিত। ছোটবেলায় পাঁচজনের ফরমাস খাটিয়া তামাকু সাজিয়া, ছেলে কোলে করিয়াই তাহার কাটিয়াছে; তারপর গুরুগৃহে গুরুর অপরাপর শিষ্য ও সতীর্থবর্গের সেবা করিয়া সে পাইয়াছে শ্লেষ বিদ্বেষ ও অবহেলা। তারপর পৌরোহিত্যে পাইয়াছে বাণীর ভর্ৎসনা ও লোকের অবমাননা—এ অবস্থায় এই যে আদর আপ্যায়ন, এইটাই তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন পাওয়া। ইহারই সহিত জীবনে কখনও তাহার পরিচয় ঘটে নাই। তাই করলগ্ন কপোলে বহুক্ষণ সঘন ঝিল্লিমন্ত্রিত কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার মাখা বাহিরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল।

বায়ুহীন গুমোটে গাছপালা স্তব্ধ। উঁচু নীচু গাছের মাথাগুলা যেন একটা সুবিস্তৃত কষ্টিপাথরের পাহাড়ের মত দেখাইতেছে। জগতে একটি প্রাণী কোথাও জাগিয়া আছে এমন এতটুকু আভাসও পাওয়া যায় না। সে ভাবিতে লাগিল, জীবনে আজ এ কি সমস্যারূপে দেখা দিলে নাথ? ভগবানের নিকট কাতরকণ্ঠে সে প্রার্থনা করিল, 'প্রভো! হৃদয়ে বল দাও—তোমার কৃপায় যেন কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট না হই। বলিয়া দাও দেব, এ সঙ্কটে আমার কর্ত্তব্য কি?'

রমাবল্লভের ব্যাকুল অনুরোধ, কৃষ্ণপ্রিয়ার অশ্রুপূর্ণ মিনতি তাহার স্বভাবকোমল চিত্তকে বন্যার বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। সে কতটুকু যে তাহার উপর এতখানি নির্ভর ও আগ্রহ? তারপর আর একটা কথা, সে তাঁহাদের অন্নগ্রহণ করিয়াছে, তাঁহারা প্রভু—ধরিতে গেলে সে ভৃত্য। যাঁহার অন্ন গ্রহণ করা যায় তিনি পিতা। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য প্রাণোৎসর্গ করাও শাস্ত্রীয় বিধি। সে তাঁহাদের জন্য এটুকুও পারিবে না? কিন্তু এইটুকুই যে বড় কঠিন! সেই রাজরাজেন্দ্রাণী মূর্ত্তিতে মর্ম্মর-মন্দিরে যে বিরাজিতা, যাহাকে দেখিলেই—সম্ভ্রমে কি ভয়ে —সহসা সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে নয়নের দৃষ্টি আপনা হইতে নত হইয়া পড়ে—কেমন করিয়া তাহাকেই সে সখী সেবিকা সহধর্ম্মিণীরূপে কল্পনা করিবে? কেমন করিয়া সে নিজের এই সঙ্কোচপূর্ণ সম্ভ্রমজড়িত আনত নেত্র, বাণীর প্রদীপ্তাভ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল নেত্রের উপর সংস্থাপিত করিবে? অসম্ভব! যে নিষ্ঠাবতীর দেবীমূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মূর্ত্তি-পূজায় বিরুদ্ধ চিত্ত সংযত—তাহার ভ্রান্তি অপনোদিত হইয়াছে—মূর্ত্তি-পূজায় যাহার প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া সে এখন বুঝিয়াছে মূর্ত্তিপূজা 'পৌত্তলিকতা' নহে, মহিমাময় রাজরাজেশ্বরেরই উপাসনা। তাহাতে সাধকের উপকার ভিন্ন অপকার হয় না, মূর্ত্তি দ্বারা মন আসল বস্তু হইতে দূরে সরিয়া যায় না, ক্ষুদ্রের মধ্যেও বিশাল সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়—কেমন করিয়া সেই কল্পনার দেবীকে মানবীরূপে সে নিজের পাশে দাঁড় করাইবে? এ যে একান্ত অসম্ভব! যাহার একনিষ্ঠ ভক্তি ও আরাধনায় প্রীত হইয়া তিরস্কারকে সে পুরস্কার বোধ করিয়াছিল, সেই দেব পার্শ্বচারিণীকে সে বেদ মন্ত্রে কিরূপে স্বীকার করাইবে যে—একমাত্র সে-ই তাহার ধ্যান, দেবতা, আশ্রয়—অদ্যাবধি দেহ মনের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সে এই তাহারই অনুবর্ত্তিনী হউক। অসম্ভব! ইহা একেবারেই অসম্ভব!

চিন্তাক্লিষ্ট অম্বর তাই ব্যাকুল-নেত্রে ভগবানের উদ্দেশ্যে কাতরকণ্ঠে বলিল, বলিয়া দাও প্রভো! আমি কি করিব? আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা দেখাইয়া দাও। শুধু মনের দুর্ব্বলতায় আসল জিনিষ যেন ভুলিয়া না যাই।

সহসা মনে পড়িল, আর সাত দিন পরে রমাবল্লভ তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার হারাইবেন—মন্দিরও তাঁহাদের নিকট হইতে অপরের হস্তে চলিয়া যাইবে। সে ঈষৎ চমকিয়া উঠিল—এ মন্দির গেলে বাণী প্রাণে বাঁচিবে না—এ মন্দির যে তাহার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। আমিও ত প্রাণ থাকিতে তাহা সহিতে পারিব না। তবে তাহাই হউক—তাঁহার কথা রক্ষা করিব—বিবাহান্তে দূরেই থাকিব। তবু ত তাহাকে দারিদ্র্য হইতে—অবমাননা হইতে—দারুণ মনঃকষ্ট হইতে উদ্ধার করিতে পারিব—সুখ-সম্মানের অধিকারিণী করিতে পারিব। ইহাও কি আমার একটা কর্ত্তব্য নয়? যদি তাহাকে—শুধু তাহাকেই বা কেন, জগতের যে কোন একটি প্রাণীকেও সুখী করিতে পারি—সে আনন্দ হইতেই বা বঞ্চিত হই কেন? এ বৃথা সঙ্কোচ লইয়া আমার একেবারে সরিয়া থাকায় ফল কি?

একটা বড় নক্ষত্র বিবিধ বর্ণ বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছিল—সহসা সেটা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া যেন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল—মৃদু বাতাসে গগন-চুম্বী দেবদারুর শির কাঁপিয়া উঠিল। অম্বরের মনে হইল, ইহা যেন দেবতার আশীর্ব্বাদ! সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আবার সে ভাবিতে লাগিল—ইহাও বিষম সমস্যা! বিবাহের পরদিন বিবাহ অনুষ্ঠান শেষেই, জন্মের মত বিবাহিতাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। নিজের মনের দিক্ হইতে দেখিলে এ সর্ত্তে তাহার কিছুমাত্র অসম্মতি নাই, বরং—হাঁ, যথার্থ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা কি, বরং—এই সর্ত্ত ভিন্ন তাহার পক্ষে এ কাজ করা আরও কঠিন হইত। বিবাহের

পরই গৃহজামাতারূপে যদি তাহাকে এই বাড়ীতে বাণীর নিকট বাস করিতে হইত, তবে হয় ত সে কিছুতেই এ বিবাহে স্বীকৃত হইতে পারিত না। তথাপি কর্ত্তব্যের দিক দিয়া দেখিলেও এইখানে গুরুতর একটা বিরোধ জাগিয়া উঠে। মনের মধ্যে সেই তত বড় একটা সঙ্কল্প রাখিয়া দেব-ব্রাহ্মণ শালগ্রামশিলা সমক্ষে—অগ্নি সাক্ষ্যে—বেদমন্ত্রে কঠিন প্রতিজ্ঞা লইয়া বিবাহ করিয়া শাস্ত্রানুসরণ না করিলে যে পাপ হইবে। সে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই! এ সমস্যার একমাত্র সমাধান—এ বিবাহে অসম্মতি প্রদান। অম্বর উঠিয়া একধারে রক্ষিত নিজের পুঁটুলিটা খুলিল, তাহাতে কয়েকখানা অর্দ্ধ মলিন ও ধৌত বস্ত্র, খানকয়েক পুঁথিপত্র, একটি বনাতের বটুয়ায় ব্রত ও ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা লভ্য দুই-চারিটি টাকা পয়সামাত্র ছিল। সে একটুখানি পুঁথি লইয়া আলোর নিকট আসিয়া বসিল।

এ কি মন্ত্র! প্রতি অর্থে ইহার কি গাম্ভীর্য্য—কি কঠিন প্রতিজ্ঞার পাশে আপনাকে বাঁধিয়া দেওয়া—অপরকে বদ্ধ করা! এ বিবাহ-বন্ধন কি কখনও খুলিতে—জীবনে বা মরণে শিথিল হইতে পারে? সম্মুখে ক্ষুদ্র শালগ্রাম-শিলামধ্যে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ—বিরাট্ পুরুষ। ব্রহ্ম-রূপী অগ্নি ও ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী—ঊর্দ্ধে চির অচপল ধ্রুব-তারা—ইহাদের সমক্ষে বেদমন্ত্র রূপা মহাশক্তি দুইজনের সংযোগ সাধনে আবির্ভূতা! হৃদয়ভরা কপটতা লইয়া এখানে দাঁড়ান চলে না। হায়, যে কার্য্য করিলে সেই দেবমন্দির গত প্রাণাকে তাহাকে সারসুখ প্রদান করিতে পারা যায়, তাহার পক্ষে যে তাহা সম্ভবই নয়!

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। বাহিরে নিশাচর পক্ষীর কর্কশ স্বর ও তাহাদের অকস্মাৎ আক্রমণে ঘুমন্ত পক্ষীনীড়ে বিপন্ন পক্ষী-শাবকের আর্ত্ত চীৎকার প্রায় একসঙ্গে স্তব্ধ রাত্রিকে চকিত করিয়া তুলিতেছিল। জানালার মধ্য দিয়া সেই নক্ষত্রটা সেইরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অম্বরের চিন্তা-

জয়াতুর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন বলিল। অকস্মাৎ সে চমকিয়া উঠিল, সে দৃষ্টিতে কোন্ অতীতে কাহার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃভরা স্থির-দৃষ্টি আভাস! সে আর সেদিকে চাহিতে পারিল না। সেই সমুজ্জ্বল তারকার মত নেত্রাভাস যেন তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছিল, এত মূর্খ তুমি—এত হীন তুমি—তাহা জানিতাম না। সত্যই বুঝি সে হীন! হীনাপেক্ষাও হীন—শরণাগতকে রক্ষা করিবার এতটুকু সাহস তাহার নাই? সত্যই ত, তাহার ন্যায় ভীরু জগতে কে আছে?

অম্বর নিজের শরীরে ও মনে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করিল। সেই পাষাণমূর্ত্তিবৎ রহস্যময়ী—দেবপ্রতিমার নিত্য-সঙ্গিনী দেবীকে যে তাহার ঈপ্সিত দান না করিয়া সে আর কোন মতেই নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবে না। মনের অগোচর পাপ নাই। যে নিষ্ঠাবতীর একনিষ্ঠ দেব প্রেমে সে তাঁহাকে অকুণ্ঠ ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিয়াছে, আজ সন্ধ্যায় সেই সুদূরবর্ত্তিনী যখন তাহার অতি নিকটে আসিয়া বরদারূপে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন হাঁ, তখন তাহার অনুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত হৃদয় যে কি এক তীব্র অনুভূতিতে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে নিশ্চিতই বুঝিতে পারিয়াছে। অম্বরনাথ সবেগে নিজের বুকখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, তারপর অবসন্নভাবে নিকটস্থ শয্যায় লুটিয়া পড়িল। সে চিরসহিষ্ণু, চিরউপেক্ষিত; কখনও কোন কামনা তাহার চিত্ত অধিকার করে নাই। আজ একি অনুভূত সুখ দুঃখের সুপ্ত লহরী তাহার শান্ত হৃদয় তলে অকস্মাৎ সাগর-জল কল্লোলের গম্ভীর সুরে জাগিয়া উঠিয়াছে!

শেষ রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাসে বাহিরে তখন মুকুলদাম ফুটিয়া উঠিয়া সুরভিতরঙ্গ তুলিয়াছিল; অম্বরনাথ প্রাতঃকৃত্যের জন্য উষালোকে নদীর দিকে চলিয়া গেল। সে ভাবিল, বিবাহ মন্ত্র পত্নীকে অভিন্নাত্মারূপে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়। আজই আমি বুঝিতেছি—তাহা আমার পক্ষে

অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ যাবজ্জীবন ভরণপোষণাদির ভার? এই বিষয় রক্ষা হইলে আংশিকভাবে—সে প্রতিজ্ঞা পালন হইতেও পারে? জমিদার মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা একেবারে অসঙ্গতও নহে। অম্বর ভাবিতে লাগিল, এই ভাবে কার্য্য করিলে নিতান্তই মিথ্যাচারী হইব না এমনই ত মনে হয়।

পথে যাইতে যাইতে ধূসর আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে রক্তিম রেখার দিকে চাহিয়া সে মৃদু নিশ্বাস ফেলিল। একাত্মারূপে আর দুই দিন পরে সে তাহার এই তুচ্ছ জীবনের মধ্যে তাহাকে লাভ করিবে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ইহাতেই বা ক্ষতি কি? সে এখন অনায়াসে বলিতে পারে, 'যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব।' তারপর এ জীবনের মত দুইজনে এ পৃথিবীর দুই বিভিন্ন প্রান্তে থাকুক না—তাহাতে কি ক্ষতি? সে তাহাকে তাহার পত্নী—সহধর্ম্মিণীরূপে কখনও কার্য্যাবসরে চিন্তা করিবে এবং এ জীবনে এই মনের ভাব যেন কেহ কখনও জানিতে না পারে, তাহারই জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অম্বরের ন্যায় সে রাত্রে রমাবল্লভও নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। রাত্রি বেলায় আহারের সময় বাণীকে উপস্থিত না দেখিয়া তাঁহার বুকে একটা প্রচণ্ড বেদনা সুতীক্ষ্ণ শূলফলকের মত বিঁধিয়াছিল। কন্যাস্নেহে তাঁহার সারা চিত্ত ভরিয়া আছে সত্য, কিন্তু আজ তিনি তাঁহার নিজের সুখের জন্য সেই তাহাকেই কতখানি ব্যথা, কত বড় লজ্জা দিতে বসিয়াছেন, মনে করিয়া তাঁহার বুক যেন শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কোথায় রূপে গুণে অদ্বিতীয় দেশমান্য জামাতা আনিবেন, যাহাকে দেখিয়া সকলে বাণীর

যোগ্য বর হইয়াছে বলিয়া কত আনন্দ করিবে—মেয়ের মুখে সুখের আভাস দেখিয়া তাঁহারও পিতৃ-হৃদয় সাফল্যের গভীর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। তাহা না হইয়া হইল কি না একজন মলিন উত্তরীয়ধারী সংস্কৃত-শিক্ষিত—তাও একটা উপাধীধারী পর্য্যন্ত নয় এবং এমন বয়স নাই যাহাতে এখন আবার এ, বি, সি, করিয়া ইংরেজি শিখিয়া মানুষ হয়—তাঁহারই সংসার হইতে বিতাড়িত পুরোহিত, বাণীর দু'চক্ষের বিষ—তাহাকেই পায়ে ধরিয়া ডাকিয়া আনিয়া কন্যাদান করিতে হইতেছে। অদৃষ্টের এ কি তীব্র পরিহাস। কোন অজ্ঞাতপাপের এ মহা প্রায়শ্চিত্ত?

দুইটি হাতে ভাতে করিয়াই আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া কন্যার দ্বারে গিয়া রমাবল্লভ ডাকিলেন, "রাধারাণি, মা আমার, উঠে আয় মা!" তাঁহার বক্ষ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি গাঢ়স্বরে পুনশ্চ বলিলেন, "মা গো! দেখ, তুই ছিলি নে বলে আজ আমি কিছুই খেতে পারলাম না। মা, তুই উঠে আয়, একবারটি তোকে আমি দেখি।"

বাণী আজ রাগ করিয়া থাকিতে পারিল না। ঝনাৎ করিয়া দ্বার খুলিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার ঘর বারান্দার আলো পাইয়া অল্পমাত্র আলোকিত হইয়াছিল। সে আলোয় তাহার মুখ স্পষ্ট দেখা গেল না। পিতা কন্যাকে দুই-হাতে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। বাণী নিঃশব্দে পিতার বক্ষে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। তখন তাহার অত্যন্ত কান্না পাইতেছিল। ক্রোধের আগুনে বর্ষার ধারা নামিয়া পড়িতেছিল। তাই সে উত্তর দিতে পারিল না; কান্নাকাটা প্রাণপণে চাপিবারই চেষ্টা করিতে লাগিল।

রমাবল্লভ ডাকিলেন, "মা গো! আমার উপর কি তুই রাগ করেছিস্ মা?" উত্তর না পাইয়া সমধিক ব্যাকুলভাবে আবার কহিলেন, "বল্ মা—আমি কি করি? তুই আমায় বল্ মা—কোন উপায় আছে কি?"

বহুক্ষণ নীরব থাকার পর বাণী নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া ছল ছল জলভরা চোখে মুখ তুলিয়া বলিল, "দাদাবাবু আমায় একটুকুও ভালবাস্‌তেন না।"

রমাবল্লভ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বাস্‌তেন মা, খুব বাস্‌তেন—তবে তিনি তাঁর নিজের কুলধর্ম্ম, আর আচারকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাস্‌তেন। আমি পাছে ওগুলোকে তেমন করে না মানাতে পারি, তাই আমার হাত পা এমন করে বেঁধে রেখে গেছেন। কারও দোষ নয় মা, এ আমার কপালের দোষ!"

"চল বাবা, আমরা আর সাতদিন পরে এ সব ছেড়ে দিয়ে অনেক দূরে কোথাও চলে যাই—তাঁর আচারই বজায় থাক্।"

রমাবল্লভ নিজেও কি এ কথা অনেকবার মনে আনেন নাই? আনিয়াছেন বই কি। কিন্তু যতবারই মনের মধ্যে এ চিন্তা জাগ্রত হইয়াছে, ততবারই তিনি যেন কেমন হইয়া গিয়াছেন। চিরদিনের এই সংসার সুখ সম্পদ—সবই পিতৃ পিতামহের—জন্ম-সূত্রে তিনি এ সকলের অধিকারী হইয়াছিলেন। এ সব ছাড়িয়া কোথায় কোন অজ্ঞাতবাসে যাইবেন? কিন্তু কন্যার এই সকরুণ বাক্যে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাহার এ লজ্জা যে কত বড় লজ্জা, সে তিনি নিজের ভিতর হইতেই অনুভব করিতে পারিতেছিলেন বলিয়া তাহার জন্য মনটা একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। গভীর দুঃখে তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "তাই চল্ মা! কাজ নেই আমাদের এ ঐশ্বর্য্য—চল্, কোথাও পালিয়ে যাই।"

কণ্ঠস্বরের মৃদু কম্পনে মনের কি সুগভীর সর্ব্বত্যাগী বাৎসল্যই প্রকাশ পাইল! বাণীর সমস্ত চিত্তত্তাপ, পিতার সহানুভূতিসূচক এই কথাটিতে জুড়াইয়া গিয়া তখুনি আবার স্নেহশীলা কন্যাপ্রকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সে পিতাকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিতস্বরে বলিয়া

উঠিল, "না বাবা, এ সব ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাব? যা হয় হোক— এখান থেকে কোথাও যেতে পারব না।"

তথাপি রাত্রে রমাবল্লভ ঘুমাইতে পারিলেন না। মেয়ে না হয় মেয়ের কাজ করিয়াছে, তাই বলিয়া ত আর বাপের কর্ত্তব্য বাপ ছাড়িতে পারেন না। সকাল হইলেই কি ঘটনা ঘটিবে, ইহা ভাবিয়া আকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ-চোখও লাল হইয়া উঠিতেছিল। আবার আর এক ভাবনা—অম্বর যদি বিবাহ করিতে অসম্মত হয়, তবেই বা কি হইবে? যদি সম্মত হয়, লজ্জায় দুঃখে বাণী হয় ত মরিয়া যাইবে।

যত বেলা হইতে লাগিল, রমাবল্লভের সন্দেহের যন্ত্রণা ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; শেষের দিকে আর সকল ভয় গিয়া ক্রমে এই একটিমাত্র প্রকাণ্ড ভয় জাগিয়া রহিল, পাছে অম্বর আসিয়া বলে—ভাবিয়া দেখিলাম—ইহা অসম্ভব! এই সম্ভাবনার কথা মনে পড়িতেই রমাবল্লভের হাত পা-গুলা অসাড় হইয়া আসিল। তাহা হইলে পথে বাহির হওয়া অনিবার্য্য! কারণ মৃগাঙ্কের হাতে সতীনের উপর মেয়ে দিতে তিনি কোন মতেই পারিবেন না। তিনিও ত জমিদার হরিবল্লভের পুত্র। পিতার মনে ব্যথা দিয়াও ন্যায়ের অনুরোধে যাহা শপথ করিয়াছিলেন, আজ অর্থ-বিনিময়ে তাহা তিনি ভাঙ্গিতে পারিবেন না—না না, ততদূর অর্থপিপাসা তাঁহার নাই।

মানুষ যদি দুর্ভাবনার হস্তে নিজেকে ছাড়িয়া দেয়, তবে ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রগর্ভে কাণ্ডারীহীন তরণীর মতই ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরিয়া মরা ভিন্ন তাহার আর উপায় নাই। বিজ্ঞ জমিদার শিশুর মত অস্থিরচিত্তে উঠা বসা ঘোরাঘুরি করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন।

ভৃত্য আসিয়া জানাইল, পুরাতন পুরুতঠাকুর আসিয়াছেন।

শুনিয়াই রমাবল্লভ চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার পাণ্ডু মুখ যেন এ সংবাদে একেবারেই শুভ্র হইয়া গেল। আসিয়াছে? কি বলিবে? যদি

বলে, 'না, আমি পারব না।' তার চেয়ে আশায় আলো লইয়া এ কয়টা দিন কাটানও যে ভাল ছিল! বিদায় দিব না কি?

ভৃত্য আদেশ প্রার্থনায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে দেখিল, প্রভুর সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। বিস্মিত হইয়া সে বলিল, "তেনাকে এখন তা হলে বিদেয় করে দি' ?"

রমাবল্লভ ব্যাকুলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না না, তাঁকে ডাক্।"

অম্বর প্রবেশ করিয়া নমস্কারের পরিবর্ত্তে প্রণাম করিল। রমাবল্লভের চিত্ত যদি অতদূর বিচলিত না হইয়া কিছুমাত্রও স্ব-ভাবে থাকিত, তাহা হইলে—একরাত্রে এ মানুষটার পরিবর্ত্তনে তিনি বিস্ময় বোধ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। শিশু সহসা যৌবন পাইলে, অথবা ক্ষুদ্র মুকুল অকস্মাৎ পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিলে যেমন সকলেরই দৃষ্টি সেদিকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ শিশুস্বভাব অম্বরনাথের সরল মুখে আজ একটা আকস্মিক গাম্ভীর্য্যের ছায়া পতিত হওয়ায় তাহার উপর সকলেরই দৃষ্টি পড়িতেছিল; কিন্তু রমাবল্লভের অতদূর সূক্ষ্ম বোধ দূরে থাকুক, স্থূল প্রত্যক্ষ বিষয়েও দৃষ্টি হারা হইয়াছিলেন। অম্বরের গৃহ প্রবেশের পর বহুক্ষণ তিনি চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতেই সাহস করিলেন না। চাহিতে গেলে এই সঙ্কুচিতস্বভাব ছেলেটির মুখে যে বজ্র-লেখা মধ্যে মধ্যে ফুটিয়া উঠে, সেইটা যদি হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িয়া যায়!

অম্বর কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া দেখিল, রামবল্লভ কিছু বলিলেন না। সে মনে করিল, হয় ত ইঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হঠাৎ কিছু বলা উচিত নয়। ইহা ভাবিয়া সেও নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চিত্ত এখন বেশ স্থির হইয়াছে। ভোরের আলোয় নদীতীরে আকাশের তলে উদীয়মান রবির স্থিরোজ্জ্বল কিরণ-ধারায় সে দেখিয়াছে, তন্মধ্যে দেবাদেশ লিখিত। সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী ইষ্টদেবী প্রসন্নমুখে বলিয়াছেন,

এ বিবাহে তোমার দিক হইতে অধর্ম্মাচার নাই, তোমার বধূকে তুমি মানসীরূপে পত্নী—সহধর্ম্মিণী পদ দিতে পারিবে। আর তাহার পক্ষে? তাহার ধর্ম্ম তাহার দেবতা তাহাকে শিখাইয়াছেন—সে ভাবনা তোমার কেন?

রমাবল্লভ আসন গ্রহণ করিয়া নতমুখে কোনমতে বলিলেন, "অম্বর আমি প্রতীক্ষা করছি।"

অম্বর মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনার আদেশ পালনে আমি প্রস্তুত আছি।"

"প্রস্তুত আছ! সকল সর্ত্তেই?"

অম্বর মাথা তুলিয়া বলিল, "হ্যাঁ—সকল সর্ত্তেই।"

একটা বিকল যন্ত্র অকস্মাৎ লুপ্ত স্বর ফিরিয়া পাইলে যেমন আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠে, রমাবল্লভের কণ্ঠ মধ্য হইতে সেইরূপ একটা বিস্ময়ানন্দসূচক অর্দ্ধব্যক্ত স্বর বাহির হইল।

জমিদার-কন্যার বিবাহে যে কাণ্ডটা ঘটিল, রাজনগর গ্রামে এত বড় বিস্ময়কর ঘটনা আর কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া কাহারও মনে পড়ে না। স্বর্গীয় জমিদার যখন ঐ আশ্চর্য্য মর্ম্মর-মন্দিরে দেবৈশ্বর্য্যের সমাবেশ করিয়াছিলেন, তখন বোধ করি তথাকার অধিবাসীরা তত বিস্মিত হয় নাই। আজকাল ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ স্থানে স্থানে জমায়েৎ হইয়া কেবল ঐ একমাত্র আলোচনা লইয়াই দিন কাটাইয়া দেয়—উত্তেজনার তর্কে কাহারও কাহারও ঘরে হাঁড়ি চড়াইতে, কাহারও বা ছেলে পড়াইতে ভুল হইয়া যায়। আত্মনাথ তুলসীকে গিয়া বলিল, "এ কি রটনা বৌঠাকরুণ?"

তুলসীর মন আনন্দে ভরা ভরা। তাহার সখীর একটা সখা জুটিলেই সে খুসী। তাহা ছাড়া আড়াল হইতে অম্বরনাথকে দেখিয়া তাহার বেশ মনেও ধরিয়াছে। হইলই বা গরীব? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলই বা?

উজ্জ্বল চোখে নম্র দৃষ্টি, রক্তিম অধরপ্রান্তে বেশ একটুখানি স্নিগ্ধ সকরুণ হাসি। এইটুকুই বা কয়জনের থাকে? অম্বুনাথের কথায় সে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "রটনা আবার কি ঠাকুরপো! এ ত সত্যি কথা।"

অম্বুনাথের মুখখানা হাঁড়ির মত হইয়া গেল।—"এ দেশের দেখছি সবাই এক একটা আস্ত পাগল! ভাত-রাঁধা বামুনটা হ'ল দেবপুরোহিত। আবার পুরুত-গিরি হ'তে যার নাম কাটা গেল, সে-ই হ'ল জামাই! কালে কালে আরও কতই দেখতে হবে।"

তুলসী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "পাকা পুরুত দেখে যদি জামাই করতে হয়, তা হলে বিবাহ সভায় যে আনাড়ি পুরুতকে মন্ত্র বলতে ডাকা ভিন্ন উপায় থাকে না ভাই! তাই না এই উল্টো পথে চলতে হ'ল।"

অম্বুনাথ ইহার মধ্যে তাহার নিজের প্রতি রহস্যেঙ্গিত বুঝিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "যাও, যাও, অত হাসি ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না। আমি একটা নিমন্ত্রণে শান্তিপুর চললেম—সেখান হ'তে পনের দিন পরে ফিরব।"

"ওমা! সে কি? তা হলে বিয়ে দেবে কে?"

"বড় ত বিয়ে, তার দু-পায়ে আল্‌তা। যেমন বর, তেমনই পুরুত খুঁজে পেতে আনা হোক্ না। আমি মরে গেলেও এমন বিয়ের পুরুতগিরি করতে পারব না। জগতের স্থিতিকাল ফুরিয়ে এসেছে, যাবে, শীঘ্রই সব উৎসন্ন যাবে।"

ক্রোধভরে অম্বুনাথ উঠিয়া গেল। যাইতে যাইতে তুলসীমঞ্জরীর কলকণ্ঠনিঃসৃত বিদ্রূপ হাস্য গৃহান্তর হইতেও কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বশরীরে বিষবাণ হানিতে লাগিল। সে যাইবার সময় দরজাটা সবেগে মুক্ত ও সশব্দে রুদ্ধ করিয়া মনের খেদ খানিকটা মিটাইয়া লইল। শব্দ

শুনিয়া তুলসী বলিল, "ঠাকুরপো, গরীবের জোরটা ভেঙে বড়লোকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাবে দেখছি।"

আগুনাথ না হয় রাগ করিয়া পলাইয়া গিয়া বিবাহের পুরোহিতগিরির দায় এড়াইল। কিন্তু বাণীর পক্ষে ক'নে-গিরি বন্ধ করিবার কোনই পথ ছিল না। কাজেই মন্ত্র-নিরুদ্ধ-বীর্য্য বিষধর সর্পের মতই সে মনের রুদ্ধ কোষে গুমরাইতেছিল এবং সুবিধা পাইলেই মায়ের উপর বিষ দাঁতের ছোবল দিয়া দিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেও ছাড়িতেছিল না।

কৃষ্ণপ্রিয়া নিজে এ বিবাহে তেমন অসুখী নহেন। তিনি বরাবরই অম্বরকে স্নেহচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, এবং পিতায় কন্যায় মিলিয়া যখন তাহাকে বিদায় করিয়া দেন, তখন তাহার জন্য তাঁহার মায়ের প্রাণ ভিতরে ভিতরে কাঁদিয়াও উঠিয়াছিল। তবে এ সব বিষয়ে মেয়ের কথাই বড়, তাঁহার পরামর্শের কোনই মূল্য নাই বুঝিয়াই তিনি চুপ করিয়া ছিলেন। কিন্তু যখন শেষ অবলম্বন স্বরূপ আবার তাহার চেয়ে উচ্চ অধিকার লইয়া সে ফিরিয়া আসিল, তখন নিরপরাধের প্রতি অবিচার জন্য তাঁহার মনে যে প্রত্যবায়ের ভীতি জন্মিয়াছিল, তাহা সরিয়া গিয়া তাহার স্থানে প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষমাপ্রাপ্ত চিত্তের শান্তির আনন্দ জাগিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, বাণীর পাপের ইহাই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত! তা হউক, আমার ইহাতে দুঃখ নাই। মেয়ের যে তেজ। এমন ভাল মন না হইলে কে উহাকে সহিবে?

বিবাহে ঘটা তেমন না হইলেও, হাজার হউক, জমিদার ঘরের যে সর্ব্বস্ব, তাহারই যে এ বিবাহ! নয় নয় করিয়াও বড় কম নয়। গৃহিণী কর্ম্মাবসরে মধ্যে মধ্যে কন্যার নিকট আসিয়া বৈবাহিক অনুষ্ঠানের মাঙ্গলিকগুলি সম্পন্ন করাইতেছিলেন। সম্মুখে অপর কেহ থাকিলে বাণীও দ্বিরুক্তি না করিয়া মাতৃ-নির্দ্দেশ পালন করিতেছিল, কিন্তু মাকে একা

পাইলেই সে তাঁহাকে এমন উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল যে তিনি তাহার আব্দারে ও অত্যাচারে বিপন্না হইয়া পড়িতেছিলেন।

বিবাহের দিন এক প্রহর রাত্রি থাকিতে মা আসিয়া মেয়েকে জাগাইয়া বলিলেন, "ওঠ্—বেলা হয়ে যাবে, দধি-মঙ্গলটা সেরে নেওয়া যাক্—"

বাণী ঘুমায় নাই, বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিল। মায়ের ডাকে প্রথমে সে উত্তরই দিল না, শেষে বারংবার আহ্বানে বিরক্ত হইয়া নিদ্রালসকণ্ঠে উত্তর দিল, "দধি-মঙ্গল কি? সেই দইচিঁড়ে খাওয়া ত? আমার পেটে ত আর রাক্ষস ঢোকে নি যে এই ভোরের বেলা পূজো আহ্নিক না করেই এক পাথর চিঁড়ে দই খেতে বসে যাব।"

মা বলিলেন, "বেশী কি খাবি—ছুটি মুখে ঠেকাতে হয়, একবার শুধু বসবি আয়।"

বাণী পাশ ফিরিয়া ভাল করিয়া বালিস টানিয়া লইয়া শুইয়া বলিল, "আমার এখন ভারী ঘুম পাচ্চে। তুমি যাও—যারা খেতে বড় ভালবাসে তাদের পেট ভরে খেতে দাও গে, আমি আর এখন উঠতে পারি নে।"

কৃষ্ণপ্রিয়া একটু রাগ করিয়া বলিলেন, "তোর সকল তাতেই হাঙ্গামা! যা নিয়ম কর্ম্ম আছে, সে সব কর্‌তে হবে বৈ কি। আলাস্ নে, আয় উঠে আয়।"

বাণী তাহার স্বভাবসিদ্ধ জিদের সহিত বলিল, "ভারি ত বিয়ে, তার আবার নিয়ম-কর্ম্ম! আমি এখন একটু ঘুমোই—তুমি বাপু যাও।"

"কি বাণী! কেবলই তুই ঐ সব কথা বলিস্। বিয়ের আবার বড়-ছোট কি?" কৃষ্ণপ্রিয়া এবার তাহার হাত ধরিলেন, কহিলেন, "ওঠ্, মনটা ভাল করে নে দেখি—শুভকার্য্যে ওরকম করতে নেই।"

"না—নেই বৈ কি? বড় বিয়ে! বড় বিয়ে নয় ত কি? পুরুত-বামুনের সঙ্গে বিয়ে বুঝি বড্ড চমৎকার বিয়ে বলতে হবে?"

"পুরুতবামুন কি ছোট লোক? সেকালে সবাই ত পুরুতগিরি করতেন—তাঁদের কত মান্য ছিল। তাঁদের চাইতে বড় কে? ওঠ্ মা ওঠ্।"

বাণী মাতার আকর্ষণে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া তীব্র ঘৃণার সহিত রোষযুক্ত হাসি হাসিল।—"ঠিক সেই রকমই বটে!" তারপর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "বাবা রে বাবা! আমায় মেরে না ফেল্‌লে তোমাদের আর স্বস্তি নেই দেখচি। চল, কোথায় যেতে হবে চল, দই চিঁড়ে খেয়ে শিগগির আমার কলেরা হোক্—তুমি মজাটা টের পাও।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, "তোর জ্বালায়, সত্যি বলচি, আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে বাণী! ভেবে গ্যাখ দেখি, তুই দিন দিন কি হচ্ছিস্!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ হইয়া গেল। বাণী আশা করিতেছিল, কোন না কোন উপায়ে হয় ত শেষকালে কোন দৈববলেও অন্ততঃ এই দারুণ লজ্জার হাত হইতে তাহার মুক্তি ঘটিবে। কিন্তু তেমন কোন অঘটনই ঘটিল না। চকিতের মত ইহাও সে ভাবিয়া ফেলিয়াছে যে, হয় ত দাদাবাবুর একখানা গোপন উইল পত্র আর কোথাও লুকান আছে, বিবাহের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সেখানা আবিষ্কৃত হইয়া—যেমন নাটক নভেল শুনা যায়, সকল হাঙ্গামা মিটাইয়া দিবে। কিন্তু হায়, পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া শেষ মুহূর্ত্ত অবধি নির্ব্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত গতিতে যথাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল—স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কোন ঘটনাই ঘটিল না।

কনে সাজাইবার সময় তুলসী রত্নালঙ্কারের রাশি আনিয়া কাছে বসিলে একবার সহসা তাহার মনের মধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের

উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে সে আত্ম সংবরণ করিল। বাড়ীর অন্য সকলে বলাবলি করিতেছিল, মেয়ে ত আমাদের রাধারাণী! বাপ মা যেটি বলছে, তাতে একটু হুঁ হাঁ অবধি নেই। এই যে অযোগ্য বিয়ে হচ্ছে, তা মুখখানিতে দুঃখের এতটুকু ছায়া আছে!"

তুলসী বলিল, "সই, আজ ভাল করে সাজাই, আয়।"

ভাল করিয়া সাজিবে? কাহার জন্য? হায়! কাহার জন্য সে সাজিবে? বাণীর উভয় গণ্ড গাঢ় রক্তে আরক্ত হইয়া উঠিল; তবুও হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই সাজা। গঙ্গাযাত্রার সময় খুব ভাল করে সাজ্‌তে হয়।"

"ছিঃ সই, যা মুখে আসে তাই বলতে আছে কি? কেন ভাই, তোর কি বর মনে ধরে নি?"

মনে ধরা যে সম্ভবই নয়, তাহা তুলসী বেশ ভালই জানিত। কিন্তু এত বড় অঘটন কেন ঘটিল, সে সংবাদটা উহ্য—তাই সে ফাঁপরে পড়িয়াছিল। তবে বাণীর ব্যবহারে মনের সন্দেহটা এ পর্য্যন্ত বাহিরে ফুটিতে পায় নাই। তাহাকে ত কৈ এ বিবাহের বিরোধী দেখায় না? শেষকালে সে নিজে নিজেই মীমাংসা করিয়াছিল যে, পৌরোহিত্যে অযোগ্য অম্বরনাথকে সে স্বামীত্বের অনুপযুক্ত মনে করে নাই। এখন তাই বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "বর কি তোর মনে ধরে নি?"

বাণী নিজের স্বভাবসিদ্ধ গর্ব্বের দ্বারা মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া রাজরাণীর ধরণে গ্রীবা বাঁকাইয়া গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "মনেই বা ধরবে না, কেন?"

"তবে?"

"কি, তবে?"

"ও সব বল্‌ছিস্ যে?—ওই যে বল্লি।—ছিঃ, যা নয় তাই।"

বাণী হাসিয়া বলিল, "মনে ধরেছে বলেই ত বলছি।—মনেই যখন ধরেছে, তখন অনর্থক সেজে গুজে আর কি হবে?"

বিবাহের সময় শুভদৃষ্টি শুভভাবে না হউক, একপ্রকারে হইয়া গেল। অম্বরের নেত্র তারকা নির্ম্মল সন্ধ্যা তারকার মত। সে দিকে চোখ ফিরাইলে অগ্নিকণাও শীতল হইয়া আসে। বিদ্যুতের ন্যায় বারেক সেইদিকে চাহিয়া বাণী দৃষ্টি নত করিল, কিন্তু নেত্রের সে নতি লজ্জায় নহে—ক্রোধে। আবার রমাবল্লভও যখন বরের হাতে কন্যার হাত দিয়া সম্প্রদানমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন সে মন্ত্রোচ্চারণে পুনঃ পুনঃই তাঁহার উচ্চারণবিকৃতি ঘটিতেছিল এবং একটা অপমানের তীব্র জ্বালা পিতা ও কন্যার সর্ব্বশরীরের মধ্যদিয়া খরস্রোতে বহিয়া যাইতেছিল। বাণীর সেই হাতখানা—যেখানা অম্বরের হাতে ছিল—সেখানা যেন তাহার অঙ্গ হইতে খসিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এমনি তাহার মনে হইতে লাগিল। হাতখানা কাঁপিল না, কিন্তু ভিতরের অতবড় উত্তাপেও তাহা গরম না হইয়া বরং বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া আসিল।

যাহার নিকট হইতে লক্ষ যোজন দূরে থাকিতে পারিলে প্রাণ বাঁচে—সেই মূর্খ পুরোহিতের সঙ্গে অনুষ্ঠানকারিগণ তাহার বস্ত্র-গ্রন্থি বাঁধিয়া দিল। বাণীর তখনি টান দিয়া সেই গ্রন্থি-বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা অত্যন্তই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু চারিদিকে ঐ সহস্র চক্ষুই যে, তাহারই দিকে নিবদ্ধ, এখানে এমন কাণ্ডটা করিলে এখনি একটা তীব্র আলোচনা ও তীক্ষ্ণ উপহাস উঠিবে। সে প্রাণপণে নিজেকে তাই সংযত করিয়া কোনমতে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল! মনে মনে ভাবিল, কতক্ষণে এসব বিপদ্‌গুলা শেষ হইবে?—'ও' আসামে চলিয়া যাইবে, আমিও বাঁচিব!

বাসরে আনন্দ নিশি যাপনের সুপ্রচুর আয়োজন হইয়াছে। কুটুম্বিনী

সখী নিমন্ত্রিতার কোনই অভাব ছিল না। অম্বর ঘরে না ঢুকিয়া বাসরের দ্বারে দাঁড়াইয়া পড়িল। জলধারা দিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া আনন্দ সজল নেত্রে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন, তিনিও দাঁড়াইয়া ফিরাইলেন। "এস বাবা, এইখানে বসে একটু জল খাওসে। ওগো, তোরা সব আমার চাঁদের মত জামাই দেখেছিস ?"

নারীগণ একসঙ্গে কোলাহল করিয়া কেহ যথার্থ কেহ বা মন রাখিয়া নব জামাতার রূপের প্রশংসা করিয়া উঠিল। সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠন তলে সক্রোধ বিদ্রূপে বাণীর অধরে অবজ্ঞার তীব্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, মনে মনে সে বলিল, "মা যেন 'আদেখ্‌লে'! যা পান তাতেই খুসী। আহা-মরি কি অপরূপই! এমন আর কখন দেখেন নি!"

অম্বর কহিল, "মা! আমার শরীর বড় অসুস্থ আছে, একটু ঘুমাতে পারলে বোধ করি ভাল হ'ত। এখন আমি বাইরে যেতে পারব কি ?"

কৃষ্ণপ্রিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "শরীর ভাল নেই ? কেন বাবা কি হয়েছে ? বাইরে ত এখন যাওয়া হয় না। আচ্ছা, আমি এখনই তোমায় জল খাইয়ে ঘুমাবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। ও মা তুলসী! শীগগীর জল খাবারটা নিয়ে আয় না মা, দুজনে একসঙ্গে আজ খেতে হয়, না ?"

"হয় বৈ কি, সই মা! একপাতে খেতে হয় যে! তুমি যাও, আমরা ওদের খাওয়াচ্ছি। অসুখ টসুক ও সব কিছু নয়, সই মা—ও সব তোমার জামাইয়ের ঢঙ। আজ আর তা বলে কেউ ঘুমাতে পায় না। আজ রাত্তিরটা সকলের সঙ্গে বসে আমোদ আহ্লাদ করতেই হয়।"

অম্বর ধীরভাবে কৃষ্ণপ্রিয়ার নেত্রের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি ত কিছুই খেতে পারব না মা, আমায় শুধু একটু ঘুমাতে দিতে বলুন। না হয়ত বেশী অসুখ করতে পারে।"

গভীর বাৎসল্যে কৃষ্ণপ্রিয়ার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। নবজাত

শিশুর প্রতি যে স্নেহ অকস্মাৎ জোয়ারের জলের মত মাতৃবক্ষে উথলিয়া উঠে, এই নব সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবল স্নেহতরঙ্গ কূলপ্লাবী হইয়া তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। অসুখের কথা শুনিয়া উৎকন্ঠিত হইয়া তিনি বলিলেন, "তবে আজ আর কিছু খেয়ে কাজ নেই। ও তুলসী, ও মা সুরবালা, তোরা আর গোল করিস্ নে মা, ওকে আজ রাত্তিরটা ঘুমাতে দে'। অসুখ বিসুখ করলে ভাবনায় আমি মরে যাব বাছা!"

অম্বর যখন প্রথমে দাঁড়াইয়াছিল, তখন, অম্বরের উত্তরীয়ে গাঁটছড়া বাঁধা—কাজেই বাণীকেও সেই সঙ্গে বাধ্য হইয়াই দাঁড়াইতে হয়। সে অমনি ঘোর বিরক্ত হইয়া ভাবিল, এই ত প্রভুত্ব আরম্ভ হয়ে গেল দেখছি! উনি দাঁড়ালেই দাঁড়াতে হবে, চললে চলতে হবে। আমায় যেন কিনে ফেলেছেন। ভাগ্যে দুদিন পরেই চলে যাবে, তাই রক্ষা। নইলে সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি!

কিন্তু অম্বর যখন "এক পাতে খাওয়ার" প্রস্তাব হইতে একত্র রাত্রি যাপনাবধি সব জ্বালা জঞ্জাল কাটাইয়া তাহার মস্ত বড় বড় ভাবনাগুলাকে মুহূর্ত্তেই চুকাইয়া দিল, তখন এই সর্ব্বপ্রথম তাহার প্রতি সে একটুখানি কৃতজ্ঞতা অনুভব না করিয়া যেন থাকিতে পারিল না। বিশেষ এই বাসর দৃশ্য কল্পনা করিয়া কয়দিন যেন সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মরিয়া ছিল। লোকের সম্মুখে মান বজায় রাখিতে হইবে, অথচ সেখানে বর ক'নে লইয়া যে সকল কাণ্ড সংঘটিত হয়; সে সকলের সমর্থন করাও তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব! পাছে তাহার স্বভাবসুলভ গ্রহিমাদৃপ্ত সাম্রাজ্ঞী ভাবটা আজ কার্য্যগতিকে হারাইতে হয়, এই ভয়ে তাহার বুকের মধ্যে এতক্ষণ তীব্র বেগে আঘাত করিতেছিল।

বাসরসঙ্গিনী মহিলাগণ বর ও তাহার শাশুড়ীর বিবেচনায় পুনঃপুনঃ

দোষারোপ করিয়া অনেকেই অভিমানে ঘর ছাড়িয়া গেলেন—নিতান্তই যাহাদের সখ বেশী তাহারা কেহ কেহ বাসর ঘরের মমতাবশে পুষ্পগন্ধামোদিত সুরম্য স্বপ্নপুরীবৎ বাসর-গৃহের গালিচার উপর অঙ্গ ঢাকিয়া দিল।—তবু ত সেটা বাসর ঘর! নববধূ বাণী বাসরগৃহে প্রবেশ করিয়াই তাহারই একপ্রান্তে অবস্থিত সুকোমল শয্যা বিস্তৃত পালঙ্কোপরি শুইয়া পড়িয়াছিল। বর অম্বরনাথ গাঁটছড়া-বাঁধা উত্তরীয়খানা ধীরে ধীরে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া নীচের মসনদ শয্যায় আসিয়া বসিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভোরের বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন বাতির আলো নিভিয়া আসিয়াছে; ঊষার অতি স্নিগ্ধ নূতন আলোক জগতে সুপ্রভাত প্রচারিত করিতেছিল। চোখ মেলিয়া বাণী প্রথমে যেন কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে, এ কোথায় সে ঘুমাইয়াছিল? ঘরের চারিপাশে স্তবকে স্তবকে পুষ্পমাল্য দোদুল্যমান, বহু স্ফটিকাধারে এখনও অনুজ্জ্বল হেমপিঙ্গল-জ্যোতিঃ বর্ত্তিকালোক উৎসব রজনীর সাক্ষ্য দিতেছে। গন্ধদ্রব্যে কক্ষবায়ু যেন উদ্যানপবনের মত সুরভিভারাকুল। সে ভাল করিয়া চোখ মুছিল, —স্বপ্ন নয় ত? অদূরে বিচিত্র গালিচার উপর নীল মখমলে উজ্জ্বল স্বর্ণ রৌপ্য সূত্রে খচিত শয্যা। সেই বিছানার উপর চারিদিকে তেমনই স্বর্ণ-কমল পত্র ভ্রমর গ্রথিত তাকিয়ার সারি। আর এই ইন্দ্রাসনতুল্য আস্তরোণোপরি কে ঐ শুইয়া? বাণী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল।—যেন নীল আকাশের মাঝখানে সমুন্নতশীর্ষ শুভ্র রজতগিরি!—সে সহসা আর নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। অম্বর তখন ঘুমাইতেছিল, তাহার অনাবৃত বিশাল বক্ষে বাণীর স্বহস্ত প্রদত্ত ফুলের

মালাও প্রসুপ্ত। তাহার প্রশস্ত ললাট চন্দন-চর্চ্চিত ; নিঃশ্বাসভরে বক্ষস্পন্দনের সহিত সেই সুরভি সুষমা সমন্বিত সুবৃহৎ ফুলহার তালে তালে উঠিতে পড়িতে ছিল, তাহা হইতে মৃদু সুগন্ধ উঠিয়া যেন মন্দ মধুর ছন্দে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, বুঝি তাহারই সুরভি মধুর সঙ্কুচিত হৃদয়ের বার্ত্তা গোপনে সে প্রচার করিতেছে !—বাণী অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।—এই অম্বরনাথ ? এই তাহার স্বামী ? এই সমুজ্জল রক্তবস্ত্র পরিহিত মহাদেবতুল্য সৌম্য সুন্দর কান্তিমান্ পুরুষ—এই কি সেই লজ্জাভয় বিজড়িত দীন পুরোহিত ? কোথা হইতে চুরি করিয়া অথবা কোন দেবতার আরাধনা বলে সহসা সে এ অতুলনীয় রূপ যৌবন লাভ করিয়া আসিল ? সে কি উপকথার ছদ্মবেশী রাজপুত্র ? কিম্বা সে কোন অভিশপ্ত দেবতা বা গন্ধর্ব্ব ?

সুপ্ত অম্বরের মৃদু শ্বাস ঈষৎ দ্রুত বহিল, নীলিমা উপাধানতলে নিপতিত শুভ্র হস্তখানি ঈষৎ নড়িয়া উঠিল, সেই সঙ্গে অঙ্গুরীয়স্থিত সুবৃহৎ হীরক খণ্ডগুলা আলোক সম্পাতে ঝলমল করিয়া জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিল। সেই আলো বাণীর চোখে পড়ায় বাধ্য হইয়া সে দৃষ্টি নামাইল এবং মুহূর্ত্তে সে আপনাকে সংযত করিয়া লইল। একবারের জন্য তাহার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলেও, পরক্ষণে তাহার অত্যন্ত হাসি পাইল। সাজিলে গুজিলে কাহাকে না ভাল দেখায় ? অমন করিয়া সাজাইলে পথের দীনহীন ভিখারীটাকেও বোধ করি খুবই মন্দ দেখাইত না ?

প্রভাতে বিবাহের প্রধান কৃত্য কুশণ্ডিকা সমাধা হইয়া গেল। কুশণ্ডিকাই বিবাহ। কন্যা সম্প্রদানে ও গ্রহণে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। আজিকার ব্যাপার বাণীর পক্ষে সব চেয়ে ক্লান্তিকর। বিরক্তিতে পরিশ্রমে তাহার মুখ সিঁদুরের মতই রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এইটুকুই আশ্চর্য্য যে, সে আজ অনেকখানি সহিয়াও যাইতেছিল। কে

জানে কেন, গত কল্যকার সেই সর্ব্বময়ী মহারাজ্ঞী সদৃশ সগর্ব্ব চালচলন আজ আর সে ঠিক রাখিতে পারে নাই। কাল সেই-ই যেন চালাইতে ছিল, অম্বর চলিতেছিল—কিন্তু আজ তাহাদের পদ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ তাহার মনে হইল, অম্বর যেন তাহাকে পরিচালিত করিতেছে, আর সে যন্ত্র চালিতের মত চলিতেছে। বাণী রাগ করিয়া অপমান বোধ করিয়া থামিয়া যাইবে মনে করিল, কিন্তু পারিল না। অস্পষ্ট অথচ প্রবল একটা অনুভূতি যেন তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইতেছিল, অম্বরের আজ তাহাকে পরিচালিত করিবার অধিকার জন্মিয়া গিয়াছে! সে তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে কিন্তু যতক্ষণ নিকটে আছে, ততক্ষণ তাহার ইঙ্গিতটুকুও অবহেলা করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। কে যেন সেই মুহূর্ত্তে কঠিন একগাছা লৌহশৃঙ্খল দিয়া তাহার সর্ব্বশরীর আঁটিয়া আঁটিয়া বাঁধিতেছে, এমনি একটা রুদ্ধ চাপ সে নিজের সমস্ত দেহে ও মনে অনুভব করিয়া রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠিতে লাগিল! একবার তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রবল আত্মাভিমান জাগিয়া উঠিল। ক্রোধে উত্তপ্ত ও ক্ষোভে আরক্ত হইয়া সে মনে ভাবিল, জমিদার রমাবল্লভের মেয়ে আমি, আমায় লইয়া যে সে একজন বাঁদর নাচাইবে? এ আমি কোনমতেই সহিতে পারিব না। কিন্তু তখনই মনে হইল, তাহার পায়ে বেড়ি পড়িয়া গিয়াছে—চলিতে গেলে সে যেন হুঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবে—স্বাধীন-ভাবে চলিবার আর যেন তাহার উপায় নাই! তখন সে মনে মনে বড়ই অশান্তি উপভোগ করিতে লাগিল। মার প্রতি বড়ই ক্রোধ জন্মিল—মা-ই ত তাহাকে জুটাইয়াছেন!

তখন যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডে প্রত্যক্ষ অগ্নিদেবতা হবির্গন্ধে ঊর্দ্ধশিখ হইয়া প্রসন্ন-মুখে হাস্য করিতেছিলেন। যজ্ঞধূমে ও অগ্নিতাপে আরক্তগণ্ড বরের অতিশয় গৌর মুখে যজ্ঞেশ্বরের মত অনৈসর্গিক সৌন্দর্য্য প্রতিভাসিত

হইতেছিল। সে বারেক সেদিকে চাহিয়াই ঈষৎ ভ্রূকুটিভরে চক্ষু অবনত করিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে এক সুগভীর বেদমন্ত্র দেবতার বাণীরূপে বাণীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বশরীর যেন অস্পন্দ নিশ্চল করিয়া দিতে লাগিল,—ইহাকে সে এতটুকুও বাধা দিতে পারিল না। তাহার সমুদয় ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন সেই মহাশক্তিতে একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া গিয়া তাহাকে যেন একখণ্ড পাষাণে পরিণত করিয়া দিল। সে তখন মুগ্ধ হইয়া শুনিল, তাহার স্বামী বলিতেছেন,—

"ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তন্তেহস্তু।
মমবাচামেকমনা জুযস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিয়নক্তু মহ্যম॥"

বিংশ পরিচ্ছেদ

বাণীর বিবাহ চুকিয়া গেলে আরও দুইচারি দিন রাজনগরে কাটাইয়া মৃগাঙ্কমোহন নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেল। অতবড় সম্পত্তিটা যে তাহার বুদ্ধির দোষেই হস্তগত হইল না, সে জন্যে সে কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয় নাই, তাহার প্রকৃতির ইহাই একটা বিশেষত্ব।

দুপুর বেলায় রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—বাড়ী নিস্তব্ধ। কেবল রান্নাঘর হইতে হাতাবেড়ির ঠুন ঠান শব্দ আসিতেছিল। মৃগাঙ্কমোহন রোয়াকে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি গো!" সাড়া না পাইয়া রান্নাঘরের সম্মুখে গিয়া সে ভিতরে উঁকি মারিল; দেখিল গনগনে কয়লার চুল্লির উপর কড়া চাপাইয়া দিয়া একমনে অজা দুধ জ্বাল দিতেছে। মাথায় কাপড় নাই, ভিজা চুলগুলি পিছনে ফেলা, লম্বা চুলের শেষ প্রান্তে একটি গ্রন্থি দেওয়া। কাপড়ের আঁচলখানি কোমরে জড়ান; পদশব্দে সে চকিত হইয়া চাহিল,—হঠাৎ মৃগাঙ্ককে দেখিয়া

তাহার গাল দুইটি একটুখানি লাল হইয়া উঠিল। আঁচল টানিয়া মাথায় তুলিয়া সে আবার নতমুখে ফুটন্ত দুধে ঘন ঘন হাতা চালাইতে লাগিল; দুধ তখন উর্দ্ধে উথলিয়া উঠিতেছিল। মৃগাঙ্ক একটু দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিল; তারপর হাসিয়া বলিল, "ওগো, একবার চেয়ে দেখলে তোমার দুধ পড়ে যাবে না। এতদিন পরে ফিরলাম,—লক্ষ্যই নেই যে?"

অজা আঁচল দিয়া কড়া নামাইয়া বাটিতে গরম দুধ সাবধানে ঢালিতে ঢালিতে মৃদু মন্দ হাসিল; কিন্তু কথা কহিল না। মৃগাঙ্ক বলিল, "দিদি কোথায়? তুমি রাঁধছ কেন?—বামুনঠাকুরের কি হয়েছে?"

অজা কড়া হাতা সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "চলে গেছে।"

"কে চলে গেছে? দিদি?"

"উঁহু, তিনি উপরে শুয়ে আছেন; বামুনঠাকুর চলে গেছে।"

"কেন? দিদি ঝগড়া করে বামুনঠাকুরকে তাড়িয়েছেন বুঝি?"

অজা রান্নাঘরের তাকে মসলা পাতি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে আবার একটু মন্দ মধুর হাসিয়া উত্তর দিল, "না না, সে নিজেই গেছে। দিদির কলেরা হয়েছিল কিনা—সেই সময় ভয়ে সে আর সেই নিতাই চাকরটা দু'জনেই পালিয়ে গেছে।"

"দিদির কলেরা হয়েছিল! আমায় খবর দাও নি কেন? বেশ সেরেছেন ত?"

"সেরেছেন—" বলিয়া অজা জলের ঘটি তুলিয়া হাত ধুইবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রসন্নময়ী ভীষণ রোগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সবেমাত্র জয়লাভ করিতেছেন—এখনও সম্পূর্ণ জয় পরাজয় অনিশ্চিত। মৃগাঙ্কমোহন আসিয়া তাঁহার শীর্ণ শরীরে হাত বুলাইয়া বলিল, "কি হয়ে গেছ দিদি! আমায় একবার খবর দাও নি কেন?"

প্রসন্নময়ীর কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর এখন অতিশয় ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "তুই এসে আর কি করতিস্? খারাপ অসুখ। এর মাঝখানে তোর না আসাই ভাল। তা' যাই হোক, মৃগু, বাঁচি না বাঁচি, একটা কথা তোকে আজ আমি বলে রাখি ভাই, বউকে আর তুই অত করে হেনস্থা করিস্ নে—আহা ও বড্ড ভাল মেয়ে রে! অসুখের সময় এবার ও আমার যা করেছে, মায়েও তেমন পারে না—পেটের মেয়েরও সে কর্ব্বার সাধ্য নাই।"

মৃগাঙ্ক বলিয়া উঠিল, "তবু আমায় ওদের একথা লেখা উচিত ছিল, তা' যা' হোক বেঁচে উঠেছ যে—এই যথেষ্ট!"

"বাঁচি না বাঁচি, সে একই কথা। থাকতেও আপত্তি নেই, যেতেও নারাজ নই ;—কিন্তু যা হোক, মানুষের মেয়ে ঘরে এসেছে বটে! বিপদ্ না হলে যে বন্ধু চেনা যায় না, এবার তা আমি প্রত্যক্ষ দেখলাম।"

গিলা করা পাঞ্জাবির উপর ধব্‌ধবে কোঁচান চাদর ফেলিয়া মৃগাঙ্ক-মোহন বেড়াইতে বাহির হইতেছিল ; হঠাৎ কি ভাবিয়া রান্নাঘরের দিকে ফিরিল। দালানে বসিয়া অজা পান সাজিয়া স্তূপাকার করিয়াছে। বাবু বাড়ী আসিয়াছেন, মজলিস্ বসিবে, পানের প্রচুর আয়োজন রাখা দরকার। মৃগাঙ্ককে দেখিয়া সে মাথায় একটুখানি কাপড় টানিয়া দিল। মৃগাঙ্ক হাসিয়া বলিল, "কি বন্ধু! বন্ধুর কাছে আবার ঘোমটা কেন? দু'চারটে পান দাও দেখি কেমন পান সাজলে?—এ কি! এ, কত পান সেজেছ? আজ কি বাড়ীতে তোমাদের কোন ক্রিয়া কলাপ আছে না কি?"

অজা কিছু বলিল না, ঈষৎ হাসিয়া ডিবার খোলে গোটাকয়েক পান রাখিয়া দিয়া সুপারী কাটিতে লাগিল। মৃগাঙ্ক বলিল, "অমন হতশ্রদ্ধার দান নিই না। হাতে দিলে কি তোমার মান কমে যেত?"

অজা জাঁতি রাখিয়া চুণ-মাখান পানের উপর অঙ্গুলির ক্ষিপ্রগতিতে

কেয়া-গন্ধি খয়ের কেলিয়া যাইতে লাগিল ; মৃগাঙ্কর কথার কোন জবাব দিল না, অথবা তাহার হাতেও পান তুলিয়া দিল না। অগত্যা মৃগাঙ্ক নত হইয়া ডিবা হইতে পানগুলা তুলিয়া লইল। অজা নতনেত্রে কাজ করিতেছিল, মৃগাঙ্ক কিছুক্ষণ নীরবে তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটু-খানি হাসিয়া চলিয়া গেল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, অজা ত বেশ !—তা সেই ত বাণী ; অত বড় সুন্দরী বাণীকেও ত দেখিয়া আসিলাম, তাহার চেয়েই বা অজা কি এমন মন্দ ? বরং তাহার সেই অহঙ্কারে আদুরে ধরণের কাছে ইহার সলজ্জ ভাবটুকু যেন বেশী সুন্দর ! আমি স্ত্রী ভালবাসি নে, তবে অমন বন্ধুটি নেহাৎ মন্দ নয়। ওর সঙ্গে এবার হ'তে আর একটু ভাব করে চলতে হবে, অজার সঙ্গে আমার ব্যবহারটা বোধ করি তেমন ভাল হয় না।

সে রাত্রে বন্ধুবান্ধব আসিয়া সারেঙ্গ তবলা লইয়া বসিতেই প্রসন্নময়ীর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সেই সুর বেসুরের শব্দ লহরীতে পীড়িত হইয়া উঠিল। অজা 'অডিকলোন' জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া মাথায় কপালে পটি বসাইতেছিল, কাতর হইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "অত করে বাঁচালি ত বউ,—কিন্তু ঐ মুণ্ড হতভাগাই—দেখিস্ তুই,—নিশ্চয় আমায় খুন করবে। হতচ্ছাড়া বাড়ী ছিল না, ভালই হয়েছিল। আবার বলেন,—'খপর দাও নি কেন ?' খবর দিলে বোধ করি সেই দিনেই এসে আমাকে শেষ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন।"

অজা উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার কোমল শান্ত মুখ অকস্মাৎ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সে নিজের প্রতি শত অত্যাচার নীরবে সহিতে পারে কিন্তু অন্যের প্রতি এতটুকু অন্যায়ও তাহার সহ্য হয় না। আর ইহাতে যদি তাহার নির্লিপ্ততার প্রতিজ্ঞা টুটিয়া যায়—যাক তবে। এ যে অসহ্য ! তখনই সে ভৃত্যকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল, দিদির অসুখ বাড়িয়াছে শীঘ্র ভিতরে আসিতে হইবে।

সে দিন জহরা বাই মুজ্‌রা করিতে আসে নাই, বন্ধুর দল মাত্র ছিল। মৃগাঙ্ক ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল। দিদির প্রতি তাহার ভক্তির কিছুমাত্র অভাব ছিল না। সে মনে করিয়াছিল, দিদি ত অনেকটাই সারিয়াছেন, এখন একটু গান বাজনা করিলে আর ক্ষতি কি? কত দিন পরে ফিরিয়া আসিলাম।

অন্দরের দ্বারের নিকট অজা দাঁড়াইয়াছিল। মৃগাঙ্ক শশব্যস্তে প্রবেশ করিবামাত্র সে কঠিন স্বরে বলিয়া উঠিল, "বাজনার শব্দে দিদির মাথার যন্ত্রণা বেড়ে গেছে। এই কি গান বাজ্‌নার সময়?"

যে কখনও মুখ তুলিয়া একটা কথা কহে না, সে যদি অকস্মাৎ তীব্র ভৎ‍র্সনা করে, তাহা হইলে প্রাণে সেটা বড়ই লাগে—বড়ই লজ্জা দেয়। অজার সময়োচিত তিরস্কারে আজ মৃগাঙ্কমোহনের নিজ উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের প্রতিবিম্ব যেন তাহার মানস নেত্রে মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠিল। সত্যই ত! আমোদ আহ্লাদ ভিন্ন তাহার জীবনে যেন আর কোন গুরুতর কার্য্যই নাই। মাতৃকল্পা বড় বোন্ মুমূর্ষু হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছে, আর সে বন্ধু লইয়া বাহিরে প্রমোদনিশি যাপনে ব্যস্ত। লজ্জায় তাহার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। একটা ক্ষুদ্র বালিকা—এ সংসারে যে দুই দিনের আগন্তুক মাত্র—সেও তার চেয়ে তার পরম শ্রদ্ধেয়া দিদির জন্য বেশী ভাবে? ইহা ভাবিয়া লজ্জায় সে আজ যেন মর্ম্মাহত হইল। এই ঘটনার পরদিন বন্ধুবান্ধবগণ আর সান্ধ্য মজ্‌লিসে আমোদ করিতে আসিল না। প্রাত্যহিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া বাবুর খানসামা বিস্মিত হইয়া রান্নাঘরের ঝি নিস্তারকে ডাকিয়া বলিল, "বাবু মামাঘর থেকে এমন গোঁয়ার হয়ে এল কেন রে? দিব্যি গান বাজনা খাওয়া দাওয়া হ'ত, আমাদেরও কিছু পেসাদ টেসাদ মিলত; বেড়ে মজায় থাকা গিছ্‌ল।"

মৃগাঙ্ক স্ত্রীর কাছে তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, দিদি

একেবারে সারিয়া না উঠিলে আর বন্ধুদের এখানে আনা হইবে না। বন্ধুদের সে কথা বুঝাইয়া বলায় ক্ষুণ্ণ সহচরবৃন্দ অনেক বিদ্রূপ করিল। কেহ বলিল, "বুঝিয়াছি, বউ তোকে 'তুক' করেছে।" বউ যে তুক করে নাই ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অগত্যাই সে রাত্রিটা তাহাকে বন্ধুগৃহে যাপন করিতে হইল। প্রভাতে নিদ্রা ও নেশা ছাড়িয়া গেলে যখন সে ঘরে ফিরিল, তখন তাহার হঠাৎ বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। ঘরে রোগী। রাঁধিবার লোক অবধি নাই। একটি বালিকার স্কন্ধে সমুদয় সংসারের পর্ব্বত প্রমাণ ভার, আর সে নিশ্চিন্ত মনে পরগৃহে আমোদে মত্ত হইয়া রহিল! কোন দিকে না চাহিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। প্রসন্নময়ীর সাক্ষাতে যাইতে ভয় হইতেছিল, কিন্তু না গেলেও ত নয়। কি করিবে? বিলম্বে বিপদ বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না ইহা স্থির। কাজেই দুই চারি বার ইতস্ততঃ করিয়া চোরের মত সসঙ্কোচে সে গৃহে প্রবেশ করিল। অজা তখন তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতেছিল; তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া সে সরিয়া বসিল। তারপর মৃগাঙ্ক পাখা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস আরম্ভ করিতেই সে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। প্রসন্নময়ী মুখ ফিরাইয়া ছিলেন, মৃগাঙ্কের গৃহ প্রবেশ জানিতে পারেন নাই; পাশ ফিরিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া যথাসাধ্য গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে হতভাগা ছেলে, সারা রাত কোথায় ছিলি, বল্ ত?"

মৃগাঙ্ক মাথা নত করিয়া বাতাস করিতে লাগিল। দিদি তেমনি ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "না আসবি ত বলে গেলি নে কেন বাঁদর?— কচি মেয়েটা মুখে রক্ত উঠে যে মরে যায়। তোর প্রাণে কি একটু দয়া মায়ার লেশও নেই রে! অর্দ্ধেক রাত হাঁড়ি হেঁসেল নিয়ে বসে বসে বেচারী একেবারে হয়রাণ। আমি মলে, ওকে তুই খুন কর্ব্বি দেখচি।

এমন যদি কর্‌বি, তবে বিয়ে করেছিলি কেন? কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?"

মৃগাঙ্ক দেখিল, চুপ করিয়া থাকিলে দিদি ক্রমশঃ বাড়াইয়া তুলিবেন। বড় রোগটা সারিয়া আজকাল তাঁহাকে এই এক নূতন রোগে ধরিয়াছে। সে ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তা বিয়েও ত আর নবাব খাঞ্জাখাঁর বোন্‌কে করি নি, কানায়ে ঠেলাটা ওর সেখানেও বেশ অভ্যাস ছিল। আচ্ছা, আমি তবে স্নানটা সেরে নি —মাথাটা বড্ড গরম হয়ে উঠেছে ; বেলাও ত হয়ে গ্যাছে।"

নীচে নামিয়া চাকরকে স্নানের জল দিতে বলিয়া রান্নাঘরের দিকে আসিতেই সে দেখিল, অম্বাও গৃহে প্রবেশ করিতেছে। কোনদিকে দৃষ্টি নাই, বড় ব্যস্ত ভাব। নিকটে আসিয়া দেখিল, চুল্লির উপর ভাতের হাঁড়িতে টগবগ করিয়া ভাত ফুটিতেছে। সে আসিয়া একটা ভাত টিপিয়া দেখিল ও তৎক্ষণাৎ সেই প্রকাণ্ড হাঁড়িটার গলায় এক গাছা বেড়ি দিয়া চাপিয়া ধরিল।

মৃগাঙ্ক ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "আহা হা, কর কি, কর কি! পার্‌বে না,—পুড়ে খুন হবে যে!"

সে তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল ; সাগ্রহে বলিল, "থাম, থাম—আমি নামিয়ে দিচ্ছি।"

এই বলিয়া অম্বার হাত হইতে শশব্যস্তে বেড়িটা সে টানিয়া লইতে গেল! অম্বা তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, তুমি ছুঁয়ো না ; সব নষ্ট হয়ে যাবে।—আমিই নামাচ্ছি।"

মৃগাঙ্ক একটু থতমত খাইয়া বলিল, "কেন, আমি ছুঁলে নষ্ট হবে কেন?"

"তা হবে। তুমি সর। ভাত ধরে যাচ্ছে ; শেষকালে যে কেউ মুখে করতেও পারবে না।"

"তুমি কি কুণ্ঠিত ভাতশুদ্ধ অত বড় হাঁড়ি নামাতে পারবে ?"—মৃগাঙ্ক কারুণ্যপূর্ণ নেত্রে তাহার সুললিত ক্ষুদ্র হাত দুইখানির প্রতি চাহিয়া দেখিল, ততক্ষণে সে অবলীলাক্রমে হাঁড়িটা বেড়ির জোরে নামাইয়া ফেলিয়াছে।

হাঁড়ির মুখে ফেন গালিবার সরা চাপাইয়া দিয়া অজা কহিল, "আমি ত আর নবাব খাঞ্জাখাঁর বোন নই, আমার ভাত-টাত রাঁধা অভ্যাস আছে।" এই বলিয়া সে নতনেত্রে সাবধানে হাঁড়িটাকে গামলার উপর কাৎ করিয়া ধরিল।

মৃগাঙ্ক এক মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, কণ্ঠস্বর ও কথাগুলি তাহার নিজের। কিন্তু কেমন করিয়া সেগুলা এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তবে এই খোঁচাটুকু যে তাহার অঙ্গে বিঁধিয়াছে, ইহা না বুঝিতে দিয়াই কথাটা সে উল্টাইয়া ফেলিল। কহিল, "কাল রাত্রে না এসে বড় অন্যায় করেছি; না? খুব রাগ করেছিলে ?"

"আমি ?" এমনই সুরে অজা উত্তরটা দিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল যে, মৃগাঙ্ক তাহাতে অধিকতর লজ্জিত হইল। এই একটি 'আমি' কথায় সে যেন বলিল—তুমি রাত্রিতে বাড়ী ফির নাই, তাহার জন্য আমার রাগ করিবার কি কারণ আছে, যে রাগ করিব ? তুমি বাড়ী থাক,—বাহিরে যাও,—তাহাতে আমার লাভ লোকসানই বা কি ?—অথচ তাহার কণ্ঠে অভিমানে সুরও ছিল না। মৃগাঙ্ক ইহা বুঝিয়াই চুপ করিয়া চলিয়া গেল।

সেদিন আহারকালে অজা আসনের নিকট ভাতের থালা ধরিয়া দিয়া যখন রান্নাঘরে ফিরিতেছিল, মৃগাঙ্ক তখন হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "উঃ! যে গরম ভাত! এ কি কখন খাওয়া যায়? থাকৃগে, আজ আর না হয় খাবই না।"

অজা তাড়াতাড়ি একখানি পাখা আনিয়া ভাতের উপর বাতাস দিতে লাগিল। এমন করিয়া কখনও স্বামীর সম্মুখে সে বাহির হয় নাই বলিয়া প্রথমে ইহাতে তাহার লজ্জা বোধ হইতেছিল। কিন্তু তখনই সে মনে মনে ভাবিল, আহা! খাইতে বসিয়াছে, কষ্ট হইবে যে! না করিয়া কি করি?

ধীরে ধীরে আহার করিতে করিতে মৃগাঙ্ক বলিল, "বেড়ে রেঁধেছ ত! অনেক দিন এমন মাছের ঝোল খাই নি।—তা চড়চড়ি, অম্বল, সবই বেশ হয়েছে। কবে এত শিখলে?"

"আমাদের বাড়ীতে মা আর আমি রাঁধতাম, দেখে থাকবেন বোধ হয়? সেখানে রাঁধুনি বামুন ত নেই, বরাবর আমরা নিজেরাই রাঁধি। আমি যখন দশ বছরের তখন থেকেই একবেলা রান্না চালাতাম।"

মৃগাঙ্ক হঠাৎ আহার বন্ধ করিয়া অজার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঘামে কপালের চুলগুলি ভিজে গেছে যে!" বলিতে বলিতে সে বাম হস্ত দিয়া ললাট সংলগ্ন কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিতে গিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বাঃ! বাঃ! অজা, তোমার কি সুন্দর চুল!"

দ্রুত মাথা সরাইয়া লইয়া অজা মাথার কাপড়টা একটুখানি টানিয়া দিল। তাহার উভয় গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে পাখা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

মৃগাঙ্কমোহনের সেদিন মনের ভিতর কি যেন একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। সে নানা অছিলায় বার বার রান্নাঘর ও ভাঁড়ারের দ্বারে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। যতবার অজাকে দেখিল, ততবারই সে দেখিল—বাক্‌হীনা এক যন্ত্রের পুতুল ঘরের মধ্যে ঘুরিতেছে; আবার দিদির ঘরে গিয়া দেখে,—সেই মূর্ত্তি নিপুণ হস্তের সেবাদ্বারা রুগ্ন স্বভাবা দিদির কাতর শীর্ণ মুখে শান্তির প্রসন্নতা ফুটাইয়া তুলিতেছে। একসঙ্গে এমন ভাবে নারীকে—গৃহিণী, জননী ও সেবিকারূপে—সে আর কখনও

প্রত্যক্ষ করে নাই। তাই অজার এই তিনের সম্মিলন দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। অনাদৃতা পত্নীর স্বামীর প্রতি চিত্তে অভিমান পোষণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু অজার মুখে অভিমানের চিহ্নমাত্র নাই। কষ্টক্লান্তিহেতু অত্যধিক গাম্ভীর্য্য আসিয়াও তাহার অপরূপ লাবণ্যময় শ্রীকেও ত কৈ একটুকু ম্লান করিতে পারে না? এ কি মূর্ত্তি! এতদিন ইহাকে লইয়া সকলের সম্মুখে হাস্য পরিহাস করিয়াছি। এক দিনের জন্যও ত ইহাকে এতটুকু একটু যত্ন করি নাই। এই কথা মনে হইয়া তখন তাহার নিজের উপর বড়ই অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। চটুল চাহনি ও বিলাস লাস্য লীলারঙ্গে রঙ্গময়ী জহরাকে ইহার পার্শ্বে কল্পনা করিতে লজ্জায় আকণ্ঠ ললাট লাল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, ছিঃ, আমি কি মানুষ!

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার প্রলোভন বড়ই প্রবল। কিন্তু আজ নবজীবনের সূচনায় কঠিন শপথ করিয়া মৃগাঙ্কমোহন নিজেকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এ কাল সন্ধ্যাকে প্রত্যাখ্যান করিতেই হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া সময় কাটে? দিদি ঘুমাইতেছেন—ঘর নিস্তব্ধ। সেখান হইতে সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সরিয়া আসিল। রান্নাঘরে নূতন রাঁধুনি আসিয়াছে; সেখানটাকে যেন একান্ত শ্রীহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। চারিদিকে —ঘরে বাহিরে—ঘুরিয়া অবশেষে সে ছাদের উপর গিয়া উঠিল। সেখানে অস্তগামী সূর্য্যের বিদায় অভিনন্দন গোলাপী অক্ষরে সাজাইয়া প্রকৃতি দেবী বিষণ্ণনেত্রে চাহিয়াছিলেন; চারিদিকে ধীরে ধীরে অন্ধকারের নীরব বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠিতেছিল; সে দৃশ্য তাহার ভাল লাগিল না। ছাদ হইতে নামিয়া নিঃশব্দ পদে সে অজার কক্ষে প্রবেশ করিল।

কয়দিন দিবারাত্র প্রাণান্ত পরিশ্রমে ও অনিদ্রায় অজার শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। শুধু মনের জোরে কলের মত শরীরটাকে টানিয়া চালাইয়া ফিরিতেছিল; আজ একটুখানি ছুটি পাইবামাত্র বাঁধভাঙা জলের মত বহুদিনের সঞ্চিত অবসাদ তাহাকে ভাসাইয়া লইল। ক্লান্তভাবে বিছানায় পড়িয়া চোখ মুদিয়া ছিল। তাহাকে নিদ্রিত বোধে মৃগাঙ্ক একটু সাহস পাইয়া শয্যার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

অজা ঘুমায় নাই। কয়দিন পরে অবসর পাইয়া নীরবে নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিল। আজ এতদিন পরে তাহার স্বামীকে সে ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছে। নিজের হাতে ভাত বাড়িয়া কাছে বসিয়া খাওয়াইয়াছে। শুইয়া সে এই সব কথাই ভাবিতেছিল। স্বামী—স্বামীর কথা মনে পড়িতেই একটা আকুল নিশ্বাস তাহার বক্ষ মথিত করিয়া বাহির হইয়া আসিল—স্বামীই বা কে তাহার? বন্ধু—বন্ধুমাত্র! কিন্তু বন্ধু কি ইহাকে বলে? বরং শত্রু বলিলেও বলা যায়। অজা আবার সুস্পষ্ট গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। বিবাহের সময় সে তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে কত আশাই করিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, ঐ সুন্দর দেহের মধ্যে অমনই একটি সুন্দর হৃদয় লুকান আছে—সে হৃদয় আজ তাহার সহিত বিনিময় হইয়া গেল। এখন হইতে সে তাহারই। নিতান্ত আপনার ভাবিয়া তাই সে তাহার লজ্জাবনত নেত্রের গোপন কটাক্ষে মুহূর্তের জন্য দুই-একবার সেই ভালবাসিবার মত মুখখানি দেখিয়া লইয়াছিল, অমনি সেই সঙ্গে তাহার কুমারীহৃদয়ের প্রেমপুষ্পাঞ্জলি তাঁহার দুইখানি পায়ের নীচে নিবেদনও করিয়া দিয়াছিল। তারপর সেই কদিন কতবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সে ভয়স্পন্দিত হৃদয়ে লজ্জাজড়িত নেত্রে সুযোগ পাইলেই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে। লজ্জায় মুখ তুলিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া দেখার সুখেও বাধা ছিল না। আর কিছু

না হোক, পা দুইখানি ত চোখের সম্মুখে বিদ্যমান ছিল। সে কয়টা দিন তাহার বালিকাহৃদয় কি অপূর্ব্ব পুলকভরেই কম্পিত হইত—কি আশার রাগিণী কর্ণমূলে ঝঙ্কার দিত। নূতন জীবনের একটি চিত্র নূতন সাজে নূতন আনন্দে জীবনপ্রান্তে ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছিল। নববসন্তের সমাগমে প্রকৃতির বুঝি এমনি পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে? তারপর বসন্ত আসিবার পূর্ব্বেই তাহার সাজানো বাগানে কালবৈশাখীর একটা ঝাপ্টা আসিয়া সব যেন বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া গেল। সে বুঝিল, তাহার আশা দুরাশা মাত্র। সে সুন্দর হৃদয়খানির প্রতি লুব্ধ নেত্রে চাহিয়াছিল তাহা সুন্দর ত নহেই; এমন কি, হৃদয় বলিয়া সেখানে কিছু বর্ত্তমান আছে কি না—সে বিষয়েও তাহার চিত্তে ঘোরতর সন্দেহ জাগিয়াছিল।

সে এতদিন ধরিয়া তাহার যে পরিচয় পাইয়া আসিয়াছে, যে কোন রমণীর পক্ষে স্বামীর সে পরিচয় ভয়াবহ। বেশী আশা তাহার নাই। কিন্তু এত বড় নিষ্ঠুরতাও বোধ করি আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না? স্বামীর এই ঘোর অধঃপতন নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত পরের মত শুধু দুইটি খাইয়া পরিয়া এই ঘরে তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইবে। জোর করিয়া একটি কথা বলিবারও অধিকার নাই! সংসারে একটু স্থান থাকিলে এতখানি সে সহিতে পারিত কি না সন্দেহ। কিন্তু পিত্রালয়েও ত তাহার মা নাই—মমতাহীনা বিমাতার সংসারেই বা সে কোন্ সান্ত্বনার আশায় ফিরিয়া যাইবে?

স্থির করিয়াছিল, কাজকর্ম্মে স্বামীর সেবা করিয়া প্রাণের সেই ফুটনোন্মুখী আশার রাগিণী চাপিয়া এ জীবনটা এক প্রকারে কাটাইয়া যাইবে; তবু ত দিনান্তে ইহার শ্রীচরণ দেখিতে পাইবে—পিত্রালয়ে যে তাহা হইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে আজ কিসের সাড়ায় হৃদয়ে আবার

আশা নিরাশার সঙ্ঘাত বাধিয়া উঠিয়াছে? কেন আবার নববর্ষার আকুল জল কল্লোলের মত অধীর কামনারাশি হৃদয়কে তাহার উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। গরীবের মেয়ে কি শুধু দু'টি খাইতে—দু'খানা পরিতে পারিলেই সুখী? তাহার পিতা কি শুধু এই দুইটি দায় হইতে উদ্ধার পাইবার উদ্দেশ্যেই কন্যাদান করিয়াছিলেন? গরীবের মেয়ের প্রাণ কি ধনীকন্যার সহিত একেবারেই পৃথক?—সহসা কি একটা শব্দে সে চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, কে একজন বিছানার নিকট দাঁড়াইয়া আছে। সন্ধ্যার অস্ফুট আলোকে বুঝিতে পারিল—সে একজন পুরুষ। তাহার ঘরে এমন সময় কে আসিবে? ভয়ে তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "মা গো।"

মৃগাঙ্কমোহন তাহার বিস্ময় বুঝিয়া তাড়াতাড়ি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি অজা, আমি।"

অজা অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত উঠিয়া বসিল, বলিল, "তুমি? তুমি এখনও বেড়াতে যাও নি যে?"

"না! তোমার অসুখ করেছে বলে আজ আর বেড়াতে যাই নি। ডাক্তার ডেকে আনি?"

"ডাক্তার! না—না, ডাক্তার কি করবে?"

"ডাক্তার কি করবে? বলো কি? আমি অনেকক্ষণ থেকে দেখছি তুমি চোখ বুজে শুয়ে আছ, অথচ ঘুমোও নি! মুখখানাও ত দেখছি বড্ড শুকিয়ে গেছে।"

অজা লজ্জায় মুখ নত করিল। তবে অনেকক্ষণ সে এখানে দাঁড়াইয়া আছে! ভাগ্যে মানুষের মনের কথা বাহির হইতে জানা যায় না!

অসুখ ভিন্ন যে মানুষ এমন চুপ করিয়া শুইয়া সময় কাটাইতে পারে

—মৃগাঙ্কমোহনের ইহা ধারণাও ছিল না। সে অজার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিতে গেল ; বলিল, "জ্বর হয় নি ত ?"

"না—" বলিয়া অজা মাথাটা তাহার স্পর্শ হইতে সরাইয়া লইল।

মৃগাঙ্কর মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হ'লে অসুখ করে নি ?"

"না"

"ঠিক বল্‌ছ ?"

"সামান্য মাথা ধরেছে। ও কিছুই না !"

"তা হ'লে ডাক্তার ডাকাই ভাল।"

"না—না, মাথা ধরায় ডাক্তার ডাকা আমাদের সেখানে ত অভ্যাস ছিল না ! খুব বেশী জ্বর হ'লে তখনই ডাক্তার আস্‌ত।"

মৃগাঙ্ক একটু বিরক্তির সহিত হাসিয়া কহিল, "এখন ত আর সেখানে নেই, এখন এখানের মতই ব্যবস্থা হোক না।"

অজার চোখ মুখ দিয়া উত্তাপ বাহির হইতে লাগিল। হৃদয় তাহার অভিমানে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু সে একটিও কথা বলিল না। কারণ ব্যথা পাওয়াই তাহার অভ্যাস,—ব্যথা দেওয়া তাহার স্বভাব নয়। উথলিত অভিমান সযত্নে হৃদয়ে রোধ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "কোন দরকার নেই। ও এখনই সেরে যাবে। যাই দেখি, দিদি কি কর্‌ছেন।"

এই বলিয়া সে খাট হইতে নামিতে গেল। মৃগাঙ্ক সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "দিদি ঘুমাচ্ছেন, আমি এক্ষনি দেখে এসেছি। দেখ, আজ বেড়াতে গেলাম না। তা তুমি ত তাতে খুসী হও নি ! কৈ, কিছুই বল্‌লে না ত ?"

অজা মাথার বালিশের ঝালরগুলা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল ; মুখ না তুলিয়া তদবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করিল, "তারা এখানে আস্‌বে ত ?"

"যদি না আসে ?"

অজা অবিশ্বাসের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিল—"একদিনও না?"

"যদি একদিনও না আসে ?"

অজার দুই নেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—"তা হলে বেশ হয় !"

মৃগাঙ্কমোহন একটু সরিয়া আসিল, কহিল, "শুধুই বেশ হয় ? তুমি খুসী হও না ?"

"হই।"

"কেন ?"

অজার নেত্রে আনন্দের লহর ফুটিয়া উঠিল। সে ঘাড় নীচু করিয়া বলিল, "তা জানি নে, বোধ হয়—"

মৃগাঙ্ক ঈষৎ আগ্রহে খাটের ডাণ্ডা ধরিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল, কহিল, "থামলে কেন ? বোধ হয়—কি ?"

"বন্ধু তাই।"

"বন্ধু ! বন্ধু কি বল্‌ছ ? বুঝলাম না।"

অজা মৃদু হাসিল, সলজ্জে কহিল, "আমরা বন্ধু নই ?"

"ওঃ ! সেই কথা বল্‌ছ !" মৃগাঙ্ক হা হা করিয়া হাসিয়া প্রায় তাহার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িল।

অজা একটু সরিয়া গিয়া বিপন্নস্বরে বলিয়া উঠিল, "কেউ শুনতে পাবে যে ! আমি যাই।" এই বলিয়া ব্যস্তভাবে সে খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

মৃগাঙ্ক আরও সশব্দে হাসিতে লাগিল এবং তাহাকে গমনোন্মুখ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে পথরোধ করিয়া বলিল, "শুনতে পেলেই বা ! ক্ষতি কি ? যাবার জন্ত এতই ব্যস্ত কেন ? একটু দাঁড়ালে ক্ষয়ে যাবে না। আমিও ত বাঘ নই, যে টপ্ করে তোমায় খেয়ে ফেল্‌ব ! আচ্ছা শুনতে পেলে লোকে কি বল্‌বে, হ্যাঁ অজা ?"

অজা তাহার রকম দেখিয়া অপ্রতিভ হইল—একটু ভীতাও হইল। হঠাৎ এতটা ঘনিষ্ঠতার অর্থ কি? সহজ অবস্থা ত? সে সঙ্কোচে সরিয়া জড়সড় হইয়া বলিল, "লোকে ভাববে না যে—এরা সন্ধ্যা-বেলা অনর্থক এত হাস্‌ছে কেন?"

"বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে হাসে না? আচ্ছা হাসলে যদি তোমার নিন্দা রটে তবে না হয় আর হেসে কাজ নাই। তা হলে একটা কাজের কথাই বলি, শোন। মনে কর্‌ছি, দিন কতক একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক্।"

অজা দুই স্বচ্ছ সরল নেত্র তাহার কৌতুক দৃষ্টির সহিত মিলাইয়া কহিল, "আচ্ছা আমি সব গুছিয়ে রাখব। কি কি চাই বলে দিও।"

"শুধু ত আমি যাব না; সকলকেই যেতে হবে।"

"সবাই!" অজা বিস্ময়ের ভাবে তাহার দিকে চাহিল।

"হাঁ সবাই। অর্থাৎ তুমি, দিদি, বামুনঠাকুর, নিস্তারিণী, জগা, নিতাই সব।"

অজার নেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে স্থির কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু আমি ত যাব না।"

"কেন?"

"না।"

"কেন?"

"আমার ইচ্ছা নেই।"

"কেন ইচ্ছা নেই?"

অজা উত্তর দিল না; ঈষৎ আরক্ত মুখে সে দৃষ্টি নত করিয়া রহিল।

"আমার উপর রাগ করেছ অজা ?" বলিয়া মৃগাঙ্ক তাহার হাত ধরিল। "চল, দিনকতক বাইরে ঘুরে আসি। বাইরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরেরও পরিবর্ত্তন করে আসি। যাবে না ?"

ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া অজা দুই পা পিছাইয়া গেল ; তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান হইয়া গিয়াছিল ; তথাপি সে জোর করিয়া সেই মুখে ঈষৎ হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল,"বন্ধুর উপর কি বন্ধু কখন রাগ করে ?"

মৃগাঙ্কর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল—"তবে যাবে না কেন ?"

এবারও সে উত্তর দিল না। অঞ্চলবদ্ধ চাবিগুলা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

"বুঝেছি, আমার জঘন্ত চরিত্র বলে আমার সঙ্গে যেতে তোমার ঘৃণা বোধ হয় ?"

"ঘৃণা ! না, না, ঘৃণা নয়। ও কি কথা ? ও কথা বলো না।" অজার আর্ত্ত স্বরে মৃগাঙ্ক বিস্ময় বোধ করিল। সে ত্বরিত গতিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবেগপূর্ণ মিনতিভরে কহিয়া উঠিল, "সত্যি অজা, সত্যি বলছ, ঘৃণা হয় না ?"

"একটুও না। ঘৃণা হয় না।"

"তবে কি—ভয় হয় ?"

"হ্যাঁ, ভয় হয় বই কি! বন্ধুর উপর বন্ধুর কি কেবল ঘৃণা আর ভয় হয় ? আর কিছু হয় না ?"

মৃগাঙ্কর মুখে অনুশোচনাপূর্ণ বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল ; তাহার উপর একটা সলজ্জ আনন্দের মৃদু আলো দেখা দিল। সে তখন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি কষ্ট হয় ?" সঙ্গে সঙ্গে নিকটে দণ্ডায়মানা স্ত্রীর একখানা হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের দিকে ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া মৃগাঙ্ক ডাকিল, "অজা !"

অজা স্বামীর হস্তমুক্ত হইয়া অনেকখানি দূরে গিয়া দাঁড়াইল ; হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, তাই। কষ্ট হয় না ? বন্ধুর জন্য বন্ধুর মনে কষ্ট হয় না ?"

মৃগাঙ্কর আকণ্ঠ ললাট রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল ; সে সক্রোধে ভূমে পদাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "বন্ধু, বন্ধু ! কে তোমার বন্ধু ? অমন বন্ধুত্বে আমার দরকার নেই। ও ছাই বন্ধুত্বের খবর আমার চব্বিশ ঘণ্টা আর শুনিও না এই আমি বলে রাখ্‌ছি। আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু নই।" সবেগে দ্বার ঠেলিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

অজা গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। দেবতাদের পক্ষেও বোধ করি এ চরিত্র অজ্ঞেয় ! নিজেই বলিলে—বন্ধু ! এখন আবার সেই অঙ্গীকৃত বন্ধুত্বটুকুও স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক ! বেশ, তবে কাজ নাই। আর এ মিথ্যা বন্ধুত্বের ভাণ ত না করাই ভাল। হায়, দুর্জ্ঞেয় মানব চরিত্র ! তুমি যে কি—তাহা আজও বুঝিলাম না। কখনও এমন—দূর হউক—বন্ধু হউন, আর শত্রুই হউন, উনি আমার স্বামী—আমার দেবতা। আমি কোন্ হিসাবে উহার কার্য্যের সমালোচনা করিতে বসি ? নরকে পচিয়া মরিব যে। কিন্তু আজ, না—আজ যেন কি বদল হইয়াছে ! আমার কাছে আজ কি যেন আশা করিতেছিলেন। আমি কি কিছু অন্যায় করিলাম ? না, উনি ত নিজেই বলিয়াছেন, শুধু আমার বাপকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াই উনি নিশ্চিন্ত। আমায় ত উনি চাহেন না। তবে ? আজ হঠাৎ এত কাছে টানাটানি কেন ? ওঃ বুঝিয়াছি ?

অকস্মাৎ অজার বালিকাচিত্তের মধ্যে একটা সুমধুর সম্ভাবনার সলজ্জ স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া তাহার গোলাপী কপোল দুইটিকে রঞ্জিত করিয়া তুলিল। সেই মধ্যাহ্নের স্বেদজড়িত অলকদামে মৃদু স্পর্শ, আর সেই প্রশংসাসূচক বাক্য তাহার মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু সেই সঙ্গেই সুপ্রচুর আত্মসম্মানজ্ঞান তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, সে তাহার স্বামীর লালসা-

বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইবে না—ক্ষণিকের এ মোহ পাশে নিজেকে বাঁধিতে দিবে না। যদি কখনও সে যথার্থ স্ত্রীর সহধর্ম্মিণী হইতে পারে তবেই তাহার এ দেহ মন প্রাণ—সর্ব্বস্বই তাহার হৃদয় দেবতার চরণতলে সমর্পণ করিয়া আপনার নারী জীবন সার্থক করিবে। নচেৎ নহে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর রাত্রি কালরাত্রি। সে দিন স্বামী স্ত্রীর মিলনে স্ত্রীর দুর্ভাগ্য সূচিত হয়। সে রাত্রিটা বাদ দিয়া পরদিন ফুলশয্যা হওয়াই চিরদিনের বিধি। বাণীর মনে হইল, তাহার যখন সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের ভয় ডরই নাই, তখন তাহার জন্য এ বিধি নিষেধ প্রতিপালন না করিলেই ভাল হইত, তাহা হইলে অম্বরের আসাম যাত্রার কাল আরও একদিন নিকটবর্ত্তী হইতে পারিত।

পাকস্পর্শ প্রভৃতির কোনই বিড়ম্বনা নাই। কনেকে বরের ঘরে যাইতে হইবে না, কারণ বরের ঘরই ছিল না। কৃষ্ণপ্রিয়ার সাধ, মেয়ে অন্ততঃ একদিনের জন্যও শ্বশুরঘর করিতে যায়; তিনি খুব ঘটা করিয়া ফুলশয্যার তত্ত্ব পাঠান। তাই তিনি জামাইকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার ভাজ বাণীকে একবার দেখবেন না? ইচ্ছা হয় ত ওকে এক দিনের জন্যও ত সেখানে নিয়ে যেতে পারতে?"

অম্বর একটুখানি চুপ করিয়া রহিল। সে সাধ ক্ষণিকের জন্য তাহার চিত্তকে প্রলুব্ধ না করিয়াছিল, এমন নহে; কিন্তু সে ইহাও বুঝিয়াছিল যে বাণী সেই পল্লী-কুটীরে দরিদ্রা আত্মীয়ার নিকটস্থা হইতে নিজেকেই অত্যন্তই অবমানিতা জ্ঞান করিবে। তাই মুহূর্ত্তের সে লোভ সংবরণ করিয়া সে সংক্ষেপে উত্তর দিল, "এখন থাক।"

কৃষ্ণপ্রিয়া আর কিছু বলিলেন না ; ভাবিলেন, হয় ত আজ তেমন নয় ; তাই জামাই মেয়েকে সেখানে লইয়া যাইতে মত করিলেন না।

সেদিন ফুলশয্যা। বাবুদের বাগানের যে ফুলে মন্দিরের পূজা হয়, সে সকলে হাত দিবার কাহারও অধিকার নাই। তথাপি ফুলে ফুলে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছিল। ফুলের মোটা গোড়ে, ফুলের বিচিত্র তোড়া সকল নিমন্ত্রিতাই উপহার পাইয়াছেন। বাড়ীর ছোট মেয়েরা বিচিত্র সাজে সাজিয়া ইতস্ততঃ আতর, পান ও ফুল বিলাইয়া বেড়াইতেছে। সেদিন যেন রাজনগরের জমিদারগৃহে রাজপুতনার রাজগৃহের বসন্তোৎসবেরই অতীত স্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বাণী গা ধুইয়া পট্টবাস পরিয়া পূজা রীতি সমাধা করিয়া দেবপ্রণামান্তে নিরানন্দ-চিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। চতুষ্পাঠীর একটি ছাত্র এখনও মন্দিরের পুরোহিত। আত্মনাথ হঠাৎ সেই যে বড় ভারী রকমের নিমন্ত্রণ পাইয়া কোথাকার কোন ধনীগৃহে আত্মশ্রাদ্ধ মহাসভায় চলিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে এখনও সে ফিরিয়া আসে নাই। কাজেই নূতন পুরোহিতকে লইয়া বাণী কোন মতে পূজার কাজ সারিতেছিল।

সেদিনও তুলসী তাহাকে সাজাইতে বসিল। বাণী আজ আর তাহাতে তেমন বাধা দিল না। সে জানিত বাধা দেওয়া একেবারেই বৃথা। তুলসী ছাড়িবার পাত্রী নহে। রত্নের সহিত ফুল মিলাইয়া এক অপূর্ব্ব সাজে সে বাণীকে সাজাইয়া তুলিল। মেঘাভাব নীলাভ বসনের কিনারায়—স্বর্ণরৌপ্য মধ্যে মোতি মুক্তা ও চুনি পান্নার বাহার খুলিয়া পত্রপুষ্প ফল ধরিয়া স্বপ্নপুরের লতার মত এক বিচিত্র লতা লতাইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে নীলাকাশে তারকার ন্যায় চুমকি গাঁথা অসংখ্য ফুল আলোক সম্পাতে ঝকমক্ করিয়া চোখের দৃষ্টি ঠিক্‌রাইয়া যাইতেছিল। তুলসী নির্ব্বাক্ প্রশংসায় সেই মর্ম্মরগঠিত শারদ প্রতিমার দিকে

চাহিয়া রহিল। এ কি রূপ! এ রূপ নারীরই মন মুগ্ধ করে, পুরুষ ত এ সৌন্দর্য্যে সংজ্ঞাহারা হইয়া যাইবে। বাণী অন্যমনস্ক হইয়াছিল, হঠাৎ চোখ ফিরাইতেই সখীর মুগ্ধ দৃষ্টি তাহার চোখে পড়িয়া গেল, তখন দুই জনেই একটু হাসিল। পরে বাণী তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া ঈষৎ লজ্জার সহিত বলিয়া উঠিল, "এ কি, খেয়ে ফেল্‌বি না কি! অমন হাঁ করে আছিস্ কেন?"

তুলসী একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। তখন সে সুর করিয়া গান ধরিল—

"সাধে কি চাহিয়া থাকি?
হেরিয়া ও রূপরাশি,
ফেরে না এ পোড়া আঁখি।
যে সাজে সেজেছ আজ, এ যে গো সমর সাজ—"

বাণী হাসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, বলিল, "কথায় কথায় গান! আর ওসব ফাজলিমিতে কাজ নেই, ঢের হয়েছে, এখন থাম।" তাহার মুখের হাসি ক্রমে ম্লান হইল; শেষ দিকে ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস বহিয়া গেল।

মঞ্জরী নীরবে চাহিয়া দেখিল, কিছুই বলিল না। কোথায় যে ব্যথা বাজিতেছিল তাহা সেও বুঝিয়াছিল, তাই সহানুভূতিপূর্ণ চিত্তে মনে মনে ভাবিল, রাজার রাণী হইলেই এর যোগ্য হইত। তা না—এ কি ভট্‌চায্যি ব্রাহ্মণের স্ত্রী হইবার মত মেয়ে? বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা!

ফুলশয্যার অনেক প্রকার মেয়েলি আমোদ দেশপ্রচলিত। বাসর সঙ্গিনী মহিলাগণ বিবাহরাত্রির সাধ আজ মিটাইবার সুযোগ পাইয়া প্রসন্নচিত্তে প্রচুর আয়োজন করিয়াছেন। সে সব দেখিয়া শুনিয়া বাণী মনের মধ্যে গুমরাইয়া গর্জ্জিতেছিল। শেষে আর চুপ করিয়া থাকিতে

না পারিয়া মাকে গিয়া বলিল, "ও সব অসভ্য কাণ্ড করা হবে না। তুমি ওদের বারণ করে দাও।"

কৃষ্ণপ্রিয়া মৃদু হাসিলেন ; সস্নেহে কহিলেন, "বারণ কর্‌লে শুনবে কেন মা ; তা বিয়ের সময় সকলেই অমন করে থাকে। ওতে কিছু লজ্জা নেই।"

"সকলের যা হয়, আমার কি ঠিক সেই রকমই হচ্ছে যে, সব সেই মতই হবে ? সকলের কথা ছেড়ে দাও, বাড়ীর চাকর বামুনের সঙ্গে তাদের ত কারও আর বিয়ে হয় না। যার যেমন কপাল, তার তেম্‌নি ব্যবস্থা ! আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি মা, ও সব চলবে-টলবে না। তা হলে আমি বাবার কাছে গিয়ে শুয়ে থাকব। কে আমায় সেখান থেকে উঠিয়ে আনবে ? না হয়, বাবাকে সব বলে দেব ; আর বাবা নিশ্চয়ই তোমাদের মানা কর্‌বেন।"

কৃষ্ণপ্রিয়া বিরক্তস্বরে কহিলেন, "ওই আদরেই ত তোর পরকাল খেয়ে ফেল্‌লে। আচ্ছা বাপু বারণই না হয় কর্‌ব। কিন্তু তাতেও ওরা সবাই যদি না শোনে, তখন আর আমি কিছু জানি নে। কিন্তু একটা কথা তোকে বলে দি বাণী, জামাইকে তুই অযত্ন অপমান করিস্ নে। ও যে কি রত্ন, তা এখন না বুঝিস্, এর পর একদিন বুঝবি। আর যদি তা নাই হয়, তবুও স্বামী। স্বামীর চেয়ে বড়—জগতে মেয়েমানুষের আর কে আছে ? দেখ্‌ছিস ত, আমি কখনও আজ পর্য্যন্ত ওঁর কাছে মুখ তুলে একটা কথা কয়েছি, কি মুখের উপর একটি জবাব করেছি ?"

"ওঃ ; কিসে আর কিসে ? তোমার যেমন তুলনা দেওয়া ! চাঁদে আর বামনে ! আমার বাবার সঙ্গে—"

কৃষ্ণপ্রিয়ার নেত্রে ক্রোধাভাস জাগিয়া উঠিল, কহিলেন, "কেনই বা নয় ? বড়লোকে গরীবে সম্বন্ধও বদ্‌লে যায় না কি ? এই ধর, আমরা যদি গরীব হ'তাম, তোর বাপমার উপর ভালবাসা কম হ'ত কি ?"

"সে কথা আলাদা।" বলিয়া বাণী উঠিয়া গেল।

ফুলশয্যার প্রতীক্ষায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল; বর আসিল না। বার বার তার উদ্দেশে লোক পাঠান হইতেছিল; প্রত্যেক বারই খবর আসিল এখনও তিনি বাড়ী ফিরেন নাই। রাগ করিয়া—অভিমান করিয়া অনেকেই ঘরে ফিরিলেন। কেহ কচি ছেলের কান্নায় তাহাকে লইয়া শয়ন করিবা মাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। দুই-চারিজন শুধু অনাদৃত উপকরণ লইয়া জাগিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল; বলা বাহুল্য, তাহার মধ্যে তুলসীই প্রধানা।

অবশেষে বর আসিল। কৃষ্ণপ্রিয়া অম্বরকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া কহিলেন, "ওগো, তোরা আর দেরী করিস্ নে, বাছা বড় ক্লান্ত হয়েছে। ওপাড়ার নিমাই পণ্ডিতের মেয়েটির কলেরা হয়েছে, বাড়ীতে পুরুষ নেই, ও তার দেখাশোনা করছিল। এখন একটু কমেছে, আর পণ্ডিতও ঘরে ফিরেছেন, তাই দেখে ও এইমাত্র চলে এসেছে। বল্‌ছে শরীর খারাপ। এত রাত্রে কিছু খেতে চায় না। তা থাক্, কাজও নেই কিছু খেয়ে। শুধু সুতোটা হাত থেকে খুলে ঘুমোতে দে।"

শাশুড়ী চলিয়া গেলে চারিদিক্ হইতে একবার শেষ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষিত হইয়া অম্বরের গাম্ভীর্য্য বর্ম্মে ঠেকিয়া সমস্তই চূর্ণ হইয়া গেল, ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ নারীগণ অপ্রসন্ন বিষণ্ণতার মধ্যে নিয়ম কার্য্যটুকু সম্পন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বাণীর একবার ইচ্ছা হইল, সেও তাহাদের সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু অনেক কষ্টে এই ইচ্ছা সে রোধ করিয়া যথাস্থানেই বসিয়া রহিল।

সুসজ্জিত গৃহে কোমল শুভ্র শয্যাতলে অপূর্ব্ব সুন্দরী ষোড়শী পত্নীর পার্শ্বে উপবিষ্ট অম্বরকে আজ পৃথিবীর সম্রাটও বোধ করি ঈর্ষাপূর্ণ চক্ষে দেখিতে পারে! এত সুখ মানুষের ভাগ্যে কখনও দৈবাৎ ঘটে।

আলোক প্রতিফলিত বৃহৎ দর্পণে বাণীর সর্ব্বশরীরের যে প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার যেন কোথাও তুলনা নাই! মর্ম্মর-রচিত জীবন্ত প্রতিমা কিম্বা নন্দন-নিবাসিনী অপ্সরা, এমনই কি একটা নরলোকের অতীত সৌন্দর্য্যে ঘরখানা যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজ প্রতিবিম্বে নেত্রপাত করিয়া সহসা বাণী যেন সর্ব্বদেহে মনে শিহরিয়া উঠিল। তুলসী ভাল কাজ করে নাই। কেন সে এমন করিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিল? সে মনের মধ্যে একটু ভয় পাইল, যদি মঞ্জরী যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঘটে? অম্বর তাহার দিকে চাহিয়া হয় ত নিজের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া যাইবে। এখন ইচ্ছা করিলেই সে তাহা করিতে পারে, 'না' বলিবার ত তাহাতে কাহারও অধিকার নেই।—এ "সময়-সাজে" কেন সে সাজিতে রাজী হইল?

কিন্তু ইহাও সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, অম্বর গৃহে প্রবেশ করিয়া অবধি একবার তাহার দিকে অপাঙ্গেও চাহিয়া দেখে নাই। তাহার নেত্র প্রায় সর্ব্বক্ষণই আনত রহিয়াছে। যখন তাহার হাতের সুতা খুলিয়া দিল, তখনও সেই গ্রন্থিটি ভিন্ন আর কিছু লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাণীর দুর্ভাবনা একটু কমিয়া আসিল; তথাপি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে বুকটা দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ এ গৃহের সাম্রাজ্ঞী সে হইলেও এ ব্যক্তি তাহার প্রভু। তাহার উপর যেন ইহার একটা দখলী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে।

সকলে চলিয়া গেলে এই নির্জ্জন গৃহে নববিবাহিতা দম্পতী যখন একা রহিল, তখনই অম্বর একটু নড়িয়া বসিল। অমনই এক অসহায় ক্রোধে ও আতঙ্কে বাণীর সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। বিদ্যুচ্ছটার মত সেও তাহার বিপরীত দিকে মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই নিজের আচরণে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সে দেখিল, তাহার ভয় অমূলক। অম্বর

তাহার পার্শ্বে নাই, সে খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাণী ঈষৎ বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিল।

বাণীর দিকে না চাহিয়াই অম্বর কহিল, "অনেক রাত হয়ে গেছে, তুমি ঘুমোও। আমার খাটে শোওয়া অভ্যাস নাই, এখানে ঘুম হবে না। আমি নিজের ঘরে যাচ্ছি।"

এই কথা বলিয়া সে গমনোদ্যত হইলে হঠাৎ বাণীর কি মনে হইল। সে তখন একটু ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "এখনি বাইরে গেলে লোকে হয় ত দেখে কি মনে করবে। একটু পরেই যেয়ো—"

সকলে আসিয়া যে এখনই চারিদিক হইতে তাহাকে তাহাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিবে এবং চাহি কি, মা আসিয়া তাহাকে দোষ দিয়া আবার হয় ত তখনই অম্বরকে ডাকিয়া আনিবেন। ইহা মনে করিয়া সে এই অপ্রত্যাশিত মুক্তির আনন্দও ভালরূপে উপভোগ করিতে পারিল না।

এ কথা শুনিয়া গমনোন্মুখ অম্বর থামিল, কিন্তু সে ফিরিয়া আর খাটে বসিল না, নিকটস্থ একখানা মখমলমণ্ডিত আসন সরাইয়া লইয়া তাহাতেই উপবেশন করিল। তাহা দেখিয়া বাণীর বুকের মধ্যটা হাল্কা হইয়া গেল এবং কৃতজ্ঞতায় তাহার মন একেবারে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। যেটুকু সে চাহে—যাহা সে ইচ্ছা করে, ঠিক যেন সেই মনের লেখাটি পাঠ করিয়া এই নীরব উপাসক সেইটুকুই শুধু নিঃশব্দে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে। ইহাতে তাহার বিদ্রোহী চিত্ত বাধ্য হইয়াই তাহার পরে ঈষৎ কোমল হইয়া আসিল। তাই সে নিজের ব্যবহারের অসঙ্গতিও সহসা বুঝিতে পারিল এবং এই সঙ্গে মায়ের উপদেশটাও বুঝি বড় সহসাই মনে পড়িয়া গেল। চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখিল, অম্বর তাহার দিকে চাহিয়া নাই, সে ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গান একখানা বৃহৎ তৈলচিত্রে পঞ্চবটী-

কানন-কুটীরে সুখাসীন রাম সীতার মূর্ত্তির দিকে নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়া আছে। তাহার ঠিক সম্মুখে সেই বৃহৎ আয়নাখানা। সেই আয়নার মধ্যে তাহারই স্ত্রীর ভুবনমোহন মুখবিম্ব ফুটন্ত পদ্মের শোভায় বিকশিত রহিয়াছে। অদূরে শরীরিণীরূপে সে নিজেও বিদ্যমানা। তথাপি কোন দিকেই অম্বরের যেন বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই।

বাণী নীরবে অধর দংশন করিল। বুঝি মনে মনে একটু রাগও হইল, ঈষৎ হাসিও হাসিল; আবার অনেকখানি কৌতূহলও তাহার মনকে নাড়া দিতে লাগিল। অদ্ভুত মানুষ! এমন কখনও দেখি নাই—শুনিও নাই। সে বার বার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। সেই বাসরের 'রাজপুত্র!' প্রশস্ত ললাটে শিথিল কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ স্তবকে স্তবকে স্বতঃই সজ্জিত। তপ্ত কাঞ্চনসন্নিভ গৌর কান্তি, আয়ত নেত্রের শান্ত দৃষ্টি উজ্জ্বল ও মহিমাব্যঞ্জক। এ, বোধ করি, সে অম্বর নয়? মলিন বসন ম্লান কুণ্ঠিত মুখ—সে কি এই রাজার মত কান্তিমান্ তরুণ পুরুষ?

ঢং করিয়া একটা বাজিয়া গেল। বাহিরে লোক জনের সাড়া কমিয়া আসিতেছিল। অম্বর দৃষ্টি ফিরাইতেই বাণীর উৎসুক দৃষ্টির সহিত তাহা মিলিত হইল। সে মুহূর্ত্তে নম্রভাবে নেত্রপল্লব অবনত করিয়া লইল, বাণীর গাল একটুখানি লাল হইয়া উঠিল। কেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। এই সর্ব্বপ্রথম অম্বরের সান্নিধ্য তাহাকে যেন একটুখানি লজ্জিত করিল। প্রথমে তাহার মনে হইল, হয় ত তাহার এ সহজ ভাবটা বড় বেহায়াপনার মত দেখাইতেছে, কিন্তু সে মনোভাবের সে প্রশ্রয় দিল না; লজ্জা করিয়াছিল বলিয়াই জোর করিয়া সে লজ্জা ত্যাগ করিতে চাহিল; কুণ্ঠা ছাড়িয়া নিজেই প্রথমে স্বামীসম্ভাষণ করিল, বলিল, "তুমি কবে আগ্রাম যাবে?"

অম্বর একটুখানি নীরব থাকিয়া কহিল, "কাল।"

"কাল! কৈ, বাড়ীতে একথা কেউ এখনও শোনে নি ত?" এই বলিয়া বাণী বিস্ময় প্রকাশ করিল।

অম্বর ধীরস্বরে কহিল, "কাকেও ত এখন বলা হয় নি। বাবা শুধু জানেন। তিনি বাড়ীতে নিজেই কাল বল্‌বেন বলেছেন!"

"ওঃ!" বাণী একটু বিশ্বস্তভাবে নিশ্বাস লইল, তাহার পর বলিল, "মা হয় ত বাধা দেবেন। বল্‌বেন, এখন যেতে নেই।"

এই মন্তব্যে অম্বর মনের মধ্যে কোন প্রকার আঘাত পাইল কি না, তাহার মুখের ভাবে তাহা কিছু বুঝা গেল না। সে তেমনি সম্ভ্রমপূর্ণ সহজ স্বরেই কহিল, "তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে যে, না গেলে চল্‌বে না। কথা দেওয়া হয়ে গেছে, তারা আমার প্রতীক্ষা কর্‌বে। যাওয়া চাই-ই।"

যেমন অন্যের সহিত, তেমনি তাহার সঙ্গেও কথার ইঙ্গিতে—তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার ভিন্ন ভাব বা ব্যবধান আছে, ইহা সে প্রকাশমাত্রও করিতেছে না, বাণী ইহা লক্ষ্য করিল। অথচ সর্ত্তের প্রতি ইঙ্গিতটুকু পর্য্যন্ত কড়াক্রান্তিতেই সে পালন করিয়া চলিয়াছে। এই কি সেই মূর্খ পুরোহিত! যাহাকে অজ্ঞ, আহাম্মক বলিয়া লাঞ্ছনার সহিত সে বিদায় দিয়াছিল? বাণীর মুখ দাড়িম্ব কুসুমের ন্যায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় অম্বর উঠিয়া কহিল, "আমি এখন যাই। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে; তুমি ঘুমোও!" আর কিছু না বলিয়া কিংবা কিছু শুনিবার প্রত্যাশা পর্য্যন্ত না দেখাইয়া স্বাভাবিক ধীরপদে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বাণী তখন মাথার কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া বাতাসে হেলিয়া পড়িয়া মনে মনে ভাবিল, আঃ বাঁচিলাম! এতদিনে বিবাহ চুকিল। রাত পোহাইলেই ও চলিয়া যাইবে—একেবারে জন্মের মত নিশ্চিন্ত হইব। সে আর

কতক্ষণই বা? তারপর কিছুক্ষণ নিমীলিত নেত্রে শুইয়া থাকিয়া সে একবার চোখ চাহিল। সম্মুখেই সেই বৃহৎ দর্পণ—দর্পণে মায়াপুরীর রাজকন্যার মত তাহারই প্রতিবিম্ব! অলস নেত্রে সেই বিম্বময়ী তাহারই দিকে চাহিয়া দেখিল; চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।—সকলে বলে আমি সুন্দর! তা এই ছবিটাও ত খুব মন্দ দেখতে নয়? আচ্ছা, এ কি রকম লোক? একবার ভাল করিয়া চাহিয়াও ত দেখিল না! যেন সে আমায় গ্রাহ্যই করে না, এমনই উদাস ভাব।

মানুষের চরিত্র অতি দুর্জ্ঞেয়। যদি অম্বর তাহার ঔদাসীন্য ও গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া—বেশী কথা কি, তাহার কাছে একটু ঘেঁষিয়াও বসিত অথবা তাহার উপর মুগ্ধ দৃষ্টিটুকু মাত্র নিবদ্ধ করিত, তাহা হইলে সে ধৃষ্টতাটুকু সে যে কত বড় করিয়াই দেখিত এবং তাহার প্রতিফল দিতেই বা কতটুকু দ্বিধা করিত তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু তাহা না হইয়া যখন ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াইল, তখন মনও বুঝি সেই সঙ্গে বদ্‌লাইয়া গেল। অম্বরের আচরণে মন একদিকে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিতেছিল, অন্যদিকে আবার তাহার তেমনই অত্যধিক সতর্ক চেষ্টা, সেই সঙ্গে যেন নিজের আত্মাভিমানে ঈষৎ আঘাত দিতেও আরম্ভ করিয়াছিল। চিরপ্রশ্রয়প্রাপ্ত দারুণ অহঙ্কার ভিতর হইতে বলিতে চাহিতেছিল, আমি কি এতই নগণ্য যে আমার দিকে—আমারই স্বামী একবার চাহিয়াও দেখিল না?

তা বাণীরই বা দোষ কি? মানুষমাত্রেরই অমন হয়। মহাদেব যখন মদনভস্ম করিয়া তপস্যা বিঘ্ন দূর করিতে অন্যত্র গমন করেন, তখন তাঁহা-কর্তৃক অনীক্ষিতা উমার মনোভাব লইয়া কবি কহিয়াছেন—

"নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।"

বাণী উঠিয়া অঙ্গের পুষ্পাভরণ একে একে খুলিয়া ফেলিল, রত্নাভরণ মোচন করিল, তারপর বহুমূল্য বসন পরিবর্ত্তন করিয়া দীপ নিবাইয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে ঘুমাইতে পারিল না। কোন কারণ নাই, তথাপি অকারণে রাগে অভিমানে তাহার মনের ভিতরটা যেন কেমন এক প্রকার করিয়া উঠিতেছিল। একবার আত্মগত অস্ফুট স্বরে সে কহিয়া উঠিল, কাল চলিয়া যাইবে, বেশ হইবে, তাহাতে আমার কি? তারপর তন্দ্রাজড়িত অর্দ্ধজাগ্রত স্বপ্নে সে দেখিল, নীল মখমলের শয্যায় রক্ত উত্তরীয় মাল্যভূষিত উজ্জ্বল ভাস্কর মূর্ত্তি! আর দুই কর্ণ ভরিয়া এক গম্ভীর বেদমন্ত্র তাহার সকল শরীর অবশ করিয়া মেঘমন্দ্রে বাজিয়া উঠিল—

"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বারে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীর ছাদে বিছানার মোট ষ্টীল ট্রাঙ্ক ও বাসন-কোসন বোঝাই করা কাঠের সিন্দুক, আরও কত কি! যাত্রার আয়োজন হইলে গৃহিণী সংবাদ পাইলেন যে, জামাই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। কথাটা বিশ্বাসের মত নয় কিন্তু যখন স্বয়ং কর্ত্তা আসিয়া বলিলেন, "একটা রাঁধুনী আর একটা চাকর সঙ্গে নিতে বলছিলাম তা ও কিছুতেই রাজি হয় না। ছেলের সব ভাল, কেবল ঐ এক দোষ, বড় একরোখা। নিজের জন্য একটা মাসিক খরচা অবধি নেবে না। বলে, 'এতদিন যে ভাবে চলেছে—এখনও সেইভাবে চলবে।' এ কি

অনাসৃষ্টি কথা! এখন তুমি জমিদার হরিবল্লভের নাতজামাই, তোমার এখন সেই মত থাকা চাই ত।" তখন আর অবিশ্বাসের স্থান রহিল না। গৃহিণীর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "সে কি! অম্বরকে আজ আমি কোথাও যেতে দিতে পারব না। এ দুদিন কোথা রইল, কি খেলে, তার ঠিক নেই। তা ছাড়া এখনও বিয়ের আটটা দিন কাটে নি, এখনি ও কোথা যাবে?"

রমাবল্লভের যে জামাইয়ের প্রতি একটুও টান হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। তবে কৃষ্ণপ্রিয়ার তুলনায় তাহা অতি সমান্যই বলিতে হইবে। কারণ ইহার ভিতর ধনী দরিদ্রের মানাপমান পূর্ণমাত্রায় মিশ্রিত আছে, মাতৃ-হৃদয়ের ঐকান্তিক ও অকৃত্রিম স্নেহরাশি ইহার মধ্যে ত নাই। তাঁহার ইচ্ছা, আপাততঃ দরিদ্র পুরোহিত দিন কতক দূরেই সরিয়া থাকুক। তারপর সেখানে থাকিতে থাকিতে উচ্চ জীবনে একটু অভ্যস্ত হইয়া যখন ফিরিয়া আসিবে, ততদিনে লোকেও পূর্ব্বকথা অনেকটা ভুলিয়া যাইবে। তাহার অবস্থা ও মেয়ের মন উভয়ই একটু বদল হইয়া আসিলে সকল দিকেই একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারিবে। তাঁহার প্রথমকার অপমানের ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে বাণীর সেই পূর্ব্ব বিদ্বেষভাবের সহিত সহানুভূতিটা কতকাংশে কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে যখন খরচের জন্য টাকাকড়ি কিছুই লইতে রাজী হইল না, সবিনয় অথচ অনমিত দৃঢ়তায় পুনঃপুনঃই তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল, তখন তাঁহার মন এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যশাকাঙ্ক্ষাহীন, ঐশ্বর্য্যে কুণ্ঠিত, যে অর্থ জগতে সারাৎসার তাহাতে স্পৃহাশূন্য, নিষ্কাম নির্লিপ্ত স্বভাব এমন ত কাহাকেও দেখা যায় না? মাসিক দুইশত টাকা, একজন কপর্দ্দকহীনের পক্ষে কিছু খুবই সামান্য নয়। তাহার জন্য পরিশ্রম নাই, অসদুপায়ে তাহা উপার্জ্জন করিতে হইবে না, আত্মীয়জনের স্বেচ্ছা-দত্ত,

সনির্ব্বন্ধ উপহার! ঈষৎ বিরক্তি বোধ হইলেও মনে মনে তাহার উপর শ্রদ্ধাও জন্মিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া অনেক কাঁদিলেন, অনেক নিষেধ করিলেন, অবশেষে চোখ মুছিয়া নানা আপত্তির মধ্যেও যাত্রার উদ্যোগে ছোটখাট ঘটা বাধাইয়া তুলিলেন। ইচ্ছা থাকিলেও অম্বর তাঁহার দত্ত বহুমূল্য আসন, বসন, শয্যা, আভরণ ত্যাগ করিয়া যাইতে সক্ষম হইল না। লজ্জায় কপোল আরক্ত করিয়াও তাহাকে 'জামাই' সাজিয়াই বিদায় লইতে লইল। ভাগ্যে হাঁটিয়া ষ্টেশনে যাইতে হইবে না—তাই রক্ষা! নহিলে হয় ত ছেলের দল ক্ষেপাইত এবং পরাণে মহেশ প্রভৃতি তাহার বন্ধুবর্গ তাহাকে দেখিয়া সঙ্কোচে পথ ছাড়িয়া দিত। কিংবা বাবুদের জামাই ভিন্ন সে যে তাহাদেরই সেই অম্বর, তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না।

কৃষ্ণপ্রিয়া ক্রমাগত অশ্রু মুছিয়া চোখ মুখ রাঙা করিয়া তুলিয়াছিলেন, এখনও সে অশ্রু তাঁহার থামে নাই। প্রণত জামাতার মাথায় হাত দিয়া মৃদু ভগ্ন স্বরে অর্দ্ধস্ফুট আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া পাশের দ্বার দেখাইয়া তিনি কহিলেন, "ঐ ঘরে যাও।" বলিয়াই অধরে আঁচল চাপিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মাতৃ-হৃদয় তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া লুটাইতেছিল। এ কি কাণ্ড? এ যেন ঠিক সেই অভিষেকের দিনে রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন হইতেছে!

শাশুড়ী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেও অম্বর সহসা সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রথমে এ আদেশের মর্ম্মও সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু পরক্ষণেই গৃহমধ্য হইতে মৃদু অলঙ্কার শিঞ্জন তাহার সন্দেহকে সত্যে পরিণত করিয়া তুলিল। সে আশাপূর্ণ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে অপরাহ্নিক পুঞ্জ রক্ত মেঘের মত খানিকটা গোলাপী বসন দেখা যাইতেছে, আর তাহার মাঝখানে একখানি সুললিত

হস্ত বিশ্রাম শয়ান! সে চিনিল—এই ক্ষুদ্র রক্তোৎপলসন্নিভ হাতখানিই সে কতদিন দেব অঙ্গে চামর ব্যজন নিরত দেখিয়াছে। মন একবার অগ্রসর হইয়া আবার পিছাইয়া গেল। না, কাজ নাই! একটিবার জন্মের শোধ দেখা—তা নাই বা দেখিলাম?

ঈষৎ মুক্ত দ্বার আর একটু খুলিয়া গেল। তাহার মধ্য দিয়া একখানা মুখ মেঘান্তরাল প্রকটিত চন্দ্রের ন্যায় বাহিরের দিকে উঁকি দিয়া চাহিল। তখন সেখানে কেহই ছিল না, কেবল অদূরে মোহিনী দাসী ঝাঁটা হস্তে দালান ঝাঁট দিতেছিল। বাণী দ্বার বন্ধ করিয়া দিল; কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া কবাটে খিল লাগাইয়া সে জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। সে জানালা দিয়া নীচে বাগান ও বাগানের সীমানায় বৃহৎ দেউড়ি দেখা যায়। অল্লক্ষণ পরেই সে দেখিল, উদ্যান পথ বাহিয়া একখানি বোঝাই গাড়ি ফটকের দিকে চলিয়াছে।

চতুর্বিবংশ পরিচ্ছেদ

সেই শকটের মধ্যে একজন মাত্র আরোহী ছিল। আর কোচবাক্সে সরকার মহাশয় নিজের মাথায় নিজেই ছত্রধারী হইয়া বসিয়া গিয়াছেন। বাণী জানালার গরাদের উপর ললাট চাপিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া গাড়ীর ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু শকটারোহীর মুখখানা দূরত্ববশতঃ ভাল করিয়া লক্ষ্য হইল না; কিন্তু তথাপি সে সেখান হইতে অপসৃত না হইয়া তদবস্থাতেই রহিল। গাড়ীখানা এদিকে দেখিতে দেখিতে ফটক পার হইয়া রাস্তায় বাহির হইল ও ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং শকটচক্র ঘর্ঘরও ক্রমশঃই অস্ফুটতর ও শেষকালে একেবারেই অশ্রুত হইয়া পড়িল। তারপর বাণী যখন ফিরিয়া গৃহমধ্যস্থ আসনের সম্মুখে

আসিল, তখন তাহার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল স্থির নেত্রে একটু যেন বিষাদের মালিন্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিবাহ ব্যাপারটা চুকিলেই চিরনিশ্চিন্ত হইবে স্থির করিয়া মনে মনে যে সময়ের আগমন সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই ঈপ্সিত কাল ত এইবার সমাগত হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মন ত তাহার কই আজ কল্পনারূপ আনন্দে অধীর হইল না? সে মুখখানা শেষ দর্শনের বিফল প্রয়াসে তাহার শুভ্র ললাটপটে লৌহদণ্ডের রাঙ্গাছাপ চাপিয়া বসিয়াছিল, কল্পনা নেত্র সেই মুখখানাই যে তাহার অতি নিকটে অঙ্কিত দেখিতে লাগিল, ইহারই বা অর্থ কি? এমনও মনে হইল যে, ছুটিয়া গিয়া মাকে সে বলে, "মা, তুমি ওঁকে ফিরাও।" এই অতর্কিত ইচ্ছার আকর্ষণ হইতে নিজেকে জোর করিয়া ফিরাইয়া রাখিবার জন্য সে সেইখানেই একখানা আসন চাপিয়া বসিয়া পড়িল। ফিরাইবে? কেন? কেন ফিরাইবে? সে দূরে গেলেই তাহার পক্ষে ভাল নয় কি? সে ত এতক্ষণ ইহারই জন্য মনে মনে উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল।

হাঁ, ভাল বই কি। কে বলিবে যে ভাল নয়? সে ত কোনদিনই তাহাকে স্বামীর অধিকার দিতে পারিবে না। জমিদার রমাবল্লভের মেয়ে তাঁহারই পূজারীর স্ত্রী। এ যে অত্যন্ত ঘৃণার—অতিশয় লজ্জার বিষয়! ও গ্লানি যত চাপা পড়ে, ততই না মঙ্গল? বিশেষ যে প্রাণ মন সে গোপীবল্লভকে দান করিয়াছে—সে জিনিষ অন্যকে দিতে তাহার অধিকারই বা কি? গিয়াছে বেশ হইয়াছে। একটা নগণ্য পুরোহিতের জন্য তাহার মনে এক বিন্দু অভাব বোধ হওয়াও অত্যন্ত লজ্জার কথা। ইহা সে কোনমতেই হইতে দিবে না।

নিজের স্বভাবসিদ্ধ আত্মগরিমায় আপনার বিচলিত হৃদয়কে বাঁধিয়া সে আসন ত্যাগ করিল। কয়দিন তেমন করিয়া দেখা শুনার সুযোগ ছিল না। আজ রাত্রে ভাল করিয়া দেবতার আরতি করাইতে হইবে।

গায়েনদের ডাকিয়া সংকীর্ত্তন যাহাতে ভালরূপ জমে, তাহারও ব্যবস্থা করা চাই।—আর দাদাবাবু! বড় ফন্দি করিয়া তুমি তোমার রাধারাণীকে বাঁধিতে চাহিয়াছিলে! এইবার বল দেখি কে জিতিল? হিন্দুর সব ভাল কেবল এইটিই বড় মন্দ। বিবাহ করিতেই হইবে। কেন—এমন কঠোর নিয়ম, কেন? মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়া এতই কি মহাপাতক করিয়াছি যে, আমি জমিদার হরিবল্লভের পৌত্রী, আমাকেও একটা যাহার তাহার হুকুম বরদার হইতে হইবে? যিনি আমারই অন্নে প্রতিপালিত হইবেন, তিনিই হইবেন আমার প্রভু?

কিন্তু—তাই কি? কে আমার অন্নে প্রতিপালিত? বাবা যে বলিলেন, সে আমাদের একটি কপর্দ্দকও লইতে সম্মত নয়। অনেক অনুরোধে হিসাব করিয়া পথ খরচা ভিন্ন বাড়তি একটি পয়সাও যে সে লয় নাই। আশ্চর্য্য! গরীবের এত তেজ—এত মর্য্যাদা জ্ঞান? বাণীকে আজ অবাক্ হইতে হইয়াছে।

সে আবার বসিল। এমন ত আমি স্বপ্নেও আশা করি নাই! যেমন সবাই হয়, আমি তাহাকে তাহার চেয়েও কম মনে করিতাম। কিন্তু বোধ করি সে তা নয়। বোধ করি অনেকের চেয়ে সে ঢের বড়। অত যে নিরীহ ভাব, সেটা হয়ত উহার ভিতরের প্রচণ্ড তেজের আবরণ মাত্র। আর—তাহা যদি না হয়? তাহা হইলে সে নিতান্তই বোকা, অবুঝ, মূর্খ!—না, না, কি পাগল আমি! মোটে তা নয়—একটুও বোকা না। কি রকম সতর্কভাবে এতবড় কাণ্ডটা শেষ করিয়া সে চলিয়া গেল? অথচ কোন ছলে কাহাকেও জানিতেও দিল না যে, আমার সঙ্গে উহার এই চির-বিচ্ছেদের সর্ত্ত লইয়াই বিবাহ।—চির-বিচ্ছেদ? হাঁ—তাহা ভিন্ন আর কি? জন্মের মত সকল সম্বন্ধই ত আজ হইতে ফুরাইল।

বাণীর অজ্ঞাতে তাহার কণ্ঠমধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস জমিয়া উঠিয়া বুক-

খানাকে একটু যেন ভারী করিয়া তুলিল। সে ধীরে ধীরে তাহা বাহিরের বাতাসে মিশাইয়া দিয়া আবার ভাবিতে লাগিল, না—নির্ব্বোধ সে নয়, সে বেশ বুঝিয়াছিল, আমি তাহার প্রতি কতখানি অসন্তুষ্ট। আর প্রতিজ্ঞা রক্ষা? দেখিয়াছি, বিবাহের মন্ত্র বলার সময় যখন তখন আমার হাত ধরিতে কিংবা আমায় স্পর্শ করিতে হইয়াছে, কত সাবধানেই তখন সে তাহা স্পর্শ করিয়াছে। কাছে কাছে থাকিয়াও, আচম্কা একবারের জন্যও, তাহার কাপড়টুকু পর্য্যন্ত আমার কাপড়ে ঠেকে নাই। আচ্ছা, তবে কেন সে আমায় বিবাহ করিতে সম্মত হইল?

এইখানে বাণীর তরতরবেগে প্রবাহিত একটানা চিন্তাস্রোতে অকস্মাৎ বাধা পড়িল। এ যেন একটা হেঁয়ালি! অনেক ভাবিয়াও ইহার কিছু কূল কিনারা যেন পাওয়া যায় না। সে অর্থপ্রয়াসী নহে—তাহাকে কখনও পাইবে না ইহাও সে জানে, এবং তাহার দিকে নিজেকে এমন পূর্ণ সংযত রাখিল যে, পাইবার স্পৃহা কিছুমাত্র দেখাও ত গেলনা। তবে কিসের জন্য সে এই অদ্ভুত বিবাহ দ্বারা নিজেকে চিরদিনের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে সম্মত হইল? বাণী তাহার সহিত কখনও এমন সদ্ব্যবহার করে নাই যে, সেই কৃতজ্ঞতার মূল্য আজ সে দিয়া গেল। বরং কত লাঞ্ছিত অপদস্থই করিয়াছে। তবে? এ সমস্যা কে পূরণ করিবে? একটা জটিল জালের মতই এই অমীমাংসিত প্রশ্নটা তাহার মনের মধ্যে জড়াইয়া পাকগুলাকে দ্রুত বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে লাগিল। কেন? কিসের আশায় সে তাহার এই অস্বাভাবিক পণরক্ষা করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল? ইহা কি দয়া? মুহূর্ত্তের জন্য বাণীর মুখ চোখ ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। কি? দয়া!

কিন্তু হয় ত তাহাই! রাগ করিলে কি হইবে? তখন তাহারা সকলে মিলিয়া দয়ার প্রার্থীই ত হইয়াছিল। হয় ত দয়ালু সে; তাহাদের দশাই দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে এই উপকারটুকু করিয়া গিয়াছে। সে গম্ভীর

নিশ্বাস ত্যাগ করিল। দয়া ত মহতেই করিয়া থাকে। দয়ালুর তুলনায়, দয়ার্হ অনেক ছোট। সে ত তবে তাহার নিকট দয়ার মূল্যে বিকাইয়া গিয়াছে? আজ সে রাজনগরের জমিদার বংশের উত্তরাধিকারিণী সত্য, কিন্তু সে অধিকার এখন আর তাহার জন্মসূত্রে পাওয়া নয়—তাহারই দয়ার মূল্যে সে এই আবাল্যপ্রীতির আবাসে আজ স্থান লাভ করিতে পাইয়াছে।

বাণী সহসা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। এ সব তবে তাহার স্বামীর দান? সে-ই আজ তাহার ভরণ ভার গৃহীতা ভর্ত্তা? গোপীবল্লভ, এ কি অবস্থা ঘটাইলে? সেই মূর্খ পুরোহিত—পূজা বিধিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আত্মপক্ষ সমর্থনে একান্ত অপটু—সে-ই আজ—সে-ই আজ তাহার রক্ষাকর্ত্তা, তাহার অন্নদাতা, তাহার স্বামী? আর আজ সে তাহারই স-চেষ্ট ব্যবস্থায়—তাহারই আদেশে—জন্মের মত তাহার নিকট হইতে বহুদূরে নির্ব্বাসিত, এ জীবনে আর কখন ফিরিয়া আসিবে না!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

দিন পক্ষ মাস অতীত হইয়া গেল। গোপীবল্লভের মন্দিরে পুরোহিত আত্মনাথ ঘণ্টা বাজাইয়া পঞ্চ-প্রদীপ নাড়িয়া আরতি করে; বাণী নীরবে চাহিয়া দেখে। কিন্তু আত্মনাথ বেশ করিয়াই লক্ষ্য করে যে, বাণীর মন পূর্ব্বের মত আর ঠিক মন্দিরের মধ্যস্থলটিতেই নিবদ্ধ নাই। সে দৃষ্টি ভাবহীন, পুতুলের আঁকা চোখের দৃষ্টির মত। লোকে তাহা দেখে, কিন্তু নিজে সে কিছু দেখিতে পায় না।

আজকাল মন্দিরের মধ্যে বড় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ত্রুটি সম্বরণে একান্ত অসহিষ্ণু পুরোহিতকে সবিস্ময় ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়

করিয়া তুলিতেও ছাড়ে না। প্রায়ই দূর্ব্বাদলে ত্রিপত্রের স্থলে পঞ্চপত্র থাকিয়া যায়, কচিৎ ফুলের মালার মুখে গ্রন্থি দেওয়া থাকে না। আবার এমন অঘটনও কথন কখনও ঘটিতে দেখা যায় যে, আরতি পূজাকালে বাণীর শিথিল হস্ত হইতে সশব্দে ব্যজনী খসিয়া পড়িয়া পূজা রত পুরোহিতকে চমকিত করিয়া পূজায় বিঘ্নোৎপাদন করে। আত্মনাথ দেখিয়া দেখিয়া ভাবে, এ-সব কি? কিসের দুর্লক্ষণ?

বাণী পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া দেয়, পূজা দেখে, পূজা করে; কিন্তু এ সকল নিত্যক্রিয়ার মধ্যে আর যেন তেমন করিয়া সে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারে না। পূজার মন্ত্রে বাদ্যভাণ্ডে যথন মন্দিরাকাশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তথন সকল শব্দ-লহরীর মধ্য দিয়াও নিবিষ্টচিত্ত সাধক যেমন অনাদি প্রণবের অফুরন্ত অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি সমাহিত চিদাকাশে চির-ধ্বনিত শুনিতে পান, সেও তেমনি ইহার চিরপরিচিত শব্দের মধ্যে সেই একদিনের শোনা সুগম্ভীর বেদমন্ত্র স্পষ্ট শুনিতে পায়। সকল শব্দ ঢাকিয়া তথন উভয়কর্ণে শুধু বাজিতে থাকে, "মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু।" তাহার শিথিল অঙ্গুলি হইতে চামর খসিয়া পড়ে, চন্দনপাত্র কম্পিত করস্পর্শে উল্‌টিয়া স্থানচ্যুত হয়। সে লজ্জায় মরিয়া যায়। অপরাধের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠে। এ কি বশীকরণের যাদুবিদ্যা—না, মায়াবীর মায়া? মন্ত্রের এত শক্তি? সেই যে হোমানল পার্শ্বে যজ্ঞধূমাচ্ছন্ন গৃহাকাশতলে এই মন্ত্রোচ্চারণ শ্রুতি ঘটিয়াছে, সেই দণ্ড হইতে পলে পলে দিনে দিনে এ-কি অচ্ছেদ্য মহাশক্তির প্রভাব সে তাহার সর্ব্বশরীরে মনে তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে। এ যেন পর্ব্বত বক্ষস্থল বিদারী প্রচণ্ড বেগবতী নর্ম্মদার জলপ্রবাহ! রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই—অযুত বাধা কাটাইয়া সে আপনার গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাণী ভাবে, সেই দৃঢ় আদেশ কেমন করিয়া সে অগ্রাহ্য করিবে? সেই যে একচিত্ত, একহৃদয় হইবার জন্যে অলঙ্ঘ্য অনুজ্ঞা—তাহার সকল গর্ব্ব সমস্ত অহঙ্কারকে জাগাইয়া তুলিয়াও—বুঝি সে অনুশাসনের প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নয়। বেদমন্ত্রের এত বড় প্রভাব? এই কথাই সে দিনে রাত্রে অবাক্ হইয়া ভাবিতে থাকে।

এদিকে কৃষ্ণপ্রিয়াও জামাতার জন্য একান্ত ব্যাকুলচিত্তা হইয়া উঠিতেছিলেন। বিবাহ করিয়াই বাছা সেই যে দেশত্যাগী হইয়া গেল, তাহার পর বৎসর ঘুরিয়া গেল তবু ত সে ফিরিল না? ইহার অর্থ কি? ব্যগ্র হইয়া তিনি স্বামীকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁগা, অম্বর আমার কবে আসবে? তাকে ফিরিয়ে আন্ছ না কেন?"

রমাবল্লভও মুখ গম্ভীর করিয়া উত্তর দেন, "সে এখন আসবে কি? সেখানে তিনটে চতুষ্পাঠী খুলেছে। তার কত কাজ।"

একলা সে তিনটে টোলে পড়ায়! বল কি তুমি? এত খাটলে তার শরীরে কি কিছু থাক্‌বে?—ওগো, তুমি বাছাকে আমার—আমার কাছে আনিয়ে দাও।

অনেক কষ্টে কর্ত্তা বুঝান যে, সে নিজেই সকলকে পড়ায় না; অনেক ভাল ভাল পণ্ডিত জড় করিয়াছে, তাঁহারাই পড়ান। আর সে চতুষ্পাঠী সব একস্থানেও নহে, বিভিন্ন গ্রামে। সে তত্ত্বাবধান করে মাত্র।

কৃষ্ণপ্রিয়ার কিন্তু এ সংবাদে মনের অতৃপ্তি দূর হয় না। গরীব নয় যে খাটিতে গিয়াছে নহিলে স্ত্রী পরিবার খাইবে কি? তাহার কিসের দুঃখ? কি অভাবে সে এমন করিয়া এই বয়সে নির্ব্বাসিত হইয়া রহিল? মনে একটা বিষম সন্দেহ জাগে। শেষে একদিন থাকিতে না পারিয়া তিনি তাহার আভাস দিয়া ফেলিলেন। কন্যাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা

করেন, "অম্বরের চিঠি এল রে রাধারাণি ? মেয়ে সগর্ব্বে উত্তর দেয়, "আমি তার কি জানি !" সে দিনও যখন বাঁধা নিয়মে প্রশ্নোত্তর সমাধা হইয়া গেল, তখন আচম্‌কা কৃষ্ণপ্রিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুই বুঝি তাকে চিঠি লিখতে বা আসতে মানা করেছিস ?"

অকস্মাৎ মায়ের মুখে হৃদয়-বাণীরই এই প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠায় ঈষৎ চমকিয়া বাণী থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিল, "করে থাকি ত করেছি, খুব করেছি।"

তারপর আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে বিরক্তিপূর্ণ হাস্য করিয়া কহিল, "আমাকে কে চিঠি লিখল না লিখল, সেই ভাবনায় ত আমার ঘুম হচ্ছে না। তোমার যে কি হয়েছে মা, দিন রাত কেবল ঐ এক কথা ! আমি এখন যেন তোমার আপদ বালাই হয়েছি। কেবল ঐ একজনের দিকেই তোমার যত টান। বেশ বাপু, বেশ। তার চেয়ে তুমি সেইখানেই কেন যাও না। আমায় ত আর একটুও তুমি ভালবাস না।"

মা তাহার অভিমান স্ফুরিতাধর মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন, "তা বল্‌বি বই কি ! মা কি আর সন্তানকে ভালবাসে ? তাকে যে এত ভালবাসি, সে কার জন্যে রে বাণি ?"

আরও পাঁচ-ছয় মাস কাটিয়া গেল। একদিন প্রভাতে ডাকের চিঠি ও কাগজ পত্র আসিয়া পৌছিলে রমাবল্লভ কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো দেখ্‌চ, তোমার অম্বরের কত নাম হয়ে গেল।"

একখানা সংবাদপত্রে এইরূপ সংবাদ ছিল—"রাজনগরের বিখ্যাত ভক্ত জমিদার হরিবল্লভ রায়ের পুত্র রমাবল্লভ রায়ের একমাত্র জামাতা ও তাঁহার বিপুল বৈভবের অধিকারী অম্বরনাথ আসাম প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন চারিটি গ্রামে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী চতুষ্টয় সংস্থাপন করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে

এক উচ্চ আদর্শ স্থাপিত করিতেছেন। এদেশে এখন মর্ম্মরমূর্ত্তি বা টাউন-ক্লাব স্থাপনে যেটুকু উদ্যম দেখা যায়, সেটুকু সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি দেখা যায় না। তাই দেব-ভাষার প্রতি এই একান্ত অবজ্ঞা প্রকাশের দিনে ধনী গৃহ হইতে এই নিষ্ঠাপূর্ণ সাত্ত্বিক পূজার আয়োজন দেখিয়া যথার্থ আনন্দে ও আশায় চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠে। অম্বরনাথ, ন্যায় সাঙ্খ্য যোগ ও বেদান্ত—চারি বিষয়ে চারিটি চতুষ্পাঠীকে পরস্পরের তুলনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। নিজেও তিনি পরম পণ্ডিত। কিন্তু যথার্থ জ্ঞানীর প্রধান চিহ্নস্বরূপ তাঁহার সে পাণ্ডিত্য শান্ত সলিলা জাহ্নবীর ন্যায়ই স্থির ধীর প্রশান্ত। তাহাতে বাহ্যবীচি বিক্ষেপের পঙ্কিল আবিলতা নাই। উন্নত সুন্দর মূর্ত্তিতে, নিরহঙ্কার মধুরালাপে তিনি সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকেন। বিশেষ তাঁহার দরিদ্র প্রীতির যেন সীমা নাই! অথচ অনাথ আর্ত্তের পিতৃস্থানীয় অম্বর নিজে—সম্পদ-স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্বেও—দরিদ্র-জীবন যাপন করিয়া থাকেন। ইহাতেই তাঁহার সুখ এবং এইটিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব!"

কৃষ্ণপ্রিয়া উলটিয়া পালটিয়া একটা কথা পাঁচবার করিয়া—এই সংবাদটুকু আধঘণ্টা ধরিয়া পড়িলেন। পাঠকালে সগর্ব্বে আনন্দে তাঁহার চোখে জল আসিতে লাগিল। তবে না কি সে কিছু জানে না? বড় মূর্খ? বড় বোকা? বিদ্যায় আর বিদ্যা প্রকাশে বিস্তর প্রভেদ।

মেয়ের কাছে গিয়া পুলকিত স্বরে তিনি বলিলেন, "পড়ে দেখ রাধারাণি, লোকে তাকে কত ভাল বল্‌ছে। তুই-ই শুধু তাকে ভাল চোখে দেখলি নে—এই আমার বড় দুঃখ রয়ে গেল!"

বাণী সকৌতূহলে কাগজখানা তুলিয়া লইয়া তাহাতে নেত্রপাত করিতেই অম্বরের নাম দেখিয়া তাহা অগ্রাহ্যভাবে ভূমে নিক্ষেপ করিল। তাচ্ছল্যভরে কহিল, "তুমি থামো মা! ও সব মোসাহেবের দল থেকে

বিজ্ঞাপন বের করা বই আর কিছু না! পণ্ডিত? ওঃ, বড় ত পণ্ডিত! তাই একটা উপাধিও কেউ দয়া করে দেয় নি!'

কৃষ্ণপ্রিয়া এ উত্তরে মনে মনে অতিশয় চটিয়া গেলেন; কিন্তু ক্রোধের মুখে কথা কহা তাঁহার নিয়ম নহে; তাই চুপ করিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে বাণী কাগজখানা উঠাইয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া তাহা নিজের কাপড়ের মধ্যে লুক্কায়িত করিল; এবং একটা রুদ্ধদ্বার নির্জ্জন গৃহের মধ্যে লইয়া সংবাদটা বারকয়েক পাঠ করিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া রহিল। "দরিদ্র-জীবন যাপন করেন!"—আহা! বড় কীর্ত্তিই করেন! কেন? কি জন্য? *কি প্রয়োজনে? কে করিতে বলিয়াছে! এত তেজ! এত অহঙ্কার! শ্বশুর কি এতই পর? আমার বাপ কি তাহার কেহই নহেন? আর তাই যদি হয়, তা গরীব ব্রাহ্মণ ত চিরকাল পরের অন্নেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। দারিদ্র্য! উঃ, সে যে বড় কষ্ট! খড়ের চালের ঘর বোধ হয়। বৃষ্টির সময় ভিতরে হয় ত জল পড়ে? মোটা চালের ভাত কলায়ের দাল ভিন্ন দরিদ্রের আর কি-ই বা দুবেলা জুটে! তাই বা কে রাঁধিয়া দেয়? এখানে সাতটা রাঁধুনিতে রাঁধিতেছে, আর সে নিজে রাঁধিয়া খায়? হয় ত গরম ফেন পড়িয়া হাতে ফোস্কা উঠে।

সেই হীরকাঙ্গুরী-শোভিত অনতিস্থূল চম্পক অঙ্গুলি মনে পড়িতেই সে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সেই হাতে এখন আর সে অঙ্গুরী নাই—থাকা সম্ভবই নয়। সেই বিদায় দিনের শান্তিপুরে ধুতিই কি আছে? গুণচটের মত মোটা ময়লা কাপড় সে অঙ্গে একটুও যে মানায় না! তাহাতেই বা কি? কে দেখিতেছে? যাহা খুসী করিলে বারণই বা করিবে কে? অসুখ করিলে মুখে জল দিতেও বোধ করি কেহ নাই?

বাণীর বুক এক বিষম চাপে ভার হইয়া উঠিতে লাগিল—প্রশান্ত

সুন্দর মূর্ত্তি !”—তা সত্য ! সুন্দর ! খুব সুন্দর ! এত সুন্দর যে, পুরুষমানুষও হয়, এ ধারণা আমার কখনও ছিল না।—“পরম পণ্ডিত !” আচ্ছা, এইটা ত ঠিক বলা হইল না ? যদি তাই, তবে সেই বৈষ্ণব-নিষিদ্ধ কলে বৈষ্ণব-বিগ্রহের পূজা করিল কেন ? মিথ্যা কথা, সব মিথ্যা কথা—সব মিথ্যা—পাণ্ডিত্য উহাতে কিছু নাই। কিন্তু তাই বা কি করিয়া বলি ? সেও যে আমি এখন কিছু কিছু বুঝিয়াছি। ভাগবতেই পড়িয়াছি যে, দেবতায় কোন ভেদ নাই। শ্যাম ও শ্যামা এক, ইহা প্রতিপন্ন করিতেই তিনি রাধাকুঞ্জে শ্যামারূপ ধারণ করিয়াছিলেন। আমিই মূর্খ, আমিই অজ্ঞ, অহঙ্কারে জ্ঞানহীনা আমি, তাই সেদিন তাহাকে না বুঝিয়া অত বড় অপমান করিয়াছিলাম। গোপীবল্লভ ? বুঝিয়াছি, সেই পাপেই তুমি আমায় এই দণ্ড দিয়াছ। এমন করিয়া তুমি দ্রৌপদীরও দর্প চূর্ণ করিয়াছিলে। দেখি, আর কি লিখিয়াছে।—“জাহ্নবীর ন্যায় প্রশান্ত স্থির ধীর—” এ যেন একটু বেশী বাড়াইয়া লিখিয়াছে। আচ্ছা তাই বা কেন ? ‘প্রশান্ত’ বই কি। আর ‘স্থির ধীর’—তাই বা নয় কেন ? সে যে এতটা বিদ্বান, কে ইহা মনে করিতে পারিত ? আমি কি স্বপ্নেও জানিতাম যে, সে এত ভাল, এত বড় ?

উথলিত বেদনায় উদ্বেলিত হইয়া বহুক্ষণ বাণী সেই শয্যাতলে লুটাইয়া রহিল। মন্ত্রবীর্য্য-বশীভূতা সর্পীর ন্যায় তাহার অবস্থা ঘটিয়াছিল। একদিকে অদম্য আভিজাত্যাভিমান, অপর পক্ষে বেদমন্ত্রের মহাশক্তি—এই দুই প্রবল শক্তিতে আজ দেড় বৎসর কাল ধরিয়া ভীষণ সংঘর্ষ চলিতেছে। কেহ কাহারও কাছে পরাভূত হইতে চাহে না। কাজেই দীর্ঘকালব্যাপী মহাসমরে হৃদয়-প্রাণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিতেছিল। অহর্নিশি বিবেক ও অহঙ্কারে মহাদ্বন্দ্ব চলিতেছিল। বিবেক বলে, কেন এমন করিলি ? নিজেও মরিলি, আমারও কুযশ রহিল।—আবার অহঙ্কার

সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া উত্তর দেয়, রহিল ত রহিল! তাই বলিয়া এতবড় একটা জমিদারের মেয়ে পুরোহিতের দাসী হইবে না কি? —বিবেক যদি বলে, তা দাসীই বা কেন? স্ত্রী কি দাসী? সেবায় ত নিজেরই সুখ। তা যদি সে সুখ না পাও—নাই করিতে। একেবারে ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জ্জনটা—

অহঙ্কার বুক ফুলাইয়া উঠে, বেশ করিয়াছি! আমার ঠাকুরকে দেহ মন দিয়াছি, মানুষ ইহা স্পর্শ করিবে? তাহাতে আবার সেই ভাতরাঁধা বামুন—আচ্ছা না হয়, পূজারীবামুনই হইল, তফাৎ আর কতই? এই একটি সাফাইয়ের জোরে সে নিজের কাছে একটুখানি সান্ত্বনা লাভ করিয়া থাকে।

কিন্তু সহসা একদিন এ অহঙ্কারেরও পরাজয় ঘটিল। একদিন কথকতার কালে অকস্মাৎ আদ্যনাথের মুখ দিয়াই বাহির হইল," দেবপ্রতিমায় প্রতিষ্ঠা মন্ত্রে আমি আবির্ভূত হই; কিন্তু হে নারদ, মানবদেহ প্রতিমায় আমি অনুক্ষণ বিরাজিত। অতএব নরদেবতায় আমার রূপ কল্পনাপূর্ব্বক আমার পূজা করিলে, নিশ্চয় জানিও আমাকেও পাইবে। পিতৃরূপে, মাতৃরূপে, স্বামী-মূর্ত্তিতে আশ্রিত পুত্র-কন্যাদিরূপী মানবগণ চৈতন্যরূপী আমাকেই অনুক্ষণ ভজনা করিতেছে; তাঁহাদের স্থূল রূপের পূজা করে না।" অন্ধকারে পথভ্রষ্ট পথিক অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-স্ফুরণে চমকিয়া যেমন মুহূর্ত্তে পথরেখা স্থির করে, বাণীর পূর্ণসংশয় স্থলেই এই উত্তর যেন দেবতার প্রেরণারূপে তেমনি আলো জ্বালাইয়া দিল। যিনি মন্দিরে দেবপ্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত, তিনিই ত এই মানবশরীরে বিদ্যমান। তবে ত অম্বরের সেই কথা, সেই মত—সেও ত অহিন্দু মত নয়। সেও ত আত্মা ও পরমাত্মাকে একত্বই দিয়াছিল। আর—তবে দেবতার পূজা দ্বারাই শুধু ত তাঁহার প্রসন্নতা লাভ সম্ভবে না। মানবের অপমানে ত তাঁহারই অপমান ঘটিয়া

থাকে। জনক জননী আর স্বামীরূপে তিনিই পূজা গ্রহণ করেন? সে যে তাঁহারই এক মূর্তিকে তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাঁহার মধ্যে ভগবৎ-কল্পনায় ত কৈ পূজা করা হয় নাই? হায়, ঘরের দেবতাকে দূরে সরাইয়া দিয়া সে আর কাহাকে পাইতে চাহে?

সেদিনকার কথার আর এক বর্ণও তাহার কানে ঢুকিল না। সে মন্ত্রজপের মতই বার বার এই শব্দ কয়টি মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল। যদি প্রতিমায় তাঁহার পূজা করি, তবে মানুষের মধ্যেই বা না করি কেন? সকল কর্ম্মের মাঝখানে সেই একই তান সেদিন তাহার প্রাণের তারে বাজিতে লাগিল। বেদমন্ত্র যদি মৃৎশিলায় দেবত্ব আনয়ন করিতে পারে, তবে সেই মন্ত্র মানবের মধ্যেও সেই শক্তির বিকাশ করিয়া তুলিতে কেন না পারিবে? না পারিবে কি, পারে। নিজে সে প্রত্যক্ষদর্শী। মন্ত্রের যে কি প্রভাব তাহা সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। যে মন্ত্র মাটি কাঠ খড় রাংতাকে এক মুহূর্ত্তে বিশ্ববরেণ্য বিধাতায় পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ, তাহারই বলে সকল দ্বেষ ঘৃণা অবহেলা —মৈত্রী প্রীতি ভক্তি সম্ভ্রমে কত অল্পকালের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা শুধু ভুক্তভোগিগণই অনুভব করিতে সমর্থ। অন্যে কি বুঝিবে। আবাহনমন্ত্রে শিবলিঙ্গে এ যেন রজতগিরিসন্নিভ বিশ্বনাথের আবির্ভাব!

বাণী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। হিন্দুর মেয়ে যে স্বামীর সহিত হাসিমুখে কেমন করিয়া জলন্ত চিতায় পুড়িয়া বিচ্ছেদের শান্তি করিত আজ তাহা বুঝিলাম। এ যে কি অচ্ছেদ্য বন্ধন! ইহার কঠিন পাশে বাঁধা পড়িলে আর দেহমন বলিয়া কিছুই জ্ঞান থাকে না। সেই যে কালমন্ত্র—"মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু"—সেই অনুজ্ঞার সম্মোহনবিদ্যা প্রভাবে লুপ্তচৈতন্যবৎ হইয়া পত্নী সেই দিনই পতির হৃদয়ে হৃদয়, চিন্তায় বাক্যে চিন্তা বাক্য সমস্তই সঁপিয়া দেয়, তাহার আর স্বাতন্ত্র্য কিছুই বাকি

থাকে না। তবে সে কেন এই শরীরের যন্ত্রণাটুকু সহিতে পারিবে না? শরীর যে মনেরই আজ্ঞানুবর্ত্তী ক্রীতদাস মাত্র।

রাত্রে কৃষ্ণপ্রিয়া দেখিলেন, বাণী মন্দির হইতে ফিরিয়া আইসে নাই। সংবাদ লইয়া জানিলেন, আরতি হইয়া গিয়াছে, সংকীর্ত্তনও শেষ হইয়াছে। তবে একা সে কেন রহিল?

জননী উদ্বিগ্ন চিত্তে স্বয়ং কন্যার উদ্দেশে গিয়া মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া খুলিতেই বিস্ময়ে স্তম্ভিতা হইয়া গেলেন। শ্বেত মর্ম্মরতলে লুটাইয়া সে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণপ্রিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মাথার কাছে বসিলেন। এ কি! তাঁহার সোণার কমল এমন করিয়া আজ ধূলিলুণ্ঠিত কেন? মার প্রাণ কি এক অজানা বেদনায় আকুল হইয়া উঠিল। মুখ নত করিয়া তাহার ঘুমন্ত মুখখানার দিকে গভীর স্নেহপূর্ণ নেত্রে তিনি চাহিয়া দেখিলেন। মুদিত নেত্র-পল্লব অশ্রুজড়িত। চোখের নীচে অশ্রুবিন্দুটি তখনও স্থূল মুক্তার ন্যায় টল টল করিতেছে। কৃষ্ণপ্রিয়ার চোখও এ দৃশ্যে ছল ছল করিয়া আসিল। কেন এ অশ্রু? এ দুইটি পদ্মপলাশ অনেক শিশির বর্ষণে অভ্যস্ত, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু সে গাছের শিশির ত পৃথিবীর বুকেই নিত্য ঝরিয়া পড়ে। আজ মায়ের বক্ষ ছাড়িয়া তাহা নীরবে পাষাণ-শয্যা ধৌত করিতেছে কেন? ইহা ত অভিমানাশ্রু নহে—এ অশ্রু যে বেদনার। মেয়ের মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া তিনি ডাকিলেন, "রাধারাণি!"

"মা!" বলিয়া বাণী চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিল।

"এখানে পড়ে কেন, মা আমার? মনে কি কোন কষ্ট হ'য়েছে?"

বাণী তখন আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছিল, তাড়াতাড়ি হাত দিয়া অশ্রু মুছিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, "তুমি বুঝি আমায় খুঁজতে এসেছ? দেখছিলাম তুমি কি কর!"

কৃষ্ণপ্রিয়া স্পষ্টই বুঝিলেন, মেয়ে তাঁহার কাছে আত্মগোপন করিতেছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজেই জামাইকে তিনি একখানি পত্র লিখিলেন—"তুমি কবে আসিবে? তোমায় দেখিবার জন্য আমরা সকলেই উৎসুক। শীঘ্র আসিও।"

কয়েকদিন পরে উত্তর আসিল—"আপনার আদেশ পালনে বিলম্ব হইবে মা! এখন বড় বেশী কাজের ঝঞ্ঝাট। এক্ষণে এস্থান হইতে যাওয়া সম্ভব নয়—সন্তান বলিয়া মার্জ্জনা করিবেন।"

কৃষ্ণপ্রিয়া মনে মনে ভাবিলেন, লক্ষণ শুভ নহে। ভিতরে নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে। কর্ত্তাও যেন সেটা জানেন, নহিলে এমন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। জানি না, মেয়েটার ভাগ্যে কি ঘটিবে!

দিন কাটিতে লাগিল। বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশে শরতের চাঁদ পূর্ণ শোভায় দেখা দিয়া, শারদোৎসব সমাগত-প্রায়—এই সমাচার বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে; এমন সময় একদিন রাজনগরের জমিদার-গৃহে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়া গেল। আকস্মিক ভীষণ রোগে কৃষ্ণপ্রিয়া সোণার সংসার শ্মশান করিয়া মহাপ্রস্থানে চলিলেন। স্বামী সম্পদ ও সন্তানে পরিবৃত হইয়া রোগভোগহীন এ মরণ রমণীমাত্রেরই ঈপ্সিত সন্দেহ নাই। কিন্তু মৃত্যুর এই অতর্কিত আগমনে আত্মীয় স্বজনগণের পক্ষে যে একান্ত মর্ম্মান্তিক বেদনা ও পরিতাপের বিষয়। ভাল করিয়া সেবা যত্ন, খেদ মিটাইয়া চিকিৎসা—কিছুই হইল না। অকস্মাৎ ঝড় উঠিয়া যেন ভরা পালের বোঝাই নৌকাখানাকে উল্টাইয়া দিয়া চলিয়া গেল; সতর্কতার সময় বা উপায় কিছু মিলিল না।

মরণ নিশ্চিত হইয়া গেলে পূর্ণসংজ্ঞ কৃষ্ণপ্রিয়া সকলকে ক্ষণেকের মত বিদায় দিয়া কন্যাকে একবার একা কাছে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহার সে অন্তিম ইচ্ছা তখনই পূর্ণ করা হইল। বাণী ঠোঁটে

ঠোঁট চাপিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল। সকলে চলিয়া যাইতেই সে মায়ের বুকের উপর আর্ত্তভাবে লুটাইয়া পড়িল।—"কত কষ্ট তোমায় দিয়েছি যে মা! সে সব কথা মনে করে আমি কেমন করে প্রাণ ধর্‌ব?" এই বলিয়া দুই হাতে সে মায়ের গলাটা জড়াইয়া ধরিলে জননী তাহার ললাটে গাঢ় চুম্বন করিলেন। তার পর কৃষ্ণপ্রিয়া অজস্র অশ্রুধারে অভিষিক্ত বাণীর মুখখানা তাঁহার শীতল বক্ষের উপর শিথিল হস্তে ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া তাহার উপর দুই জ্যোতিহীন নেত্রের সুগভীর স্নেহদৃষ্টি নিবদ্ধ কবিয়া তেমনি স্নেহ সান্ত্বনায় কহিলেন, "কোন কষ্টই কখন দাও নি মা! তোমায় পেয়ে কি নিধি পেয়েছিলাম, তা কেবল সেই তিনিই জানেন—যিনি আমার শূন্য বুকে তোমায় পাঠিয়েছিলেন। তোমাদের রেখে যেতে পার্‌চি, এর বাড়া আর সুখ কি? আজ আমায় শেষ চিন্তা থেকে শুধু মুক্ত করে দে—আমায় বল্ বাণী, অম্বর কি আর আস্‌বে না?"

মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় বাণীর সারা প্রাণ তখন ফাটিয়া যাইতেছিল! মা আজ জন্মের মত তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়াছেন। আর কিছুক্ষণ পরেই তাহাব এই সর্ব্বদোষক্ষমা সর্ব্বংসহা সর্ব্বানন্দময়ী জননী এ পৃথিবীতে থাকিবেন না। ইহা কি মনে করিতেও পারা যায়? সে দুই হাতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া পাষাণবিদারী স্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "না মা, সে আর আস্‌বে না মা! তুমিও আমায় ছেড়ে চল্‌লে? না মা, তুমি যেয়ো না—ও মা, যেয়ো না মা! যেয়ো না মা!"

"ছি মা, এ সময় কি আর মায়ায় ফেল্‌বার চেষ্টা করে? থাকা-যাওয়া ত কারও হাত-ধরা নয় মা! ইচ্ছা থাক না থাক, ডাক পড়লেই যেতে হবে। কেন সে আস্‌বে না? আমায় বল্ বাণী! সে ত তেমন নয়? তুই কি তাকে আস্‌তে বারণ করেছিস্?"

তখন আপনার শোকাহত হৃদয়ের মর্ম্মভেদ যন্ত্রণা রোধ করিয়া বাণী মুখ তুলিল, কহিল, "আজ আর তোমার কাছে কি লুকোবো মা! বারণ কেন, প্রতিজ্ঞা করিয়েছি, এ জীবনে কখনও আর আমার সঙ্গে তার দেখা হবে না।"

"ভাল কর নি রাধারাণি! বড় অন্যায় করেছ। তা হোক্, ছেলে-মানুষ, না বুঝে করে ফেলেছ, তার ত আর চারা নেই। আমায় সব কথা বল্‌লে কোন্‌দিন এ সব মিটে যেত? আমার শেষকালের আশীর্ব্বাদ রইল—সে তোমায় ক্ষমা কর্‌বে। তুমিও তাকে ডেকে ক্ষমা চেয়ো।"

বাণী এতক্ষণ কোন মতে নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়াছিল, আর পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে কহিল, "সে হবে না মা। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি যে, এ জন্মে কেউ কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না।"

"স্ত্রীলোকের স্বামীত্যাগের প্রতিজ্ঞা আবার প্রতিজ্ঞা কি? যা করেছ, তাতে মহাপাতক হয়েছে। আজন্ম তার সেবা করে, চির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়ে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করো। সে বড় ভাল। একদিন তুমি বুঝবে যে, সে কত ভাল! তখন মনে করিস্‌, মা ঠিকই বলেছিল। কেঁদো না মা! এঁকে একবার ডেকে আন। আমি গেলে উনি বড়ই কাতর হবেন। তুমি আছ—সর্ব্বদা দেখবে, জানি। তবু সেই দশ বছর বয়স থেকে আজ একাদিক্রমে সেই ছাব্বিশ-সাতাশ বছর, একদিনের জন্ম কখনও ছাড়াছাড়ি হয় নি। যাবার দিনে মনটা তাই বড় খালি খালি বোধ হচ্ছে!···এসেছ? মাথায় পায়ের ধুলো দাও—আবার যেন তোমায় পাই। বড় সুখী হয়েছিলাম। তোমায় পেলে আবার পরলোকেও ঠিক তেমনি সুখীই হব।···বাণীকে দেখো; অম্বরকে ফিরিয়ে এনো। জেনো স্বামী ছাড়া মেয়েমানুষের অন্য কিছুই বড় নয়। অন্য সুখ, অন্য কামনা,

এমন কি অন্য দেবতাও তার থাকতে নেই। এই শিক্ষাই ওকে দিও।... এখন একটু হরিনাম শোনাও। রাধারাণি! একটু গঙ্গাজল মুখে দে। তুই শুধু আমার মেয়ে ন'স্—মা, আমার ছেলেও ত তুই, এবার তোর শেষ কাজ কর্।"

ভোরের আলো না ফুটিতে সদাহাস্যধ্বনিমুখরিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ গম্ভীর শোকোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া বুকফাটা ক্রন্দন উঠিল। সে হাহাকারের একমাত্র স্ফুটধ্বনি শুধু "মা, মা, মা!"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রসন্নময়ী রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া একটু চলা-ফেরা আরম্ভ করিতেই অম্বা তাহার পূর্ব্বাধিকৃত প্রদেশেই সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিল। প্রসন্নময়ী ভাঁড়ারের দ্বারে বসিয়া উপদেশ দেন, সে ভিতরে বসিয়া তরকারি বানায়। রন্ধনশালার দ্বারে প্রসন্নময়ী পিঁড়ি পাতিয়া দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া বসিয়া লুচির লেচি কাটিয়া দেন—সে আপনি বেলিয়া ভাজিয়া লয়। মৃগাঙ্ক বড়ই বিপদে পড়িল। অম্বার সহিত সহজে সাক্ষাৎ হয় না; হইলেও সে যেন পাশ কাটাইতে পারিলেই বাঁচে; কথাবার্ত্তার সুযোগ দিতে চাহে না।

একদিন আহারে বসিয়া মৃগাঙ্ক বলিল, "দিদি, এই কাহিল শরীরে তুমি ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ—এ কি ভাল হচ্চে? আবার পাল্টে পড়লেই ত মুস্কিল।"

দিদি খোরা-পাথরে গরম দুধ ঢালিয়া পাখার হাওয়ায় সে দুধ জুড়াইতেছিলেন, বলিলেন, "রোগকে ভয় করি নে ভাই, ভয় তোদের ডাক্তার বদ্যিকে! রোগ হলে যে তোদের কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে মর্‌ব তার ত যোটী নেই। রাজ্যের বড়ি পাঁচন গিলিয়ে বাঁচিয়ে

তুল্‌বি। তাই ভয় হয়। না হলে হিন্দুর ঘরের বিধবার আবার রোগ মরণে ভয় কি !"

মৃগাঙ্ক হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা যখন মর্‌তেই পাবে না, তখন মিছে কেন রোগে পড়বে ? কেন চিরকালই কি তোমায় খাটতে হবে নাকি ? আর কি কেউ কিছুই পারে না।

প্রসন্নময়ী এখনও সে প্রাণান্ত সেবা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তাই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ও কথা বলিস্ নে। আমি আর কি করি ? সেই ত এখন সংসার মাথায় করে রেখেছে। আমি এই যা তোর খাবার কাছেই একটু এসে বসি ; বলি—এক্‌লাটি খাবি ? কি চাই—না চাই, একটু দেখতে হবে ত।"

"না, না—সে সব ঠিক হয়ে যাবে। সেজন্য তুমি কেন ব্যস্ত হও ? কাল থেকে রাত্রে আর নীচে নেমো না।"

"পাগল হয়েছিস্ ! যতক্ষণ আছি, তোর এতটুকু অসুবিধে সইবে না ! এমন ঠুঁটোর বাঁদর হয়ে বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল।"

মৃগাঙ্ক ক্ষুব্ধচিত্তে আহার সমাধা করিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল, দিদিরা একটু কম ভালবাসিলে এক এক সময় বড় মন্দ হয় না। কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বাইরের ঘর বড় ঠাণ্ডা ; নতুন হিমের সময়টা সর্দ্দিতে মাথা বড় ভার হয়। ডাক্তার ঘোষ বলে গেলেন, একটা গরম ঘরে শুতে। তাই মনে কর্‌ছি, নবীনদের বাড়ী আজ শুতে যাব। ওদের ওখানে অনেকগুলো ঘর খালি পড়ে আছে।"

ভাই রাত্রে বাড়ীর বাহির হয় না এ সংবাদ প্রসন্নময়ীর অজ্ঞাত ছিল না। তিনি কয়দিন ধরিয়াই ভাবিতেছিলেন, বউয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিই। আবার ভয় হইতেছিল যে, যদি এই প্রস্তাব আবার তাহার মনে বাহিরের স্মৃতি টানিয়া আনে ? না—কাজ নাই !

যেমন দিন যাইতেছে যাক্। হয় ত অল্পে অল্পে আপনিই সব হইবে। ভাইয়ের এখনকার প্রস্তাবে তাঁহার সদা-শঙ্কিত চিত্ত তাই ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। এ বুঝি আবার বাহির-টানের এক নূতন ফন্দি! ব্যস্ত হইয়া তিনি কহিলেন, "ঘরের আবার এখানে অভাব কি? কেন, বউ যে ঘরে শোয়, সেটা ত খুব ভাল ঘর। আমি এখানে সব ঠিক করে দিচ্ছি, দাঁড়া। বৌ—অ বৌ, শুনে যাও—"

মৃগাঙ্কের বড় লজ্জা করিতে লাগিল। দিদি কি ভাবিলেন, কে জানে! সে কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গিয়া কিছু পরে চোরের মত পা টিপিয়া সেই প্রস্তাবিত কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে প্রদীপে তেলের আলো জ্বলিতেছে, খাটে মশারি ফেলা। আনন্দোদ্বেলিত বক্ষে সে গৃহে প্রবেশ করিল। দিদির পায়ে একটা প্রণাম করিয়া আসিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছিল। ব্যাপারটা যে অকস্মাৎ এমন সহজ হইয়া যাইবে, এ আশা তাহার একবারও মনে জাগে নাই। কিন্তু বড় যে লজ্জা করিবে, সেই বা কি বলিবে, না জানি?

সহসা খাটের মধ্যে নজর পড়িল—বিছানায় একজনের মত মাথার বালিশ দেওয়া আছে। মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইয়া ফিরিতেই সে দেখিল সম্মুখে অম্বা। তাহার হস্তে একটা জলপূর্ণ গ্লাস। সে বোধ করি এই ঘরেই সেটা রাখিতে আসিতেছিল। এই অতর্কিত সাক্ষাতে হয় ত দুইজনের বক্ষেই শোণিতস্রোত একটু বেগে বহিয়া গেল।

অম্বা গ্লাসটা দ্বারের সামনে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিতেছিল; দাঁতে দাঁতে চাপিয়া তীক্ষ্নস্বরে মৃগাঙ্ক ডাকিল, "শুনে যাও।"

তারপর ক্রোধ দমন করিয়া সহাস্যমুখে সে কাছে আসিল; কহিল, "কি গো? ভূত দেখেছ না কি? আহা, পালাও কেন? এসোই না, একটু গল্প সল্প করা যাক্।"

অজা নতমুখ উত্তোলন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে গেল কিন্তু সাগ্রহদৃষ্টিতে সে তাহারই মুখের দিকে ঠায় চাহিয়া আছে দেখিয়া তাহার দৃষ্টি আপনিই নামিয়া আসিল। মনশ্চাঞ্চল্য গোপন করিয়া মৃদু হাসিয়া সে কহিল, "আমার এখন মরবার সাবকাশ নেই, তা গল্প করব কি? চারিদিকে অনেক কাজ বাকি—যাই।"

"ভারি ত কাজ—ছাই কাজ। সে হবে না। বড় যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াও? আমি ও সব চালাকি বুঝি গো বুঝি। তুমি আমার উপর রাগ করেছ—না?"

"না—" বলিয়া অজা যেমন ফিরিতে গেল, অমনি তাহার স্বামী অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিল।

"বুঝেও কি তুমি বুঝবে না অজা?"

অজা হাত ছাড়াইয়া লইল, কহিল, "এ আবার কি? আমি এ সব ভালবাসি নে—"

মৃগাঙ্কমোহনের মুখ মুহুর্মুহুঃ আরক্ত ও ম্লান হইতেছিল। সে কাতর-ভাবে আর একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, "আমি তোমার কাছে মহা অপরাধী, সত্য সে কথা। তাই বলে কি আর সে দোষ ক্ষমা করা যায় না? দেখ, তোমার জন্যই আবার মানুষ হব মনে করেছি।"

অজার শান্ত নেত্রে গভীর আনন্দের আভাস ফুটিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে—স্বামীর কণ্ঠলগ্না হইয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল—এত ভাগ্য কি আমার হইবে?

কিন্তু না, ব্যস্ত হইলে চলিবে না—বাঘ বশ করিতে ফাঁদও বেশ দৃঢ় হওয়া চাই। যদি যথার্থ-ই তাঁহার সেই ভাব মনে জাগিয়া থাকে, তবে একদিন, দুইদিন বিলম্বে চলিয়া যাইবে না—আর তা যদি না হয়, তবে সে ক্ষণিকের নেশা ছুটিয়া যাওয়াই ভাল। এ অবস্থা একরূপ

সহিয়া গিয়াছে, একদিনের রাজভোগের পর, চির-দারিদ্র্য যে আরও অসহ্য হইবে!

দৃঢ়স্বরে সে কহিল, "আমি তোমার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ সে ত তুমি জানই! আমার বাবার তুমি মস্ত উপকার করেছ, আমাকেও খেতে পরতে দিচ্ছ। আমার মনে তোমার উপর একটুও রাগ নেই। তুমি আর আমার বন্ধুত্ব চাও না বলেছিলে কি না, তাই আজ কাল আর দেখা শোনা করি নে। চাও যদি তা হলে—"

রাগে জ্বলিয়া মৃগাঙ্ক কহিল, "না, না—আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই নে। তোমার খুসী হয় তুমি রাগ করো, খুসী হয় করো না। আমি কি তোমায় কৃতজ্ঞ হ'তে, কি রাগ না করতে কখনো বলেছি? ইচ্ছা না হয়, আমার সঙ্গে তুমি দেখাশোনাও করো না, তাতেও আমার বেশ দিন কাটবে। যাও, তুমি যাও। এখনই যাও। আমার তার জন্য কিছুই আসে যায় না।"

অজা নিঃশব্দে চলিয়া গেলে সে তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাতে বাহির হইয়া আসিয়া ব্যগ্রস্বরে ডাকিল, "শেনে, শোন—এসো—শুনে যাও, যেয়ো না।" কিন্তু অন্ধকার বারান্দার কোন্‌দিকে যে সে মিশিয়া গেল তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

অজার সেদিনের ব্যবহারে মৃগাঙ্কর মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইল। হইলই বা সে দোষী? তাই বলিয়াই কি অজার বার বার তাহাকে এমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করাটাই ভাল দেখায়? কয়দিন ধরিয়া মনের মধ্যে একটা তীব্র অভিমান জাগিয়া রহিল। সেও তাহার সহিত আর দেখা সাক্ষাৎ করিল না। একবার মনে হইল, দূর হোক; ইহার প্রতিশোধ ত হাতেই রহিয়াছে! জহরার কি চেহারা, কি মিষ্ট গলা! কিন্তু বন্ধুর দল আবার যখন তাহাদের সমুদয় সম্মোহনশক্তি বিস্তার

করিয়া প্রবলভাবে প্রলুব্ধ করিতে আসিল—তখন সে প্রাণপণ শক্তিতে সেই স্বেদসিক্ত কুঞ্চিতালোকতলে সুদীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ অর্দ্ধাবরিত অত্যন্ত সবল দুইটি নেত্র মনের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া নিজেকে জয়ী করিয়া তুলিল। জহরার হীরার দুল দোলান ঝাপ্টা পরা মুখ তাহার কাছে বড় ম্লান, বড় হীনপ্রভ মনে হইতেছিল।

কিন্তু সময় আর কাটে না। প্রমোদ-যামিনী নিঃসাড়ে কাটিয়া যায়। মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন একান্ত আনন্দহীন—অলস। পুরাতন খাতা খুলিয়া একদিন সে 'অতীত জীবন' নাম দিয়া একটা কবিতা লিখিল। তারপরই 'পল্লীযুবক' নামে তাহার যে প্রবন্ধটা এক মাসিকপত্রে ছাপা হইয়াছিল, অনেকগুলা কাগজ সেটার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়া একদিনেই তাহাকে সাধারণের পরিচিত ও যশস্বী করিয়া তুলিল। বলা বাহুল্য, এ দুইটাই তাহার নিজের পূর্ণ অভিজ্ঞতার ফল। প্রতি সংবাদপত্র সম্পাদক তাহাকে "নিজস্ব লেখক" করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ যত্ন দেখাইয়া পত্র লিখিলেন। একখানা সুপ্রতিষ্ঠ সাপ্তাহিকের সহকারী কার্য্যভার লইবার জন্য বিনীত নিবেদনও আসিল! কিন্তু এ সব কিছুই যেন ভাল লাগিতেছিল না। যাহার জন্য এ পূজার আয়োজন, সে যদি এক সঙ্গে ধ্যানের আসনে আসিয়া না বসিল, তবে নামই বা কি আর যশই বা কিসের? আগে তাহাকে চাই; তারপর আর যা হয়, সে সব উপরি পাওনা।

জগতে এক শ্রেণীর লোক আছে—তাহাদের পতনশক্তি যেমন প্রবল, উত্থানশক্তিও তেমনি সতেজ। যখন যেদিকে ঝোঁক দেয় তখন সেই দিকেই তাহার পরাকাষ্ঠা ভাল করিয়া ছাড়ে। মৃগাঙ্কও সেই দলের লোক। সে যতখানি নামিয়া গিয়াছিল, উঠিতে আরম্ভ করিতেই, ঠিক ততখানি বেগের সহিত উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভিতর হইতে বাহির

অবধি সমস্তই আজ সে নূতন করিয়া গড়িবে—ইহাই তাহার ইচ্ছা। তাই পূর্ব্বচিহ্নের কিছু বাকী রাখিবে না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া চারিদিক দিয়াই সে একসঙ্গে সংস্কার কার্য্যটা আরম্ভ করিয়া দিল। বৈঠকখানার মোহিনী নারীচিত্রগুলা একদিন অত্যন্ত কুৎসিত বোধে ঝুপ্ঝাপ্ করিয়া পুষ্করিণী জলে ফেলিয়া দিল, আলমারি খুলিয়া অনেকগুলা কাঁচের ঠুন্কা বাসন টানিয়া ফেলিল; খানসামাটাকে বক্শিস্ সহ মাহিনা চুকাইয়া বিদায় দিল। পরে একদিন হঠাৎ দেখা গেল, বহু দিনের অসংস্কৃত অন্দরমহলে রাজমিস্ত্রির দল ভারা বাঁধিতেছে। অবশ্য ইহার ফলে তাহাকে কিছু পাপানুষ্ঠান করিতেও হইল। যেহেতু অনেকগুলা বাদুড় চামচিকা ও শালিক চড়াইকে এতদুপলক্ষে গৃহহীন করিতে হইয়াছিল। অজার শয়নগৃহ সে ইচ্ছা করিয়াই অজাকে ফিরাইয়া দেয় নাই। কিছুদিন পরে একদিন কি দরকারে, মৃগাঙ্কর অবর্ত্তমানে অজা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া অবাক্ হইয়া গেল। ঘরের দেওয়ালের গায়ে আঁকা সবুজ লতায় গোলাপি ফুল ধরিয়াছে। বার্ণিসকরা খাটে ঝালর দেওয়া নূতন মশারির মধ্যে পুরু গদির উপর নূতন ধব্ধবে বিছানা পাতা। একধারে শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর সূতার কাজের শুভ্র আস্তরণ, তদুপরি একটা সেলাইয়ের সৌখিন বাক্স, কতকগুলা এসেন্সের শিশি; খানকয়েক কেদারা সেটাকে ঘেরিয়া আছে। আরও গৃহশয্যার টুকিটাকি, কত কি যে এখানে সেখানে সাজানো গুছানো, সে সব ভাল করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে তাহার সাহসেই কুলাইল না। হয় ত কোন্ মুহূর্ত্তে মৃগাঙ্ক আসিয়া দেখিয়া ফেলিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিবে, গরীবের মেয়ে কি না, কখনও ত কিছু দেখে নাই, তাই এ-সব দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য অভিভূত হইয়া গিয়াছে!

সে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ বালিসের তলায় অর্দ্ধাবরিত কি একটা

জিনিস দেখিয়া মনে তাহার একটুখানি কৌতূহল জাগিল।—কি এটা এখানে? বলিয়া সে ছোট একটা রঙিন ভেল্‌ভেটেমোড়া বাক্স টানিয়া বাহির করিল। তাহাতে একটি হুক্ লাগান; সেটা খুলিয়া ফেলিতেই কক্ষস্থ আলোকে সেই বাক্সমধ্যে এক বহুমূল্য প্রস্তরখচিত কণ্ঠাভরণ অকস্মাৎ ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। বাক্সের উপরে সোনালি অক্ষরে লেখা, "শ্রীমতী অজ্জা দেবী।"

চোর চুরি করিতে গিয়া হঠাৎ বিবেকের তাড়নায় যেমন জড়সড় হয়, সেও তেমনিভাবে তৎক্ষণাৎ বাক্সটা বন্ধ করিয়া ফেলিল এবং তারপর জিনিষটা যথাস্থানে রাখিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। আশায়, আনন্দে, লজ্জায় তাহার বুক কাঁপিতেছিল। গহনাটার দিকে চোখ তুলিয়া সে চাহিয়াও দেখে নাই। কিন্তু ঐ যে সোণার জলে ছাপা কয়টি অক্ষর, উহার মূল্য যেন তাহার নিকট সাত রাজার ধনের ন্যায়ই অতুল্য। সে কয়টি যেন ছাপার কলের চাপে তাহার বুকের মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছিল। সে সজল নেত্রে ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিয়া যেন সেই অজ্ঞাত সুখদাতার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা ধারা ঢালিয়া দিয়া কহিল—জন্মদুঃখিনী অজ্জার অদৃষ্টে কি এত সুখও লিখিয়াছ ঠাকুর? আমার যে কোন মতে বিশ্বাস হয় না—যে এ সব আমারই জন্য।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

রমাবল্লভ একপ্রকার জীবন্মৃত হইয়া আছেন। কৈশোর জীবনে তাঁহার জীবন-নির্ঝর যে প্রীতি-মন্দাকিনীর শীতল ধারায় মিলিত হইয়া একসঙ্গে আজ এতখানি পথ অতিবাহিত হইয়া আসিল, সে ধারা অকস্মাৎ কোন্ মরুবালুকারাশির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে

তাঁহাকেও শুষ্ক করিয়া দিয়া গেল রমাবল্লভ শূন্যে চাহিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করেন। কত পূর্ব্বস্মৃতির উদয়ে চোখে জল আসে, আবার কত স্মরণীয় আনন্দের দিন মনে পড়িয়া চিন্তাকাতর বক্ষমূলে সুখের স্মৃতি তরল স্রোতে বহিয়া যায়।

তা রমাবল্লভের ত অনেকগুলা দিন কাটিয়াই গিয়াছে। কালো চুলের মধ্যে মধ্যে রৌপ্যরেখা ফুটিয়া উঠিল, স্থির ললাটপটে শেষদিনের সম্বলমাত্র ত্রিপুণ্ড্রলেখা লিখিয়া দিয়া কালের ইঙ্গিত আপনাকে শতপথে ব্যক্ত করিতেছিল। কিন্তু এই যে কচি মেয়ে বাণী, ইহার দিন কাটে কি করিয়া? অসন্তুষ্টা আত্মীয়াগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য পূজাকাল খর্ব্ব করিতে হয়। পিতৃসেবা সে না করিলে পিতাকেই বা কে দেখিবে? কিন্তু হায়, সে ত কাহারও জন্য কখনও কিছু করে নাই, চিরদিনই যে মার কাছে কেবল অপর্য্যাপ্ত পাওনাই পাইয়া আসিয়াছে! আজ সেই মা তাহার কোথা?

লোকে তাহার দুঃখে বড় দুঃখিত। তাহারা অন্তরালে বসিয়া কাণাঘুষা করে। কেহ বা সহ্য করিতে না পারিয়া সাম্‌না সাম্‌নিই মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া বলেন, 'আহা, এমন সোণার পদ্ম কি না একটা চামারের হাতে পড়িল! চোখ তুলিয়া সে একদিন এমন রূপের মেয়ের পানে চাহিয়াও দেখিল না গা? এই আগুনের খাপ্‌রা মেয়ে, মা নাই, কে দেখে?'

অপমানে অভিমানে বাণীর চিত্ত বদ্ধ পাত্রে ফুটন্ত জলের মত রুদ্ধ ক্ষোভে ফুটিয়া উঠিতে থাকে, কিন্তু উথলাইতে পারে না। সে যে স্বেচ্ছায় নিজের মুখে নিজে বিষপাত্র তুলিয়া ধরিয়াছে, এখন তাহাকে এই তীব্র বিষ আকণ্ঠ পান করিতেই হইবে—এ ছাড়া আর উপায়ও ত কিছু নাই।

কৃষ্ণপ্রিয়ার অন্তিম অনুরোধ রমাবল্লভকেও অত্যন্ত বিচলিত করিয়া

তুলিয়াছিল। তিনি নিজেই কি ইহা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছিলেন না? কিন্তু সেই যে আসন্ন বিপদের মূর্তি দেখিয়া জ্ঞানহীন হইয়া আত্মাভিমানের বশে ও কন্যাস্নেহে বিচারশক্তি হারাইয়া একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, যত অন্যায়ই হোক, তাহা সংশোধন করিবার সৎসাহস মনের মধ্যে জাগে কৈ? লজ্জার মাথা খাইয়া কোন্ মুখে তিনি এখন আবার নিজ হইতেই তাহাকে বলিবেন, "অম্বর, তোমায় যে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া যাও। দয়া করিয়া আমার মেয়েকে তুমি গ্রহণ কর।"

এ কথা বলা উচিত হইতে পারে, কিন্তু বলা বড় কঠিন।

তথাপি সাধ্বী স্ত্রীর শেষ অনুরোধ একেবারেও কাটান যায় না। অনেক গড়িয়া ভাঙ্গিয়া শেষে অম্বরকে তিনি স্বহস্তে এক পত্র লিখিলেন, "এই সময় আমরা তোমাকে পাইলে বোধ করি অনেকটাই শান্তি পাই। তোমার ৺শাশুড়ী ঠাকুরাণীরও একান্তই ইচ্ছা ছিল, এবং শেষমুহূর্ত্তেও তিনি এই অনুরোধই করিযা গিয়াছেন। তুমি এইবার শীঘ্র ফিরিয়া আইস।"

কয়েকদিন পরে উত্তর আসিল, "মাতৃস্নেহ পূর্ব্বে কখনও পাই নাই; তাই না পাইয়া এতদিন পরে সে দুঃখ আমার ঘুচিয়াছিল। তাঁহার অভাব যে কি, তাহা এখন আমি সম্পূর্ণই বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু সোনাপুর চতুষ্পাঠীতে শীঘ্রই আদ্য পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। সেজন্য এক্ষণে যাইতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। পরমপিতা আপনাদের মনে শান্তি প্রদান করুন। আপনি আমার শতকোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন।"

পত্রখানা পিতার টেবিলের উপর দেখিয়া সুযোগ মত বাণী সেখানা চুরি করিয়া আনিয়া পড়িল। মায়ের অন্তিম আদেশ তাহার মনে অগ্নিতপ্ত শলাকা বিদ্ধ করিতেছিল। সন্তান হইয়া মার জন্য সে কবে কি

করিয়াছে? এই যে মৃত্যুশয্যায় ইহজন্মের মত শেষ আদেশটা দিয়া গেলেন, ইহাও কি সে রাখিতে পারিবে না? কিন্তু মন এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। দেবতার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া সে দান কেমন করিয়া সে ফিরাইবে? তাহার পরে, যে শপথ তাঁহাকে সে করাইয়াছে, সে শপথ ভঙ্গ করিয়া তাহাকে গ্রহণ করা অম্বরের পক্ষেই কি সম্ভব? করিলেও সে নিজে কি তাহার এত বড় অপরাধটাকে ক্ষমা করিতেই পারিবে?

না। তাঁহার এতটুকু হীনতাও আজ বাণীর সহ্য হইবে না। সে যে অম্বরের সেই তুষারশুভ্র পবিত্রতা ও অভ্রভেদী পাণ্ডিত্যে আজ আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিতেছে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে কেমন করিয়া সে এত বড় শ্রদ্ধা দান করিবে?

পত্রপাঠান্তে একদিকে এক গভীর সুখ এবং অপরপক্ষে সুগভীর হতাশায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আসিবে না। নিজের প্রতিজ্ঞা সে নিশ্চয় রাখিবে!

বাণীর মুখে সগর্ব্ব হাসির রেখা মিলাইয়া তাহার স্থানে এক সকরুণ বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তখন সেই বিষাদময় মুখকান্তিতে তাহাকে যেন আর এক জন মানুষের মত দেখাইতেছিল। রমাবল্লভ এ মুখ দেখিয়া মনের মধ্যে যেন এতটুকু তৃপ্তি পান না, তাঁহার চোখে কেবলই জল ভরিয়া আসে। পাছে সে তাঁহার কান্না দেখিয়া কাঁদে, তাই তিনি কোনমতে চাপাচুপি দিয়া পড়িয়া থাকেন। মনে মনে স্ত্রীকে ডাকিয়া বলেন, "তুমি ত চলিয়া গেলে কৃষ্ণা—আমি এ মেয়ের মুখের দিকে কেমন করিয়া চাহিয়া দেখি? যে পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তুমি নাই—আজ কে আমায় সাহায্য করিবে বলিয়া দাও।"

অম্বরের পত্রখানি বাণী নিজের কাছেই রাখিয়া দিল। সে পত্রের

প্রতি অক্ষরটি সে যেন তুলি ধরিয়া নিজের মনের মধ্যে লিখিয়া লইয়াছিল। সুযোগ পাইলেই চুপি চুপি পত্রখানা বাহির করিয়া সে একবার করিয়া পড়িতে বসিত। কি সুন্দর হস্তাক্ষর! যেন মুক্তা পংক্তি সাজান! যুক্তাক্ষরগুলি যেন এক একখানি ছবির মত সুন্দর! ইংরাজীর শিরো-নামাটিও কেমন সুশ্রীভাবে লেখা! কে বলে এ ভাষায় সে অনভিজ্ঞ? সে নির্নিমেষে চিঠিখানার দিকে চাহিয়া থাকে। দেখিতে দেখিতে হু হু করিয়া দুই চোখে জল আসিয়া পড়ে। মায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে অভিমান ভিন্ন অন্য কোন কারণে তাহার চোখে বড় একটা জল পড়িত না। আজ-কাল বড় সহজেই তাহার কান্না পায়। মন ভাঙ্গিয়া গেলে সে ভাঙ্গা মনে বড অল্পেই আঘাত লাগিতে থাকে।

সহসা একদিন ম্লানমুখে বাণী তাহার পিতাকে আসিয়া বলিল, "বাবা চল, আমরা কোথাও যাই।"

তাহার এই নিরাশা-কাতর চিত্তের আকস্মিক অভিব্যক্তি স্নেহময় পিতাকে যেন কশাঘাত করিল। মন যখন বড় অস্থির হইয়া পড়ে, চিরপরিচিত সমস্তই যখন এককালে বিষতিক্ত হইয়া উঠে, তখন মানুষের মনে এই রকম একটা অস্থিরতা জাগিতে থাকে, যাইবার প্রয়োজন বা স্থানের ঠিকানা না থাকিলেও মনে হয়—কোথাও যাই।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পিতা কহিলেন, "কোথা যাব, বল্ মা?"

"কোথা? কি জানি বাবা, কোথা? চল, যেখানে হোক্ কোথাও যাই।"

তাহার পর একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সে বলিল, "চন্দ্রনাথে যাবে বাবা? মা গিয়েছিলেন, আমার যাওয়া হয় নি।"

"চট্টগ্রাম? যাবি? আচ্ছা, সেই ভাল।"

রমাবল্লভ মনে মনে ভাবিলেন, তোমার ইচ্ছায় অতবড় কাজটাতেই

যখন বাধা দিই নাই, তখন এ সামান্ত সাধে কি বাধা দিব? তুমি সুখে থাকিলেই আমার সুখ—আমার আর এ পৃথিবীতে কে আছে?

যাত্রার পূর্ব্বে বাণী অম্বুনাথকে ডাকাইয়া পূজা অর্চ্চনার পূর্ণ ভার তাহার উপর প্রদান করিলে অম্বুনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দির ছেড়ে থাকতে পারবেন?"

বাণী অত্যন্ত বিষণ্ণ হাসি হাসিল, কহিল, "তিনি যদি রাখেন ত পারব না কেন?"

পুরোহিত মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন—মায়া কাটানো না কি? শ্বশুরঘর করিতে যাইবার পূর্ব্বাভাস?

যাত্রাকালে বিগ্রহ প্রণাম করিয়া উঠিতেই বাণীর দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। 'কখনও তোমার কাছছাড়া হই নাই, ঠাকুর, আজ বড় জ্বালায় বাহির হইতেছি। প্রাণে যেন শান্তি পাই, যেন নির্ম্মল অন্তঃকরণ লইয়া এবার তোমার কাছে ফিরিয়া আসি।' কিছুক্ষণ গলদশ্রুর মধ্যে সে সেই চিরসুন্দরের পানে চাহিয়া রহিল। "শুধু বলে দাও —আমার এ চিন্তায় পাপ আছে কি না? আমি তাঁকে 'আমার স্বামী' বলে ধ্যান কর্‌তে অধিকারী কি না? আর বলে দাও—হে জগৎস্বামি! তোমায় পেয়েও আজ মানবস্বামীর জন্য এ ব্যাকুলতা আমার মনে কেন জাগল? আমায় তাই বলে দাও—কি পাপে আমার এ দশা ঘটালে?"

আবার ভূমিতলে লুটাইয়া প্রণামান্তে সে অজস্র অশ্রুধারায় ভাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার কানের কাছে সেই মুহূর্ত্তে যেন বাজিয়া উঠিল —"স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন সুখ নাই, অন্য কামনা নাই, এমন কি, অন্য দেবতাও নাই।" সে ঈষৎ শিহরিয়া উঠিল। এ কি মার কথা—না দেবতার আদেশ? কিন্তু মা আমার আজ ত দেবতারই রাজ্যে গিয়াছেন। যদি মার কথাই হয় তবু সে দেবাদেশই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথ যাইতে পথে বাহির হইয়াই বাণীর হঠাৎ মত ফিরিয়া গেল। সে বলিল, "সামনে মহাষ্টমী, কালীঘাটে মা-কালী দর্শন করে আসি, চন্দ্রনাথ এখন থাক্।" রমাবল্লভ অতিমাত্র বিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিছুই বলিলেন না; কিন্তু মনে হইল, এ কি পরিবর্ত্তন! মা-কালীর প্রতি এ শ্রদ্ধা তাহার কোথা হইতে আসিল?

সুদূর পথের সহস্র বাধা অপসারিত করিয়া যে অফুরন্ত হৃদয়ধারা হৃদয়েশ্বরের চরণে চিরপ্রধাবিত, সেই পবিত্র জাহ্নবীসলিলে স্নান করিতে বাণীর বুকের ভার যেন অনেকখানি লঘু হইয়া আসিল। সে মনে মনে বলিল, "কলুষনাশিনী মা! এ পাপিষ্ঠার মনের কলুষ আজ যেন একেবারে ধুইয়া যায়—দেখিয়ো।"

বিশ্বনাথ বিশ্ব জুড়িয়া আছেন, ক্ষুদ্র মানবজীবনে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পিতায়—মাতায়—স্বামী—সখায় শতভাবেই প্রকটিত। একজন সাধু রমাবল্লভের সহিত বিবিধ শাস্ত্রালোচনার মধ্যে এই কথাটি বলিবামাত্র বাণীর ক্ষুধিত চিত্ত ইহা একেবারে যেন গ্রাস করিয়া লইল। সাধু বলিলেন, "জগতে এই সম্বন্ধ যত বিস্তৃত করা যায়, মনের ততই প্রসার হয়। ক্ষুদ্র 'স্ব'কে বৃহৎ করিতে পারিলেই 'অহং'এর যথার্থ ধ্বংস ঘটে। ঘরের দ্বার আঁটিয়া শত্রুহস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা ভাল, না সন্ধিদ্বারা শত্রুহীন হওয়া শ্রেয়ঃ? লোকের বিশ্বাস, আসক্তিহীন হইলে প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া যায়, কথা ঠিকই! কিন্তু সেই আসক্তিহীন হওয়ার উপায় প্রেমহীনতা নয়; প্রণয়ের অতি প্রসার।"

কোনমতে পিতার অজ্ঞাতসারে বাণী নকুলেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বের বটতলার সেই যতিটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "দেবতাকে যদি কোন

দ্রব্য উৎসর্গ করে থাকি ; তা হ'লে সে বস্তু কি আবার মানুষকে দেওয়া যায় ?"

উত্তর হইল, "দেবতার প্রসাদ মানবের সমধিক প্রিয়ই হইয়া থাকে। জীবদেহেই দেবতা ভোগ গ্রহণ করেন, স্ব মুখে ত করেন না। মানবের মধ্যস্থ প্রত্যগাত্মরূপী ভগবানকেই অর্পণ করিলাম—এ ভাবেও উৎসর্গিত বস্তু পুনরর্পিত হইতে পারে।"

বাণী নির্ম্মল লঘুচিত্তে তাঁহার পদধূলি লইয়া চলিয়া আসিল। বাহিরে না হয় নাই হোক, অন্তরে সে ত তাঁহাকে স্বামী বলিয়া ধ্যান করিতে পাইবে, সেই ঢের।

মহাষ্টমীর দিন কালী মন্দিরে ভিড়ের সীমা ছিল না। কিন্তু যত ভিড়ই হোক, অর্থবল যাহার আছে, তাহার নিকট এক মোক্ষ দ্বার ব্যতীত সকল দ্বারই মুক্ত। সে প্রাণ ভরিয়া মায়ের পায়ে রক্তজবার অঞ্জলি ঢালিয়া দিল।

প্রত্যাবর্ত্তনপথে রমাবল্লভ কহিলেন, "যখন বাহির হওয়া গিয়াছে, তখন আরও একটু বেড়ান যাক্, ঘরের বাহিরে ভিতরের চেয়ে ঢের বেশী শান্তি আছে।"

বাণীরও ঠিক সেই কথাই মনে হইতেছিল। সে দুইধারের সৌধমালা পরিবেষ্টিত, জনারণ্যময় দৃশ্যের উপর নেত্র স্থির করিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে বাবা ?"

"পশ্চিম ?" বলিয়া রমাবল্লভ কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন।

মুহূর্ত্তে বাণীর সকল উৎসাহ যেন একেবারেই নিবিয়া গেল। অসংখ্য যানবাহনারূঢ় নরনারীগণের পানে ভাবশূন্য প্রাণে চাহিয়া চাহিয়া মৃদুস্বরে সে উচ্চারণ করিল, "পশ্চিম !"

সংশয়পূর্ণচিত্তে রমাবল্লভ চাহিয়া দেখিলেন—"থাক্ গে—পশ্চিম এখন

ভয়ানক শীত পড়েছে। কার্ত্তিক মাসের অর্দ্ধেক কেটে গেল, ক্রমেই ত শীত বাড়বে। জগন্নাথ, না হয় কামাখ্যায় যাওয়া তোমার মত হয় ত—"

বাণী চমকিয়া উঠিল—"জগন্নাথ! তাই না হয় চল।"

"আমি বলি কামাখ্যা হয়ে তার পর ফিরে তখন না হয় জগন্নাথ যাওয়া যাবে—কি বলিস্?"

"কামাখ্যা—না, না, সে যে বড় বিশ্রী রাস্তা—ভারী না কি খারাপ দেশ! সে থাক্‌গে।" বাণীর বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতেছিল।

"খারাপ—হাঁ, তা বটে।"

অসহায় ক্রোধে বাণীর সর্ব্বশরীর তাতিয়া উঠিল। নিজের উপর রাগ হইল, পিতার উপরও হইল।

একটুখানি কি ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্য এক সময় রমাবল্লভ সহসা কহিলেন, "কামাখ্যাটা একবার দেখা উচিত। অতবড় সিদ্ধপীঠ—এস, যাওয়াই যাক্।"

নিজের উপর ভরসা করিয়া বাণী আর কোন উত্তর দিবার চেষ্টা করিল না।

ধুবড়ি হইতে ষ্টীমারে উঠা হইল। প্রথম শ্রেণীর কামরায় যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করা হইয়াছিল। রমাবল্লভ ডেকের উপর গিয়া একখানা টেবিল অধিকার করিয়া বসিয়া পড়িলেন, বাণী নিজের কামরার ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে বসিয়া গবাক্ষ খুলিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

কাল অপরাহ্ণ; মহানন্দ ব্রহ্মপুত্র প্রশান্ত আকাশের স্থির নীলিমা বক্ষে ধরিয়া নীলাব্জ-নীল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দুই পার্শ্বে উন্নত নীল পর্ব্বতমালা—পর্ব্বতগাত্রে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষলতাগুল্মাদি সব যেন চিত্রকরা, সে সমস্তও দূরত্বপ্রযুক্ত পর্ব্বতগাত্রবর্ণে অম্বররঞ্জিত হইয়া নীল দেখাইতে-

ছিল। জলে, স্থলে, ঊর্দ্ধে, অধোভাগে সর্ব্বস্থলই যেন আজ নীলিমায় ভরিয়া গিয়াছে। বাণী মুগ্ধনেত্রে সেই ইন্দীবরশ্যাম মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কামরূপে কামাখ্যাদেবী দর্শন হইলে রমাবল্লভ সহসা প্রস্তাব করিলেন, একবার শিলংটা দেখে যাওয়া যাক্ না। বাণী দৃষ্টি নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, হাঁ না কিছুই বলিল না।

কেহ কোন কথা প্রকাশ করিল না বটে, কিন্তু দুজনেরই মনে যে একই ভাবের তরঙ্গ বহিতেছিল, তাহা কাহারও অজ্ঞাত রহিল না।

প্রকৃতিদেবীর স্বহস্তসজ্জিত রম্য কানন, পর্ব্বত, গিরিনদীপরিবৃত পথদৃশ্য বাণীর উদ্বেগ শঙ্কিত হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শান্তিসুখ দিতে পারিল না। বৈচিত্র্যেরও সীমা ছিল না। দুর পথ—কোথাও হরিৎ ক্ষেত্র শস্যসম্ভারে অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে, কোথাও কমলাক্ষেত্রের অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, কোথাও আবার গগনস্পর্শী ধূসর পর্ব্বতমালা। সুবিস্তৃত জলায় থাকিয়া থাকিয়া আলেয়ার অগ্নিক্রীড়া অনভিজ্ঞ দর্শককে বিস্ময়াতঙ্কে সহজেই অভিভূত করিয়া তুলে।

তাঁহারা শিলংয়ে একদিন মাত্র বাস করিয়াই আবার তল্পি বাঁধিয়া মেল ট্রেণ ধরিতে বাহির হইলেন। কোথায় যাওয়া হইতেছে, সে সম্বন্ধে পিতা-পুত্রীতে কোন প্রশ্নোত্তরই হইল না। গাড়ী ক্রমে সুরমা উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ীর কামরায় কাঠের পর্দ্দায় চামড়া আঁটা গদির উপর পিঠ রাখিয়া, উদাসনেত্রে বাণী বাহিরে চাহিয়া ভাবে, সে যেন কোথায় কোন্ অজানা পথে চিরদিনের জন্যই অনির্দ্দেশ যাত্রা করিয়াছে, এ পথের সীমা নাই—সীমার কোন আবশ্যকও বুঝি নাই।

একদিন অতি প্রত্যূষে গাড়ী থামিতেই মুদিতনেত্রা বাণীর কর্ণে—'গরম-চা পানচুরোট' ইত্যাদির মাঝখান হইতে হঠাৎ তাহার পিতার কণ্ঠধ্বনি প্রবেশ করিল, "এই যে তুমি এসেছ! এস, এস, ভাল আছ ত?"

"আজ্ঞে হাঁ, ভালই আছি।"

"না, না, কৈ তেমন ভাল আছ? বড় রোগা দেখছি যে! চেহারা যে একেবারে খারাপ হয়ে গেছে!—কুলি, কুলি, এই রামসিং, বিন্দে, ওরে তেওয়ারি—মোট সব নামা, এখানে নাম্‌তে হবে।"

বাণীর বক্ষ শোণিতের তরঙ্গ উঠিতে পড়িতে লাগিল। সে প্রাণপণে চোখ বুজিয়া যেমন তেমনই পড়িয়া রহিল। ভয় হইতেছিল, যদি চোখ চাহিলে আর চোখের জল রোধ করিতে না পারে! সহসা সে শুনিল—"এখানে নাম্‌বেন? অতি বিশ্রী জায়গা এটা, খাবার জিনিস এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আজকাল এখানটায় ভয়ানক কালা-জ্বর হচ্ছে, লোক সব পালাচ্ছে, নেমে কাজ নেই।"

"অ্যাঁ, তবে তুমি এখানে কেন রয়েছ? এসো, এসো—অম্বর! শীগ্‌গির উঠে পড়। রামসিং, রামসিং, ওরে, জামাইবাবুর জন্য শীগ্‌গির একখানা টিকিট কিনে আন্। কোথাকার? তা এখনও ঠিক করি নি। তোর যেখানকার খুসী তুই নিয়ে আয় ত। রিজার্ভ গাড়ী? তা সত্যি—তবে থাক্—চলে যাবে। দাঁড়িয়ে কেন? অম্বর, অম্বর, উঠে পড়, এখনই গাড়ী ছেড়ে দেবে যে!"

রমাবল্লভ ভিতর হইতে হাতল ঘুরাইয়া দ্বার খুলিয়া ঝুঁকিয়া তাহার হাতটা ধরিলেন—"এস, এস—না হ'লে আমাদেরই নামতে হয়।"

হতবুদ্ধিপ্রায় অম্বর ভাল করিয়া সমস্তটা অনুভব করিবার পূর্ব্বেই শ্বশুরের হস্তাকর্ষণে নিজেরও অজ্ঞাতে গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী বাজাইয়া সদর্পগতি ট্রেণও বিশ্রামস্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইল।

বাণী এ পর্য্যন্ত চোখ চাহিয়া জাগ্রৎ চিহ্ন প্রকাশ করে নাই? অম্বর কক্ষে প্রবেশ করার মুহূর্ত্তে একটা তাড়িতবেগ আসিয়া তাহার সমস্ত

শরীর যেন নিস্পন্দ করিয়া তুলিয়াছিল; সুখ কি দুঃখ, লজ্জা কি অভিমান অথবা সমুদয় মানসিক বৃত্তির একত্র মিশ্রণের প্রবলতর অভিঘাত তাহাকে এমন করিল যে তাহার কিছুমাত্রও অনুভূতি যেন আর বাকি রহিল না। কেবল অন্তর্চৈতন্যবিশিষ্ট জড়বৎ সে যথাস্থানে পড়িয়া রহিল—অঙ্গুলিটি অবধি নাড়িবার শক্তি তাহার ছিল না।

গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে। পিতার সাগ্রহ কণ্ঠ তাহার দুর্বোধ্য শব্দজাল ভেদ করিয়া-কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু সে শব্দ শুনিবার জন্য তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি শ্রবণাশ্রয়ী হইয়া আছে, কত সংক্ষেপ ও কি কদাচিৎ সে স্বর!

রমাবল্লভ কালাজ্বরের ভাবনায় শীঘ্রই এই ভয়াবহ স্থান ত্যাগ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অম্বরকেও এখানে রাখিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া তাহাকে তাঁহাদের সহিত যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতেছিলেন।

শ্বাস রুদ্ধ করিয়া থাকিয়া বাণী উত্তর শুনিল, "এখন যাওয়া অসম্ভব! আগামী সোমবার গুরুগাঁও চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার দিন, স্থির হয়ে গেছে। আমার অনুপস্থিতিতে ক্ষতি হবে। আমি ত এখন ওদিকে ফিরব না—সম্প্রতি এখান থেকে তিনটে ষ্টেশন দূরে নামব।"

"না, না, সে কি হয়! চট্টগ্রামে আমাদের সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ দেখিয়ে আনতে হবে যে। সোমবারে না হয় নাই হ'ল। দিন দশ-পনের লাগবে বৈ ত না? বাড়বানলটা দেখার বড় সাধ আছে। শুনেছি এরকমটা আর নাকি কোথাও নেই।"

উত্তর হইল, "অনেক পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, এখন কি আর দিন বদলান যেতে পারে? সে হয় না।"

রমাবল্লভ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তবে আর কি বল্‌ব? আজই—এখনই তোমায় সেখানে যেতে হবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেখান থেকে গরুর গাড়ীর পথে আবার একদিন লাগবে কি না। দেরি কর্‌লে সময়ে পৌঁছুতে পার্‌ব না। যেতেই হবে।"

পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই রমাবল্লভ ব্যস্তসমস্ত হইয়া নামিয়া পড়িলেন—"আমায় একটু হাত মুখ ধুতে হবে—ও গাড়ীটায় একবার যাই, অন্য ষ্টেশনে তখন উঠব। ওরে বিন্দা, আমার ব্যাগটা নিয়ে চল্‌।"

অম্বর সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়াছিল। বাণী ইচ্ছা করিয়াই চাবির শব্দ করিয়া স্খলিতাঞ্চল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল; কিন্তু অম্বর একান্ত অন্যমনস্ক; ইহাতেও সে তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল না। সে তখন গবাক্ষ-পথে মুখ বাহির করিয়া শৈলমালার বিচিত্র মায়ারূপ-পর্য্যবেক্ষণে তন্ময়! বাণীর হৃদয়ে অভিমান, বেদনা ও হতাশা একসঙ্গে তীব্র যন্ত্রণানল জ্বালাইয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবজাত বিজাতীয় ক্রোধও সুষুপ্তিভঙ্গ করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু হায়, কাহার প্রতি সে ক্রোধ করিবে? এ যে তাহার স্বখাদসলিলে ডুবিয়া মরা। সম্মুখে শীতল জল—এখনই তাহার সমুদয় কণ্ঠশোষ সেই তৃষাহরা সুস্নিগ্ধ সলিলে নিবৃত্ত হইয়া যায়, কিন্তু উপায় নাই। ঐ মৃগতৃষ্ণিকার পানে চাহিয়া এই তপ্ত মরুপ্রান্তরে বসিয়া আজীবন তাহাকে কাঁদিতেই হইবে। সে যে স্বেচ্ছায় এই মরুভূমি নিজের আসন পাতিয়াছে।

আর একটা ষ্টেশন আসিয়া চলিয়া গেল, রমাবল্লভ দেখা দিলেন না। আরও একটা সুযোগ অতীত হইয়া গেল। বাণীর বুকের মধ্যে দুপ্‌দাপ্‌ করিয়া যেন ধুনারীর যন্ত্র চলিতে ছিল। পিতার এ ইঙ্গিত সে স্পষ্টই বুঝিয়াছিল। নিজে চাকরদের গাড়ীতে থাকিয়া এই যে সুযোগ তিনি

কন্যাকে আনিয়া দিয়াছেন, এ সুযোগ যদি সে হারায়, তবে হয় ত জীবনে দ্বিতীয়বার আর এ দিনের সাক্ষাৎ পাইবে না। মা বাপ সন্তানের জন্য কতখানি সহিতে প্রস্তুত, ইহা মনে করিতেই মার কথা স্মরণ করিয়া তাহার চোখে জল আসিল। হায়, আজ যদি মা সঙ্গে থাকিতেন! এ কি! সে এ কি ভাবিতেছে? সেই শপথের কথা ভুলিয়া গিয়াছে না কি? তাহাদের মাঝখানে যে বিশাল হিমাদ্রি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মরণ ভিন্ন কে তাহা অতিক্রম করিবে? অম্বর নিজে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে কেন? আর যদিই করে, তাহাতেই কি সে সুখী হইতে পারিবে?

তথাপি যতই সময় যাইতেছিল, ততই তাহার মনের ভিতরটা আন্‌চান্‌ করিয়া উঠিতেছিল। কোন্ সময় চলন্ত গাড়ীখানা আচম্‌কা থামিয়া পড়িবে—আর তাহার সকল আশা জন্মের মতই ফুরাইয়া যাইবে। বন্ধুর গিরিপথে সাবধানে গাড়ী চলিল। গতি-বেগ মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া আসিয়াছে, হঠাৎ অম্বর গবাক্ষ হইতে মুখ ফিরাইয়া কামরার ভিতরের দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল, কে যেন একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি করিয়া উঠিয়াছে! তাই ত! বাণীর চোখে বুঝি কয়লার গুঁড়া পড়িয়াছে? সে একটু স্থির হইয়া থাকিয়া উঠিয়া তাহার নিকটস্থ হইল, কহিল, "চোখে কয়লা পড়েছে? জল নেই? এই যে, দাঁড়াও, আমি বার করে দিচ্ছি।" অম্বর কুজা হইতে জল লইয়া সন্তর্পণে চোখে জলের ঝাপ্টা দিয়া দিল।

বাণীর দুই নেত্র হইতে তখন দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল, বাহিরের জলের সাহায্যে বেগ-বর্দ্ধিত ভিতরকার সেই অশ্রু বাধাহীনভাবে তাহার সহিত মিশিয়া ঝরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অম্বর জিজ্ঞাসা করিল, "গুঁড়োটা কি এখনও চোখে আছে?"

বাণী নীরবে ঘাড় নাড়িল। থাকিলে হয় ত ভালই হইত। কিন্তু তাহার দুরদৃষ্ট সে সুবিধাটুকুও তাহাকে দিতে প্রস্তুত ছিল না, কোন্ সময় অশ্রুজলে সে ভাসিয়া গিয়াছে। সে ধীরে ধীরে চোখ মুছিল।

অম্বর আর কোন কথা কহিল না—অদূরে দ্বিতীয় আসনখানায় বসিয়া আবার বাহিরের দিকে তেমনিভাবে চাহিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে তখন যে কি হইতেছিল, তাহা কে বুঝিবে?

এবার যেখানে গাড়ী থামিল, সেইখানে অম্বরকে নামিতে হইবে। অম্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়া এই প্রথমবার বাণীর দিকে এক নিমেষের জন্য চাহিয়া দেখিল—"সরে বসো, আবার চোখে কয়লা পড়তে পারে!" ইহা বলিয়া দ্বার খুলিয়া সে নামিয়া গেল, একটা বিদায় সম্ভাষণও করিয়া গেল না, অথচ সে ভালই জানে যে, এই দেখাই তাহাদের শেষ দেখা।

গাড়ীর কঠিন বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়া বাণীর একবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল—কিন্তু সে কাঁদিল না। ইচ্ছা হইতেছিল—একবার মান অভিমান লজ্জার তাড়না সব ভুলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিয়া সে বলে, "এই শেষ দেখা—একটু দাঁড়াইয়া বলিয়া যাও—আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ! একবার জন্মের শোধ রাধারাণী বলিয়া ডাকিয়া যাও!" কিন্তু হায় কিছুই ঘটিল না।

কখন্ ট্রেণ ছাড়িয়াছে, পিতা আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়াছেন, কিছুই সে জানিতে পারে নাই। পিতার কণ্ঠস্বরে সচেতন হইয়া মুখ ফিরাইতেই তাঁহার ব্যগ্র দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া, বাণী লজ্জায় মুখ নত করিল।

পিতা বলিলেন, "অম্বর চলে গেল? কবে দেশে ফিরবে। কিছু বললে কি?"

বাণী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "না।"

রমাবল্লভ বালিস টানিয়া অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িলেন, সে বসিয়া

রহিল। একটি কথা—তাহার শেষ কণ্ঠস্বর—সেই ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু বক্ষে লইয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত সে বসিয়া রহিল। গাড়ী হইতে নামিতেই—কে বোধ করি, অম্বরের কোন পূর্ব্বপরিচিত—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "অম্বর যে? এখানে কোথায়? গাড়ীতে কারা রয়েছেন? স্ত্রীলোক দেখি না? সে উত্তর দিয়াছিল, "হাঁ, আমার স্ত্রী।"

এই কথাটি বাণীকে আত্মহারা করিয়াছিল। 'আমার স্ত্রী'—এই ধ্বনি ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার দুই কর্ণে বাজিতেছিল। 'আমার স্ত্রী—সে স্বীকার করিয়াছে সে তাহার স্ত্রী! কত মিষ্ট এই কথাটুকু! নিকট হইতেও নিকটতম আত্মীয়তার এই স্বীকারোক্তি এ যেন তাহার মনকে আর একটা মন্ত্রমোহে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছিল। 'আমার স্ত্রী!' নিকটে বসিয়া একটু দূর-আত্মীয়তাও যে অঙ্গীকার করে নাই—বিদায়-মুহূর্ত্তে এত বড় অধিকার সে তাহাকে দিয়া গেল! ভাগ্যে সে তখন এই নির্জ্জন কক্ষে তাহার সহিত একা ছিল না। তা থাকিলে আজ কি হইত কে জানে? এই নির্ম্মল সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত শান্ত প্রভাতে তাহার মুখের দিকে এই তাপহীন সূর্য্যালোকের মতই প্রসন্ন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সে যদি আবার সেই স্বরে একবার উচ্চারণ করিত, 'আমার স্ত্রী' —তাহা হইলে, বোধ করি, বাণীর মন হইতে সেইক্ষণে সকল দ্বিধা ঘুচিয়া যাইত। সে আপনা ভুলিয়া সেই মুহূর্ত্তেই ছুটিয়া গিয়া তাহার পা দুইখানা চাপিয়া ধরিত, দীর্ঘসঞ্চিত অশ্রুজলে সেই চরণ ভাসাইয়া বোধ করি ইহাও তাহার বলিতে বাধিত না যে, "আমার পাপ প্রতিজ্ঞার সহিত সকল ভুল আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আমি তোমার স্ত্রী—ওগো, দয়া করিয়া আমায় গ্রহণ কর।"

ছায়াছবির মত চারিদিকের দৃশ্য মিলাইয়া যাইতেছিল। রমাবল্লভ বিষাদ চিন্তামগ্ন, বাণী সুখরোমাঞ্চিত শরীরে স্মৃতিসুখে বিভোর। সে

ভাবিতেছিল—আচ্ছা, সে স্বর অমন কাঁপিতেছিল কেন? কি যেন একটা ভাব তাহাতে ছিল! অত মিষ্ট ত কাহারও কোন কথা কখনও মনে হয় নাই। সত্যই কি গলা কাঁপিয়াছিল? না, আমার মনে ঐরূপ হইতেছে? কি সুমিষ্টই লাগিয়াছিল—'আমার স্ত্রী!' 'আমার স্ত্রী!' 'আমার স্ত্রী!'

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অন্য কোথাও আর যাওয়া হইল না। এই শেষ আশা ভঙ্গে রমা-বল্লভের শরীর একটু বিশেষরূপেই অসুস্থ বোধ হইল; কিন্তু তিনি তাহাতে কালাজ্বরের আক্রমণভয়ে ভীত হইয়া খানিকটা কুইনাইন নিজে খাইয়া ও খানিকটা কন্যাকে খাওয়াইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন।

বাণী কহিল, "চল বাবা, ফিরে যাই।" ঠাকুর দেখিবার মত ভাল মন তাহারও ছিল না। বড় অস্থির, বড় হতাশ।

মেঘনার সুদূর বিস্তৃত অর্ণবতরণী তাহার গভীর কৃষ্ণ জলের বুকে শুক্তিশুভ্র উত্তাল তরঙ্গমালা ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। আবার গবাক্ষ পথে বাণী একা। একা, কিন্তু গভীর যন্ত্রণাপূর্ণ চিন্তাসাগরে ভাসমান। সে যথার্থ কোন আশা বক্ষে লইয়া সেখানে যায় নাই। পিতার সাহায্যে তাঁহার গোপন চেষ্টায় যেটুকু সে লাভ করিয়াছিল, তাহারও আশা তাহার মনে খুব স্পষ্ট ছিল না। তথাপি আজ ফিরিবার সময় সর্ব্বক্ষণই মনে হইতেছিল, সে একা ফিরিয়া চলিল।

একা আপনাকে লইয়া শান্তিসুখে নিজের অধিকারে জীবন কাটাইবার জন্য এতটুকু বেলা হইতে যে ব্যাকুল, সে আজ গৃহাভিমুখী হইয়াই ভাবিল, সে যেমন আসিয়াছিল, তেমনি ফিরিয়া চলিয়াছে।

না—বুঝি ঠিক তেমন নয়। সেই বেদমন্ত্র যে বীজ রোপণ করিয়াছিল, দিনে দিনে বহুশাখা মহাবৃক্ষরূপে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এবার সেই যে নূতন মন্ত্র সে শুনিয়া আসিল, ইহার প্রভাবে সেই নবোদ্গত পত্ররাশিমণ্ডিত শাখাগুলি ফলভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার নারী-হৃদয় ইতঃপূর্ব্বে মন্ত্রশক্তির বলে অথবা রমণী-হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রীতি-প্রবণতার ফলে, তাহার বাহ্য অহঙ্কার, ধন ও ধর্ম্মের গর্ব্ব ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকার আত্ম-হৃদয়-রহস্য সে প্লাবনে গোপনতার অতল অন্ধকার হইতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছিল, আজ আবার আর এক বন্যার উচ্ছ্বাসে তাহা তরঙ্গ-শিরে নাচিয়া উঠিয়াছে—সে তাহাকে ভালবাসে। হিন্দু-গৃহের সমস্ত সতী নারীর মতই প্রাণঢালা প্রীতি ভক্তি প্রেমে তাহার এই ক্ষুদ্র হৃদয়-নদী এই স্ফীতবক্ষ মেঘনার মতই ফুলিয়া দুলিয়া নাচিয়া উঠিয়াছে।

এই আকস্মিক বর্ষাস্রোতের উদ্দাম পরিপ্লাবনের পরিচয়ে সে একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই ব্যর্থ জীবনে এত ভালবাসা লইয়া সে কি করিবে?

আকাশে নক্ষত্র উঠিতেছিল, আশে পাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ ভাসিতেছে, দিনের আলো নদীতীরে বিদায় লইয়াছে, তাহারই অস্পষ্ট অন্ধকার বনান্তরালে মিলাইয়া যাইতেছিল। বাণী জানালার কবাটে মাথা রাখিয়া চোখ মুদিল। আমার এই অসীম ভালবাসাও তাহাকে আমার কাছে আনিয়া দিতে পারিবে না? গোপীবল্লভ! প্রভু! পিতা! এমন কুমতি আমায় তুমি কেন দিয়েছিলে? না হয়, গর্ব্বে আমিই অন্ধ ছিলাম—তুমি ত সবই জানিতে! তবে আমায় এ কি করিলে?

সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঠের উপর মাথা রাখিল। উঃ, আর যে সে সহ্য করিতে পারে না! এই যে জন্মের শোধ দেখা হইল, একবার

একটি কথাও কহিলে না ! পরও ত পরকে দেখিলে একবার জিজ্ঞাসা করে, "কেমন আছ ?" বাণী কি তাহার চেয়েও পর ? হাঁ, তা একরকম নয় ত কি ?—কেহ কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিবে না, মন্দিরের শপথ !—বাণী ভাবিল, ভগবান, কেন সেই মুহূর্ত্তে আমার মাথায় বজ্রাঘাত করিলে না ?

যন্ত্রণায় দুইহাতে সে বুকখানা চাপিয়া ধরিল। ষ্টীমারের চাকার আলোড়নে জলরাশি যেমন করিয়া আলোড়িত হইতেছিল, সেখানেও তাহার অনুকরণ চলিতেছিল।

মেয়েমানুষের এত বড় নির্লজ্জতা আর কি কেহ কখন দেখিয়াছে ? সে যখন আমায় দেখিয়া প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, আমি কেন তখন লাজ-লজ্জার মাথা খাইয়া তাহাকে ডাকিলাম ! কি আশ্চর্য্য ! কথাগুলা বলিতে একটু লজ্জাও ত হইল না ?

এই নবোদ্ভূত ভালবাসায় সে সেই পূর্ব্বেকার প্রেমহীন দিবসের সগর্ব্ব নির্লজ্জ ভাবসকল স্মরণ করিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছিল। অম্বর তাহাকে এই নূতন সর্ত্তে বিবাহ করিতে কেন যে ইতস্ততঃ করিয়াছিল, সে রহস্যও আজ তাহার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল। বিবাহকে সে ছেলেখেলার চোখে দেখিয়াছিল ; কিন্তু তাহার মধ্যে যে কি গভীর ভাব ও মহাশক্তি নিহিত, অম্বর ত তাহা জানিত—কেমন করিয়া তাহাতে সে সম্মত হইবে ? তবে ? যদি ইহা বুঝিয়াই ছিল, তবে আবার কেমন করিয়া এ কাজ সে করিল ? কেন করিল ? না করিলে যে সে তাহার সর্ব্বস্বহারা হইত ! তা, হইত—হইত ; ইহার চেয়ে বোধ করি সে ভালই হইত !

নিঃশব্দে তাহার গণ্ড বাহিয়া প্রভাত পদ্মে অজস্র শিশির ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। উঠিয়া সে একবার ক্ষুদ্র কামরাটার চারিদিকে ঘুরিয়া

আসিল। এক স্থানে স্থির হইয়া থাকাও দুঃসাধ্য মনে হইতেছিল। হায়, যদি আমার মত এত না হোক্—আমায় একটুও ভালবাসিত!

মনে মনে আবার তখনই সে ভাবিল, না, ভালবাসিয়া কাজ নাই, ভালবাস নাই, ভালই করিয়াছ! বাসিলে ত আমার মত তোমাকেও আজ এই দুঃখ সহিতে হইত!

বিষাদপূর্ণ ম্লান হাসি হাসিয়া সে অশ্রু মুছিল। কে আর স্নেহ-কোমল স্পর্শে তাহার সে দুঃখাশ্রু মুছাইয়া দিবে? মুছিতে গিয়া মনে পড়িল, প্রাতে ট্রেণের কামরায় তাহার চোখে কয়লা পড়ার সময় অম্বর চোখে জলের ঝাপ্টা দিয়া তাহার সেই দারুণ যন্ত্রণায় শান্তি আনিয়া দিয়াছিল। আঃ, ভাগ্যে কয়লাটা ঠিক সময়ে পড়িয়াছিল। সেই সঙ্গে ইহাও মনে পড়িল, সে সময় তাহার যন্ত্রণা ও বেদনাশ্রু-সিক্ত গণ্ডে অম্বরের করাঙ্গুলির ক্ষণস্থায়ী মৃদু স্পর্শও সে অনুভব করিয়াছিল। মুছিবে কি! সে অশ্রুবেগ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সেই নিমেষের স্পর্শসুখ স্মরণ করিয়া সে অধীর আবেগে কাঁদিতে লাগিল—ফিরে এস, ওগো ফিরে এস, একটা সান্ত্বনার কথা বলিয়া যাও। মাতৃহীনা আমি, তুমিও আমার দিকে চাহিবে না, তবে আমার গতি কি হইবে? ওগো এস—এস, একবার এস—

সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করিয়া তীর-তরুদল-শিরে চাঁদ উঠিল। সেই বড় নক্ষত্রটা ঝিকি ঝিকি জ্বলিতে জ্বলিতে হাসিতে লাগিল। মেঘনার কৃষ্ণ বক্ষে সহস্র সহস্র নক্ষত্রচ্ছায়া সোণার গুঁড়া ছড়াইয়া জলটাকে স্বর্ণবর্ণ করিয়া দিল। এঞ্জিনের ঘরে অগ্নিগর্ভ বিরাট্ এঞ্জিন নিদারুণ মনঃক্ষোভেই যেন অস্ফুট গর্জ্জনে ফোঁস ফোঁস করিতেছিল। খালাসীরা ডেকের উপর ব্যস্তভাবে আনাগোনা করিয়া ফিরিতেছিল। যাত্রিগণ স্থানে স্থানে হইয়া নৈশ ভোজন ও শয়নের বন্দোবস্তে মন দিয়াছিল। কেহ কেহ

জটলা করিয়া তামাক খাইতেছিল। কোন নিশ্চিন্তচিত্ত মানব রেলিং ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রির নদী-শোভা সন্দর্শন করিতেছিল। একটি বৃদ্ধ আপন মনে গান ধরিয়াছিলেন—

"দোষ কারও নহে গো মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

বাণী রুদ্ধশ্বাসে শুনিল। তাহার অশ্রুবেগ আরও বাড়িয়া উঠিল। কাহার দোষ? হায়, কাহার দোষ? সত্যই ত, স্বখাত সলিলেই ত সে ডুবিতেছে। দোষ কাহারও নয়, শুধু একমাত্র তাহার—তাহার এ দশার জন্য সে নিজে সম্পূর্ণ দায়ী। স্বামি-প্রেম অনেকের ভাগ্যে ঘটে না, তাহার ত ভাগ্য-দোষও নহে, শুধু নিজেরই দোষ।

অশ্রুকাতর বিবশ হৃদয়ে সে অম্বরের মুখ ধ্যান করিতে লাগিল। কি সৌম্য! কি কোমল! আবার মনে পড়িল—'আমার স্ত্রী!' সে বলিয়াছে সে তাহার স্ত্রী! এ জন্মের মত এই শেষ, এই সম্বল! আর কিছু না। আর কিছু পাইবে না, পাইবার আশা মাত্র নাই—পাওয়া সম্ভবও নয়। এইটুকু লইয়াই তাহাকে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে। মৃত্যুর জন্য? হাঁ, মৃত্যু ভিন্ন আর কে তাহাদের মধ্যকার এই অচ্ছেদ্য পাশ মোচন করিতে সমর্থ?

ক্লান্ত শ্রান্ত বাণী অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া সে আজ আবার এই নদীবক্ষে সেই দীপ্ত হোমশিখা পার্শ্বে যজ্ঞপরায়ণ অম্বরকে তাহার সম্মুখে দেখিল, আর সেই গম্ভীর বেদমন্ত্রে তাহার উভয় কর্ণ ভরিয়া গেল—"ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বনের বিহঙ্গ খাঁচায় পোরা থাকিতে থাকিতে উড়িবার শক্তি হারাইয়া বসে। সে তখন দ্বার খোলা পাইলেও আর খাঁচার বাহির হইবার চেষ্টামাত্র করে না। অথচ হয় ত স্বাধীন জীবনের স্মৃতি লইয়াই সে তখন মনে মনে এই বন্দীদশাকে ধিক্কার দান করিতেছে।

মৃগাঙ্ক যেরূপ জীবন যাপনে অভ্যস্ত, তাহার মধ্যে কোথাও সংযম-শিক্ষার আভাস ছিল না। যখন যেটা খেয়াল হইয়াছে, তাহা মিটাইতে কোন দিনই সে দ্বিধা করে নাই। দিবালোকে দশের চক্ষের সম্মুখে খোলা নৌকায় খেমটাওয়ালী সঙ্গে গান বাজনা করিতে করিতে রাসদর্শনে যাত্রা প্রভৃতি বহু বীরোচিত কার্য্যেই সে এযাবৎ অগ্রণী ছিল। কাহারও ভৎর্সনা শাসন বা অনুনয় তাহার উড়ন্ত মনকে এক দিনের জন্যও যখন উড়িবার সাধে বীতস্পৃহ হইয়া হঠাৎ গৃহ-কোটরে আপনাকে আপনি বদ্ধ করিয়া ফেলিল, তখন সে দ্বারে কেহ অর্গল লাগাইয়া না দিলেও, সে যে স্বেচ্ছাবন্দিত্বে নিজেকে ধরা দিয়াছিল, তাহা হইতে নিজের চরণ মুক্ত করিয়া লইল না।

অজা দূরেই রহিল; কিন্তু দূরে দূরে থাকিয়া কি মোহিনী মায়াই যে সে তাহার স্বামী বেচারার উপর প্রয়োগ করিতেছিল, তাহা সেই বলিতে পারে। অথবা সেও হয় ত সে কথা জানে না; জানিতেছিল শুধু সেই মায়ামুগ্ধ অভাগা মৃগাঙ্ক একাকীই।

অজা প্রত্যূষ হইতে দেড় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সংসারের কাজ করিয়া যায়। কর্ম্মে তাহার এতটুকু শ্রান্তি নাই, বিরক্তি নাই! যেন কল ঘুরাইয়া কলের এঞ্জিন চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহার মধ্য হইতে অফুরন্ত

রাশি রাশি কর্ম্ম তৈয়ার হইয়া বাহির হইতেছিল। সে কার্য্যে তৎপরতা, নিপুণতাই বা কি! ঠাকুরঘরের পরিচ্ছন্নতায় ঠাকুর যেন প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিতেছেন এমনই মনে হয়। রন্ধন ভোজন স্থান ও ভাণ্ডারের পরিপাটি শৃঙ্খলা সৌকুমার্য্যে কমলার প্রসন্ন মূর্ত্তিখানি যেন তৎতৎ স্থানে দেদীপ্যমান! কত রকম করিয়া বাড়ী সাজান হইয়াছে, কত প্রকার ব্যঞ্জন রাঁধা, মিষ্টান্ন প্রস্তুত চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কর্ম্মকর্ত্রী যেন একটা মানুষ সাতটা হইয়া খাটিতেছে। মন তাহার নবীন উৎসাহে ভরা, সুখের উচ্ছ্বাসে নিজের পরিধিকে শুদ্ধ হারাইয়া ফেলিয়া সেই হৃদয় সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে। এ আনন্দে স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মী অন্নপূর্ণার ন্যায় সারা জগৎকে সে নিজের হাতে খাওয়াইবার মহাভার গ্রহণ করিতেও পিছায় না—এই ছোট সংসারটির সকল ভার মাথায় তুলিয়া লওয়া এ এমন আর বিচিত্র কি?

মৃগাঙ্ক চাহিয়া দেখে, দেখিয়া অবাক্ হয়; আর তাহার মনে গভীর অনুশোচনা জাগিয়া উঠে। আনন্দগর্ব্বও যে অনুভূত হয় না এমন কথা বলিতে পারা যায় না! সে আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহার আগুন-তাতে রাঙ্গিয়া-ওঠা মুখখানির অপূর্ব্ব মহিমা দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হয়। গৃহে দুই-চারিটি প্রতিপাল্য আছে; তাহাদের প্রতি সকরুণ সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহ-প্রকাশ তাহাকে ভক্তিভরে অবনত করে। তাহার নিজের জন্য একান্ত মনোযোগে প্রতি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সেবার আয়োজন প্রত্যক্ষ করিয়া স্নেহ-প্রেমে সে কণ্টকিত হইয়া উঠে। তাহার মত লক্ষ্মীছাড়া মানুষের ঘরে এমন লক্ষ্মী।

কিন্তু সে এমন একটা সুযোগ পায় না যে, সেই কর্ম্মলক্ষ্মীকে হৃদয়-সাম্রাজ্যের মহাভিষেক-সংবাদটা স্পষ্টভাবে প্রদান করিয়া বিদ্রোহান্ত চিহ্ন সন্ধির শ্বেত-পতাকা তুলিয়া ধরে! অজ্ঞা তাঁহাকে আঁচাইবার জল,

খড়িকা, হাত মুছিবার গামছাখানি অবধি যোগাইয়া দেয়, শুধু এই সুযোগটুকু দেয় না। অনভ্যাসের লজ্জায় সেও মনে করে, কেমন করিয়া বলি যে তুমি আমার বন্ধু নও, স্ত্রী!

সহসা একদিন এই কথাটা বলিবার সুযোগ মিলিয়া গেল। দিদি ঠাকুরাণী দ্বৈপ্রহরিক নিদ্রায় মগ্ন, পরিচারকবর্গ সকলেই যে যাহার কাজে বাহিরে। যাহারা ঘরে আছে সকলেই মহতের অনুকরণে তথাকার্য্যে ব্যাপৃত। নিরলস বধূ কেবল বিশ্রাম-চিন্তা ভুলিয়া একরাশি পাকা তেঁতুল লইয়া কাটিতে বসিয়াছে।

একতাল কাটা তেঁতুল একটা বড় বলের মত করিয়া পাকাইয়া অজা বঁটি কাৎ করিতে গিয়া দেখিল সে একা নয়, দ্বারের সম্মুখে আর একজন দাঁড়াইয়া আছে। এই লোকটি যে তাহার বন্ধু বা স্বামী, তাহা বুঝিতে তাহার কালবিলম্ব হইল না। কাৎ-করা বঁটি সোজা করিয়া সে আবার পূর্ব্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। অজা মেয়েটীকে নেহাৎ ভালমানুষের মতই দেখায়; কিন্তু আজকাল বোধ করি সেও বেশ একটুখানি চাতুরি শিখিয়া ফেলিয়াছে।

মৃগাঙ্ক তাহার ভাবটা বুঝিয়া লইয়াছিল। সে একটুখানি হাসিয়া কহিল, "শুনেছ বন্ধু, আমি যে কাল চাকৃরি করতে যাচ্ছি।"

শুনিয়াই অজা হঠাৎ এমন চমকিয়া উঠিল যে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার একটা আঙ্গুল বঁটীর ফলায় কাটিয়া গিয়া তাহা হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

"আহাহা, কি কর্লে।" বলিয়া মৃগাঙ্ক তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া সেই হাতখানা ধরিয়া ফেলিল—"কতখানি কেটে গেল। উঃ, অনেকটা যে—" বলিতে বলিতে তাহার মৃদু মৃদু আপত্তি উপেক্ষা করিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের পরিধেয় বস্ত্রের অংশ সে ছিঁড়িয়া লইল; এবং রক্ত বন্ধ করিবার

জন্য কাটা স্থান আঁটিয়া বাঁধিতে বসিল। জল দিলে হয় ত শীঘ্র উপকার হইতে পারে। কিন্তু পাছে জল আনিতে গেলে সে উঠিয়া পলায়, সেই ভয়ে এই সহজ উপায় অবলম্বন করিতে সাহসে কুলাইল না।

অজা বিস্তর আপত্তি ও কাপড় ছেঁড়ার জন্য যথেষ্ট অনুযোগ করিয়া কিছুতেই তাহার হাত এড়াইতে না পারায়, আহত হাতখানা অগত্যাই স্বামীর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল। সুগভীর আনন্দে ও লজ্জায় তাহার মুখখানা রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। টানাটানি করিতে কতকটা শ্রমও যে না হইয়াছিল এমন নহে।

মৃগাঙ্ক কহিল, "কত কষ্ট হবে! এই কাটা হাতে যেন কিছু কাজ করতে যেও না, তা হলে সায়তে দেরী হ'তে পারে।"

অজা নত নেত্রে কহিল, "অমন কত কাটে। ওটুকু গ্রাহ্য কর্‌লে কি আর মেয়েমানুষের চলে? থাক্ বেশ হয়েছে, রক্ত আর ত পড়ছে না।"

"না, রক্তটা বন্ধ হয়েছে।—এত কাজ কর তবু তোমার হাতখানি কি নরম? যেন একমুঠো ফুল!"

ঘন রক্তের দ্রুত উচ্ছ্বাসে আরক্ত গণ্ডে সে সেই প্রশংসিত হাতখানা সবেগে টানিয়া লইতে গেল; কিন্তু ইতঃমধ্যে সেখানার সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা লওয়া হইয়াছিল বলিয়া সে ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। লাভের মধ্যে সদ্যক্ষত ঈষৎ আহত হইয়া শোণিতক্ষরণ করিল।

"উঃ, কি কর্‌লাম!" বলিয়া অপ্রতিভ মৃগাঙ্ক লজ্জায় হস্ত ত্যাগ করিল!

আঁচলে কাটা হাতখানা ঢাকিয়া ফেলিয়া অজা সান্ত্বনার ভাবে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "না, না, ও কিছুই নয়।"

মৃগাঙ্ক নীরবে রহিল। সে মনে মনে যেটি গড়িয়া পিটিয়া আসরে নামিয়াছিল, ভাগ্য এক বঁটির ঘায়ে তাহার সবটাই কাটিয়া দিয়াছে।

এখন সে কি করিবে? কি রকমটা দাঁড়ায়, তাই ভাবিয়া সে যেন একটু 'ভেকা' হইয়া রহিল।

অজা অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিল। স্বামীর মুখ দেখিয়া তাহার মনে হইল, তাহার হাতে লাগিয়া যাওয়ায় সে বড় দুঃখিত হইয়াছে। আহা, এতটা যত্ন করিয়া শেষে কি না অপরাধের ভার মাথায় বহিবে? না, না, সে সহ্য হয় না। তাহাকে এই ছোট বিষয়টা হইতে অন্যমনা করিয়া দিবার জন্যই জোর করিয়া লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সে কহিল, "সত্যিই কি কাল যাবে?"

"হাঁ, যাব বলেই ত স্থির করেছি। কেন যাব না? কে আমায় যেতে বারণ করবে? আমার আছে কে?"

কথাটা বড় অভিমানের, অথচ মিথ্যা নয়! কে বারণ করিবে? কথাটা বলিবার ধরণে মনে যেন কোন একটা কষ্ট জাগে, সহানুভূতি বোধ হয়! সে একটু হাসিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুইটা ঈষৎ ছল ছল করিয়াও উঠিল; গাঢ়স্বরে বলিল, "ভাল কাজে কি বারণ করতে আছে?"

"তা না-ই থাক্, তবু আত্মীয়-জনে এমন বলেও ত থাকে যে, দুদিন পরে যেয়ো—না হয় ত বলে, আমাদেরও নিয়ে চল। যার কেউ কিছু বল্‌বার নেই, সে দশ দিন আগে থাকতে গেলেই বা ক্ষতি কি? সেখানে না খেয়ে আপনি রেঁধে, চাকর চলে গেলে কাপড় কেচে ঘর ঝাঁট দিয়ে রোগে পড়্‌লেই বা কার কি এসে যায়?"

মৃগাঙ্কর মুখখানা খুব গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। অজা তাহার এই বেদনাযুক্ত কথাগুলি শুনিয়া ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়া দৃষ্টি নত করিল। ইহাতে তাহাকে যেন কে সুতীক্ষ্ণ তীরে বিঁধিল। সে তখন আত্মবিস্মৃতা হইয়া অকস্মাৎ চমকিয়া বিস্ফারিতনেত্রে ফিরিয়া চাহিল, কহিল,

"সত্যি! সেখানে বামুন চাকর পালিয়ে যায়? তবে ত তোমার বড্ড কষ্ট হবে?"

"হ'লে আর কি করছি বল?"

"না না, তবে তুমি না হয় যেয়ো না।"

"যাব না! বল কি? পুরুষ মানুষ, চিরকাল ঘরের কোণে বসে বোনের পয়সা ওড়াব এই কি ভাল? তুমিই বল, এ কি ভাল?"

"না।" অজ্ঞা সরল চোখ দুটি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিল; মৃদুস্বরে কহিল, "না—সে করা ত ভাল নয়ই—তুমি চাকরী করবে শুনে আমার বড় আহ্লাদ হয়েছিল। দিদি কিন্তু খুব রাগ করবেন, তিনি বলেন, তাঁর ত টাকার অভাব নেই, তবু—"

"ঠিক, তবু আমার চিরদিন ধরে ঘরে বসে তাঁর পয়সা খাওয়াটা ভাল দেখায় না। তাঁর কাজ তিনি করছেন, আমারও একটা কর্ত্তব্য আছে ত? কাজেই দেখছি না গেলে নয়। চাকরীটিও খুব ভাল, লেখা পড়ার কাজ, অথচ দেড়শো টাকার উপর দেবে, পরে আরও বাড়িয়ে দেবে বলেছে।"

"তবে যেয়ো।"

"যাব কিন্তু রাঁধতে গিয়ে গরম ফেনে হাত পুড়িয়ে মরি ত দোষ দিয়ো না। তোমার আর ক্ষতিই বা কি? শুধু সিঁথের সিঁদুরটুকু মুছতে হবে আর ঐ লোহাগাছা—তা হোক্, তাতেও তোমায় মন্দ দেখাবে না। একাদশী করবার তোমার দরকার নেই। আর মাছ—'

"ও কি সব বল? ছিঃ!" সহসা মৃগাঙ্কর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত করিয়া সেই কয়গাছি বেলোয়াড়ি চুড়ি রুনুঝুনু রবে বাজিয়া উঠিল। সেই "ফুলের মত হাতখানা" এক মুহূর্ত্তে তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল—"ও সব কথা কি বলতে আছে? তুমি অমন করে আর বলো না—ওতে আমার মনে

বড় কষ্ট হয়। তার চেয়ে তুমি যেমন ছিলে সেও ভাল। না হয় ভাল নাই হ'লে, চাকরী না-ই করলে। এখানেই থাক।"

"না বলে কি করি বল? তুমি কি আমায় সাহায্য করতে যেতে চেয়েছ? দিদি বললেন, 'বউ কিসের সুখে যাবে?' তুমি ত কিছু বললেই না। অমন মানুষের বঁটিতে কেটে যাওয়া, উনুনের তাতে ঝলসে মরা, গরম ফেনে পুড়ে—"

"তা তুমি যদি আমার যাওয়া দরকার মনে কর ত কেন যাব না? কিন্তু—"

"কি, কি—বল না কি, কিন্তু?"

অজা হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল; কহিল, "লোকের কাছে কি বলবে? বন্ধু?"

"আবার বন্ধু! বলেছি না, ও শব্দ আমি তোমার মুখে আর শুনতে চাই নে!"

অজা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; হাসিমুখেই কহিল, "তবে আমি আর কেমন করে তোমার সঙ্গে যাব? তুমি ত আমার বন্ধুত্বও চাও না, বলছ?"

"না, তোমার বন্ধুত্ব চাই নে, আমি তোমায় চাই। অজা, আমার নবজীবনদায়িনী, কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরূপে তোমায় আমার জীবনের সঙ্গে অটুট বন্ধনে বাঁধতে চাই। না, সরে যেয়ো না, আমার সব মোহ কেটে গেছে। তোমার পুণ্যপ্রভাবে মনের অন্ধকার কলুষ দূর হয়েছে। আজ আমার জীবনপ্রভাত! অজা, তুমি আজ এ নবজীবনের অধিষ্ঠাত্রী! এস, কাছে এস, আমায় তোমার কাছে টেনে নাও। ভুল ভ্রান্তি মুছে ফেলে, এস, আজ দুজনে আমরা এক হ'য়ে যাই। ও কি—কোথা যাও? দিদি আসছেন? এলেনই বা! দিদি কি মনে করবেন? মনে করবেন, তাঁর হাড়-লক্ষ্মীছাড়া ভাইটা আজ লক্ষ্মীলাভ করে কৃতার্থ হ'ল।

—এস দিদি! দেখ, তোমার বউ আমার কথা বিশ্বাস কর্‌ছে না। ওকে বল্‌ছি যে, দিদি তাঁর অধঃপতিত ভাইয়ের উদ্ধারকর্ত্রীর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ—তিনি তাকে আজ নিজের কর্ত্তব্যের পথে প্রবেশ কর্‌তে দেখলে যথার্থই সুখী হবেন। ঠিক বলি নি দিদি? ও কিন্তু এখনও বোধ করি, আমার আগেকার পাপ ক্ষমা কর্‌তে পারে নি।"

এ সংসারে একজনের প্রভাবে সকলেরই নবজীবন-লাভ ঘটিয়াছিল। প্রসন্নময়ী মৃত্যুমুখ-প্রত্যাবৃত্তা হইয়া অবধি ভ্রাতৃবধূর প্রতি গভীর স্নেহসম্পন্না হইয়াছিলেন। ভাইয়ের অনুযোগে ভ্রাতৃজায়ার দিকে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। অজা অবগুণ্ঠন টানিয়া একটু সরিয়া গিয়াছিল। সূক্ষ্ম বস্ত্রান্তরালে তাহার নেত্রপতিত আনন্দাশ্রু শুক্তিগর্ভে মুক্তাবিন্দুর মতই শোভা পাইতেছিল। তিনি তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, "কেন বউ, ও ত আর সে রকম নেই, তোমার গুণে যে নতুন মানুষ হয়েছে। না, ছিঃ, চোখের জল মুছে ফেল। স্বামীর দোষ অপরাধ কি স্ত্রীর মনে রাখতে আছে? সে সব ভুলে যাও। আয় মৃগু, আজই তোদের যথার্থ বিয়ে! দুজনের হাতে হাতে স'পে দিয়ে আজ তোদের আমি আশীর্ব্বাদ করি আয়—দুজনে চিরজীবী হয়ে মনের সুখে ঘর-সংসার কর, ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।"

তিনজনেরই চোখ দিয়া অনাহূত সুখের অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাহারই ভিতর রৌদ্র-বৃষ্টির ন্যায় হাসি হাসিয়া গভীর আবেগের সহিত মৃগাঙ্ক কহিল, "এবার তা হবে দিদি, এবার আমরা সুখী হ'তে পারব। সেবার ত তুমি আমাদের এমন করে এক করে দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর নি, তাইতেই না অমনটা ঘটেছিল।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া বাণী দেখিল, এ গৃহ আর তাহার পূর্ব্বেকার সে সুখ-নিকেতন নাই। কে যেন সমুদায় আকর্ষণ কাড়িয়া লইয়া নিঃসার গৃহখানাকেই শুধু তাহার জন্য ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে! যে গৃহের জন্য সে আপনাকে এই মৃত্যুপণে বদ্ধ করিয়াছিল, এ যেন সে গৃহই নয়। মন্দিরে প্রবেশ করিতে গেল, মনে ভাবিল, আর কিছু না থাক, যাঁহাকে লইয়া এতদিন কাটাইয়াছি সেই চিরসুহৃদ্ ত আমার আছেন। কিন্তু নিজের অপরাধের গুরুভারে সে আজ ভাল করিয়া তাঁহার স্থির সহাস্য দৃষ্টির দিকে চাহিতে পারিল না। অহঙ্কারে জ্ঞানহীনা সে নিজের উদ্ধত গর্ব্বে কাহারও পানে চাহে নাই—তাঁহার এই বিপুল বিশ্বের দিকে অন্ধ সে যে এতদিন একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়াও দেখে নাই, সমস্ত জগৎ ছাড়িয়া নিজেকে শুধু এই মন্দিরগর্ভে বদ্ধ করিয়া ভাবিয়াছিল, তাঁহার প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়াছে! কখনও কাহারও সুখে দুঃখে এ জীবনের একবিন্দু হাসি বা অশ্রু সে কোন দিনই মিলায় নাই। কোন রোগতপ্ত চিত্তে সহানুভূতিধারা ঢালিয়া দিতে চাহে নাই, শুধু খেলাই করিয়াছে। পূজার ভানে খেলা করিয়া গিয়াছে। হাঁ, খেলা ভিন্ন আর কি? অজস্র পুষ্পচন্দন, ঢাকঢোল, শঙ্খঘণ্টার মহা আড়ম্বর আয়োজনেই জন্ম গোঙাইল, কিন্তু সেই সঙ্গে আসল জিনিষটুকুর দিকে কতটুকু সে চাহিয়াছিল? ফুলচন্দন চাই, শঙ্খঘণ্টাও না চাহি এমন নয়, সে সকল সাত্বিক বাহ্যোপকরণ ত চিত্তশুদ্ধিরই জন্য—মনকে সত্বভাবাপন্ন-করণের ইহারা ত সহায় মাত্র—কিন্তু তারপর? কোথায় পূজা? সে ধ্যানের মন্ত্রপাঠ করে কিন্তু ধ্যান করে কি? শুধু উপকরণের আয়োজনেই ব্যাপৃত; যাঁহার জন্য এ উদ্যোগ তাঁহার কথা কতটুকু মনে থাকে?

এক সময়ের কথা মনে পড়িল। ফুলচন্দন থরে থরে সাজান থাকে, ঘণ্টাশঙ্খ স্থানত্যাগও করে না, নিঃশব্দে পূজা শেষ হইয়া যায়—সেই মূর্খ পুরোহিতের অজ্ঞ পূজা! গোপীবল্লভ, সেই একজনই তোমার প্রকৃত পূজা করিয়াছিল। এই মন্দিরের অন্য কোন পূজারী তেমন পূজা বুঝি একদিনও করিতে পারে নাই, কেবল আড়ম্বরের ভার চাপাইয়াছে। যে পূজায়—পূজ্য-পূজকে তন্ময়তা না আসিল, সে পূজা আবার পূজা কি? আচ্যনাথের সাড়ম্বর দেবারাধনা আর তাহাকে তৃপ্তিদান করিতে পারিল না। আজ তাহার কাণে ঘণ্টার শব্দ বড় কর্কশ ঠেকিতে লাগিল, কোশাকুশির সংঘর্ষ বড় বেশী শান্তিভঙ্গ করিল, মনে হইল, যাহাতে করিয়া বাহ্য উপকরণের কথা স্মরণেও থাকে না, ধ্যানের মধ্যে তেমন তন্ময়তা কৈ?

আচ্যনাথ চলিয়া গেলে নিজে সে রুদ্ধদ্বার মন্দিরে পূজার আসনে আসিয়া বসিল। রাঙ্গা পা-দুখানি ফুলের ভারে ঢাকা পড়িয়াছে, দুই দণ্ড চোখ ভরিয়া দেখিবে, সে উপায়ও নাই! সে চারিদিকে চাহিয়া সভয় মৃদুকণ্ঠে কহিল, গোপীবল্লভ! শুধু আজ তুমি আমার সে গোপীবল্লভও নও। তুমি রাধার প্রেমে একবার নারীকুঞ্জে শ্যামারূপ ধারণ করেছিলে, আজ আমার জন্য আর একবার সেই মূর্ত্তি ধারণ কর মা! না বুঝে একদিন তোমার চরণ পদ্ম হতে যে ভক্তের দান কেড়ে নিয়েছিলাম, আজ তা ফিরিয়ে দিতে এসেছি—নাও মা, দীনের এ পূজা গ্রহণ কর। এ হৃদয়-রক্তজবা আজ ওই শিব-সেবিত চরণে দিচ্ছি, তুমি যেন ফিরে দিয়ো না! এতদিন শুধু স্বামী, শুধু সখা ভেবে এসেছি। আজ সে স্থানে তোমার প্রতিনিধি—তোমার শরীরী মূর্ত্তি তুমিই পাঠিয়েছ, তাই আজ তাঁর সহধর্ম্মিণীরূপে তাঁরই সঙ্গে সমচিত্ত একহৃদয় হয়ে তাঁরই বিশ্বাসের বিশ্বাসে ডাকছি—মা, মা, মা বিশ্বজননি! আমায় শান্তি দাও, মনুষ্যত্ব

দাও, তাঁর যোগ্য কর! নাই বা পেলাম—সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম যেন কায়মনোবাক্যে পালন করতে পারি। তিনি আদেশ করেছেন, 'মম চিত্তমনুচিত্তন্তেহস্তু।'—আমার স্বামীর আদেশ—সে ত তোমারি আদেশ, মা! সেই আমার দেবাদেশ!—তিনি বলেছেন, 'আত্মা পরমাত্মা অভিন্ন!' —'এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই!' আমি বেশী কিছু জানি না—শুধু এইটুকুই আমার যথেষ্ট! তোমাতেই তিনি, তাঁহাতেই তুমি—আমার এ পূজা তাঁর মধ্যে যখন, তখনও তোমাকেই, তোমার মধ্যে যখন তখনও তাঁকেই। তিনি যে বলেছেন, "জগতে এক ভিন্ন অপর নাই।"

পরম পরিতৃপ্তির অশ্রুজল অবিরল ধারায় বাণীর নিরহঙ্কার শান্ত মুখখানি প্লাবিত করিয়া দিল। মনের শত মণ ভার লাঘব করিয়া সেখানে মাতৃ-আশীর্ব্বাদ যেন স্নিগ্ধ শান্তিজল বর্ষণ করিল।

সেদিন বাণীর যেন জীবনের স্রোত ফিরিল। সে আর কিছুতেই সুখ পায় না; কেবল পরের জন্য কর্ম্মে একটু শান্তি পায়। তাই শুধু মন্দিরে ফুল সাজান, মালা গাঁথা এই একমাত্র কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্মেও সে নিজেকে টানিয়া আনিল। সে দেখিল, নিজের দুঃখভারে এতদিন সে তাহার পিতার দিকে চাহিয়া দেখে নাই! অথচ তাহার চেয়ে কোন অংশে তাঁহার দুঃখ কম? স্নেহময়ী মায়ের মত পিতৃবৎসলা কন্যা পিতার সমস্ত ভার একদিনেই সে গ্রহণ করিল। দেখিল শান্তি এইখানেই যা কিছু একটুখানি থালি আছে। রমাবল্লভ ইহা লক্ষ্য করিলেন। সে যে ম্লান মুখে তাঁহার কাছটিতে ঘুরিয়া বেড়ায়, যে কখনও কোন কাজ করে নাই, সে সব কাজ এখন নিজের হাতেই টানিয়া লয়। ইহাতে কিন্তু তাঁহার তনয়াবৎসল পিতৃহৃদয়ে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই জাগিয়া উঠে। কোন্ অবস্থা তাহার সেই সংসারের অতীতজীবনটিকে এমন করিয়া বদলাইয়া দিয়াছে! তাঁহার মানবচরিত্রানভিজ্ঞ বৃথাভিমানী হৃদয়ই না ইহার জন্য প্রকৃত

অপরাধী! কৃষ্ণপ্রিয়াই ঠিক বুঝিয়াছিল। হায়, কেন সে-সতীর উপদেশ তিনি গ্রহণ করিলেন না?

একদিন আর সামলাইতে না পারিয়া রমাবল্লভ হঠাৎ কন্যাকে বলিয়া ফেলিলেন, "এবার অম্বরকে কি রকম রোগা দেখে এলেম! কিছুতে স্বীকার কর্‌লে না কিন্তু নিশ্চয় সে অসুস্থ। তুমি তাকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে রাধারাণি?"

বাণী ঈষৎ চমকিয়া উঠিল—ঠিক কথা! তাহার স্বাস্থ্যসম্পদভরা সবল শরীর কত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে! সে ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল বৈ কি! তাহা যে স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু নিজের অসীম দুঃখের চাপে সে কথা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। চিরস্বার্থপরায়ণা সে, শুধু নিজের কথা ভাবিতেই সে অভ্যস্ত।

তাহাকে নীরব দেখিয়া রমাবল্লভ আবার কহিলেন, "বোধ করি সে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। কিন্তু কখন লেখেও না। আমি দু-তিনখানা চিঠিতে তাকে শরীর সম্বন্ধে সব কথা খুলে লিখতে বল্‌লাম, তা একই জবাব দেয়, 'আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না, আমি ভালই আছি।' তুমি একখানা চিঠি লিখে যদি জান্‌তে পার, দেখ না।"

শেষ কথা কয়টা রমাবল্লভ একটু দ্বিধার সহিতই উচ্চারণ করিলেন। বাণীও কথা কয়টা শুনিয়া মনের মধ্যে ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিতার ইঙ্গিত সেও বুঝিয়াছিল। পিতাই যে গোপন চেষ্টায় সেদিন ষ্টেশনে অম্বরকে আনাইয়াছিলেন, সে সাক্ষাৎ যে আকস্মিক নয়, এ কথাও সে জানিত। তারপর নির্জ্জনে সাক্ষাতের সেই সুযোগ! তাহার চোখে হঠাৎ জল উথলাইয়া উঠিতে চাহিল। কিন্তু আজ আর সে স্বামী সম্বন্ধে পিতার সম্মুখে এতটুকু আলোচনা করিতে সমর্থ নয়। যে প্রেমহীনতার দূরত্ব তাহাকে তাহার কাছে পর করিয়া রাখিয়াছিল, আজ যে তাহার

মৃত্যু ঘটিয়াছে, এখন সে নাম স্মরণেও ললাটে কপোলে লজ্জার রক্তিমা ফুটিয়া উঠে। পিতার সমক্ষে কোন্ নববিবাহিতা কন্যা তেমন নির্লজ্জা হইতে পারে?

"লিখবি ত রাধারাণি? লিখিস্ মা। যে শরীর তার হয়েছে, তাতে যত্ন না কর্‌লে কতদিন টেঁক্‌বে?" বলিতে বলিতে রমাবল্লভ সেই ঘোর বিপদের কল্পনায় যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন।—"লিখিস্ মা, একবার হাওয়া বদল করুক, না হলে আমাদের মন থেকে এ ভাবনা যাবে না।"

বাণী বুঝিতে পারিল, তাঁহার গলা কাঁপিতেছে। পিতার ভাবনা দেখিয়া সেও অম্বরের সেই শান্ত মুখ ও ক্ষীণ বাহু স্মরণ করিয়া মনে মনে বড়ই ভীতা হইল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে শেষে এইরূপ একখান পত্র লিখিল, "তোমায় এবার দুর্ব্বল ও অসুস্থ দেখিয়া আসিয়া অবধি বাবা অতিশয় চিন্তিত হইয়া আছেন। তিনি আমায় লিখিতে আদেশ করিলেন যে, কিছুদিনের জন্য তুমি ওখান হইতে এখানে আসিয়া—না হয় ত অপর কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে চলিয়া গিয়া শরীরটা বেশ ভাল করিয়া সারাইয়া আইস। কি অসুখ তাহা জানিবার জন্য তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল। 'কিছু নয়' লিখিলে তিনি কোনমতেই সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। যথার্থ কথা লিখিবার জন্য বিশেষ করিয়াই অনুরোধ করিতেছেন। এখানকার সমস্ত মঙ্গল। বাবার ইচ্ছা যেন সত্বর স্থান পরিবর্ত্তন করা হয়।

পত্রখানা পাছে অশ্রুচিহ্নিত হইয়া যায়, এই ভয়ে ছত্র কয়টা লিখিতে লিখিতে বাণী বার বার চোখ মুছিয়া লইল। এই তাহার প্রথম পত্র! কত আশার বাণীতে কোথায় এ লিপি পূর্ণ থাকিবে, তা না হইয়া কে যেন কাহাকে পত্র লিখিতেছে। বর্ষার অজস্র বারিরাশি ভরা সজল জলদতুল্য তাহার হৃদয় অবসন্ন বর্ষণের আগ্রহে সঘনে কাঁপিয়া উঠিতেছে। একটুকু

একটুখানি অনুকূল বায়ু লাগিলেই তাহা সাহারার তপ্ত মরুবক্ষে সমুদ্র সৃজন করিতে পারে। কিন্তু কি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তাহাদের মাঝখানে; ইহার প্রভাব যে কাহারও রোধ করিবার সাধ্য নাই। অগস্ত্য ঋষির মত এ সমুদ্র যে গণ্ডুষে শুষিয়া রাখিতেই হইবে।

অল্প কয়দিন পরে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষিত পত্রোত্তর আসিল। তাহার নামে নয়, তাহার পিতার নামে।

"প্রণাম শতকোটি নিবেদন,

আমার জন্য আপনি সবিশেষ উৎকণ্ঠিত জানিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আমার স্বাস্থ্য বিশেষ মন্দ বলিয়া ত আমার মনে হয় না। মধ্যে মধ্যে জ্বর হইয়া থাকে বটে, তা সেজন্য এমন কিছু চিন্তার কারণ নাই। ডাক্তার বলিয়াছিলেন ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর মাত্র। আপাততঃ আমি বেশ ভালই আছি। শীঘ্রই চট্টগ্রামে যাইতে হইবে। চট্টগ্রামের জল বায়ু উত্তম। আশা হয়, এই উপলক্ষে ম্যালেরিয়ার দোষটুকুও সারিয়া যাইবে।

সেবক শ্রীঅম্বর।"

যথাকালে বাণী পত্রখানা সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিল। পাঠের পর সেখানার উপর মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ সে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। যখন মুখ তুলিল, তখন পত্রখানা তাহার চোখের জলে ভিজিয়া কালীমাখা হইয়া গিয়াছে। শাস্তি যেন অপরাধকে অনেক দূরেই ছাপাইয়া উঠে!

গ্রীষ্ম কাটিয়া বর্ষা আসিল। অবিরল জলধারে ধরণীর তপ্ত বক্ষ জুড়াইয়া কেতকী কদম্ব পরাগ-রেণুতে বিশ্বজননীর চরণ বন্দনা করিয়া শ্যামশষ্পসম্ভারে শ্বেত কাশকুসুমে ধৌতধূলি কোমল ঘনপত্রপল্লব ভারত-বক্ষ ভূষিত করিয়া চলিয়া গেল। শরতের নির্মেঘ আকাশে বর্ণের ক্রীড়া, হেমপীতাভ রৌদ্রে মাঠে মাঠে শ্যামলতার অপূর্ব্ব শোভা, নদী তড়াগের পূর্ণ জলস্রোতে স্নিগ্ধ বায়ুর সানন্দ বিচরণের মধ্যে শারদোৎসব

জাগিয়া উঠিল। কৃষ্ণপ্রিয়ার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ সবিশেষ শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে বাণী সম্পন্ন করিল। সকলকে যথাযোগ্য সমাদর সম্ভাষণ আপ্যায়নে একবিন্দু ত্রুটি রাখিল না। সমারোহ কার্য্য—বিস্তর ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। অম্বরের প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠী সকল হইতে ছাত্রবৃন্দ ও অধ্যাপকগণ আসিলেন। আসিল না শুধু অম্বর। রমাবল্লভ ইহাতে মনে বড়ই আঘাত পাইলেন। এইটুকু সে ইচ্ছা করিলেই পারিত। ইহাতে লোকেই বা কি ভাবিল!

বাণী শুধু নিশ্বাস ফেলিল। তাহার আসিবার যে পথ নাই সে কথা শুধু সে-ই ত জানে।

তুলসী আজকাল দু-তিনটি ছেলেমেয়ে লইয়া সংসারে জড়িত। সর্ব্বদা যাওয়া আসা করিতে অক্ষম; সুবিধা পাইলেই সে আসে। সে বিস্মিত হইয়া গালে হাত দিয়া কহিল, "দেশবিদেশের লোক এল, একা সেই আস্‌তে পার্‌লে না! কি ব্যাপার, বল দেখি? সেখানে আর একটা বিয়েটিয়ে করে বসে নেই ত?"

বিবাহ? আহা, তাহাও যদি করিত। তবু একটা সান্ত্বনা থাকিত, যে, সে নিজেও তবু সুখী হইয়াছে। বাণী না হয় একা একা দুঃখের আগুনে পুড়িয়াই মরিত। তা নয়, নিজের ত এই, সেও এ জন্মটা তাহাদেরই জন্য এমন করিয়া বৃথা অপব্যয় করিতে বাধ্য হইল; মানব-জীবনের কোন সাধই সে তাহাদের অত্যাচারে মিটাইতে পাইল না। বাণী মুখ নত করিয়া শুধু ঈষৎ শূন্য হাসি হাসিল।

হিমকণাবাহী শীতল পবন সঙ্গে শীত দেখা দিল। গাছগুলা আড়ষ্ট; তাহারা ফুল দেয় না; পাতা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। শুষ্কপত্র হিম-বিন্দুতে ভিজিয়া মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া যায়। মন্দিরের বৃহৎ দালানে রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া বাণী কুন্দকলির মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ভাবে,

এই শীতে কত দরিদ্র বস্ত্রাভাবে কাঁপিতেছে, আর আমি পশমে রেশমে গা মুড়িয়া দিব্য সুখে বসিয়া রহিয়াছি। সে ঢোল পিটাইয়া দীন দরিদ্র জমা করিয়া তাহাদের গরম কাপড় দান করিল। দরিদ্রের দুঃখ আজকাল তাহার প্রাণে বজ্রের মত বাজিয়া উঠে। তাই গ্রীষ্মে জল দান, বর্ষার দিনে ছত্র ও শীতে শীতবস্ত্র দিয়া সে যে-কয়টি আর্ত্ত নারায়ণকে পারে, তৃপ্ত করিতে চাহে। গরীব যে তাহার স্বামীর প্রাণ! আর সে নিজেও যে দরিদ্র! বাণী কি তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারে?

শীত কাটিয়া আবার বসন্ত আসিল। সারা জগৎ যেন নূতন প্রাণ পাইয়াছে, এমনই ভাবে সাড়া দিয়া উঠিল। পত্রহীন কৃশকায় বৃক্ষগুলা কচি কচি রাঙ্গা পাতায় আ-প্রান্ত খচিত হইয়া উঠিতেছে, কোনখানে সঙ্গে সঙ্গে থলোয় থলোয় রং বেরঙের ফুলের কুঁড়ি মসৃণ পাতাগুলির শেষপ্রান্তে বাহার খুলিয়া দিয়াছে। দিবালোকের মত পরিষ্কার, যেন দুঃখাবসানে নবীন সুখ শান্তিতে ভরা হৃদয়ের মত চাঁদনি ফুটিয়া উঠিল। বাণী ভাবিল, এ কি পরিবর্ত্তন! যাহা গেল, মাটিতে পড়িয়া মাটির সঙ্গে মিশিল, এই নূতন কি তাহারই পরিবর্ত্তিত রূপ অথবা এ নূতন সম্পূর্ণই নূতন?

সে পিতাকে গিয়া বলিল, "বাবা, আমি পুকুর প্রতিষ্ঠা কর্‌ব। গাঁয়ের নদী যে দূরে—আমায় পুকুর কাটিয়ে দাও। শুনেছি, পুকুর প্রতিষ্ঠায় না কি খুব পুণ্যি হয়।"

রমাবল্লভ সানন্দে উত্তর দিলেন, "তা, কর না মা! তোমারই ত সব, তুমি যা ইচ্ছা কর্‌তে পার।"

বাণীর মনে পুণ্যের লোভ ছিল না, দরিদ্রের অভাব বুঝিয়াই সে জলাশয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিল। সকল সময়েই তাহার মনে হয়, অম্বর থাকিলে কি করিত? সে স্বামীর চিন্তানুসরণে কায় মন সমর্পণ করিয়াছিল। অম্বর তাহাকে তাহার সকল অধিকারের মধ্যে শুধু এই

আদেশই যে দিয়া গিয়াছে—"মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মমচিত্ত-মনুচিত্তন্তেংস্তু, মমবাচামেকমনা জুষস্ব!"—এ আদেশ অলঙ্ঘ্য—ইহাই যে তাহার স্বামীর একমাত্র আদেশ! তাই সে তাঁহার প্রীতিকর কার্য্য খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করে।

মহোত্তমে পুষ্করিণী খনন কার্য্য চলিতে লাগিল। এদিকে চৈত্রের শেষ সংক্রান্তি বঙ্গদেশে বড় পুণ্যাহ দিন, এইদিনে পিতৃপুরুষকে জলদান ভোজ্যোৎসর্গ, ব্রতনিয়মাদির বহু বিধি এদেশে চিরপ্রচলিত আছে। রমা-বল্লভ ঘটোৎসর্গ করিলেন। বাণী অনেকগুলি ব্রতগ্রহণ করিয়া সধবা কুমারী ও ব্রাহ্মণদিগকে তৈজস দক্ষিণা এবং বস্ত্রাদি দানপূর্ব্বক পরিতোষ ভোজনে তৃপ্ত করিল। তারপর বৈশাখের প্রখর রৌদ্র-তপ্ত দিনে সে সাগ্রহে প্রত্যূষ হইতে মধ্যাহ্নকালাবধি পূজা জপ ব্রত দানাদিতে নিত্য যাপন করিতে লাগিল। নিজের হাতে প্রতিবেশী দরিদ্রের কুমারী কন্যাকে স্নান করাইয়া আল্‌তা কাজল চন্দনে বসনে ভূষণে সাজাইয়া দেয়; আহার করাইয়া ফুলে জলে ভগবতী পূজা মন্ত্রে পূজা করে। শেষে কচি মেয়েটিকে অন্তের অলক্ষ্যে একবার বুকে চাপিয়া ধরে, মুখে একটী চুম্বন দেয়। বুকের ভার সঙ্গে সঙ্গে যেন অনেকখানি লঘু হইয়া আসে। কখনও আবার তাহারই ছোট মুখখানির উপরে মেঘ-ফাটা জলের ধারা যেন ঝর্ ঝর্ ঝরিয়া পড়ে। অশুচিভয়ে সে কখনও কাহারও ছোট ছেলে স্পর্শ করিত না। এখন সর্ব্বদা মনে হয়, যদি আমার একটী ছোট ভাই কি বোনও থাকিত! পাইবার আশা না থাকিলে মানুষের মন কোথাও একটা কিছু দিতে চাহে, বিনা দেনাপাওনায় বুঝি মানুষ বাঁচিতে পারে না। সে শিশুর মধ্যে চোখ বুজিয়া বালগোপালের অমৃতস্বরূপ চিন্তা করে, তাহাদের স্নেহ করিয়া মনে ভাবে, তাঁহাকেই পূজা করা হইল।

এইরূপে তাহার জীবনে একসঙ্গে দুইটী আলো জ্বলিয়া উঠিতেছিল

নারীজীবনের সারধর্ম্ম পতিপ্রেম, অপরটি সকল প্রেমের সার ভগবৎ-প্রেম। সে বুঝিয়াছিল, প্রথমটি দ্বিতীয়েরই সোপান, তাই ইহাকে ছাড়িয়া অন্যটি টিকিতে পারে না। এই তন্ময়তা হইতেই স্বার্থচিন্তার বিলোপ, স্বার্থত্যাগে পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন। ফলে বিশ্বের সুখে সুখ-প্রাপ্তি এবং বিশ্বনাথকেও সেই সঙ্গে যথার্থ পাওয়া। মন্দিরের পূজাবিধির উপর অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া সে যাহা না পাইয়াছিল, এই নূতন পথে তাহার চেয়ে অনেক বেশীই সে লাভ করিতেছে মনে হইল। সেই কৃতজ্ঞতায় যাঁহার জন্য এতবড় লাভ ঘটিয়াছে উদ্দেশে তাঁহার চরণে বার বার সে প্রণাম করিয়া ভাবিল, "স্বামী স্ত্রীর গুরু কেন, আজ তাহা বুঝিতেছি। আর কে আমায় এমন করিয়া এ শিক্ষা দিতে পারিত?"

এইরূপে দুঃখের মধ্যে সুখের আয়োজন করিয়া সে সেই ধ্যানকে এক করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। ভোরের বেলা মন্দিরে গিয়া পূজার উপকরণ সাজাইয়া রাখে, তার পর দুয়ার বন্ধ করিয়া পদ্মাসনে পদ্মপলাশলোচনের ধ্যান করে। চির-উপাস্যের স্থানে কখনও অরুণরাগ-লোহিতলোচনা শিববক্ষস্থিতা শিবানীর মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়ায়। সে ভক্তিভরে মানসপ্রসূন চয়ন করিয়া মনে মনে রক্তজবা বিল্বদলে অর্ঘ্য সাজাইয়া রাতুল চরণের শোভা সংবর্দ্ধন করে। ইহার পূর্ব্বে এ পরিবারের রসনায় কেহ "বিল্বপত্র" শব্দ উচ্চারণ করিত না; উল্লেখের প্রয়োজন হইলে "তেফস্কার" পাতা বলিত। জবা লইয়া যে কাণ্ড হইয়াছিল, আজও তাহা মনে পড়িলে তাহার মুখখানা ঠিক সেই জবার মতই রাঙ্গা হইয়া উঠে।

এমনই ভাবে দিন কাটিয়া তাহাদের তীর্থযাত্রার পর বৎসর ঘুরিয়া গেল। বাণীর বিবাহের দুই বৎসর পূর্ণ হইল। যে রাত্রে তাহার বিবাহ-তিথি দ্বিতীয় বার ঘুরিয়া আসিল, সে রাত্রে সেই বাসর-গৃহের

পালঙ্কে সে একা শয়ন করিয়াছিল। সারারাত্রি বিছানায় পড়িয়া কাঁদিয়া কাটাইয়া ভোরের আলোয় যখন সেই ইপ্সিত দৃশ্য দেখিবার বৃথা আকাঙ্ক্ষায় সেই মসনদ শয্যার শূন্য স্থলের দিকে মুহুঃ প্রত্যাশিত নেত্রের দৃষ্টি ব্যগ্র আগ্রহে সে সংস্থাপন করিল, অমনি সেই দুই বৎসরের শূন্য স্থানের আশাহীন শূন্যতায় তাহার স্বপ্ন-বিভোর প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল—সে নাই! সে নাই!

আবার সে অধীর আবেগে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিল। দুই বৎসর পূর্ব্বের দৃশ্য আজ আবার যেন নূতন করিয়া চিত্ত-ফলকে ফুটিয়া উঠিতেছিল। হায়, সমস্ত জীবনের বিনিময়ে যদি আর একটি বারের জন্যও সেই দিনটি সে ফিরাইয়া আনিতে পারিত! কিন্তু এ বড় দারুণ বিধি—'প্রত্যায়ান্তি গতা পুনর্ন দিবসাঃ'।

বাণীর দিন কাটিতে লাগিল। আবার মেঘমন্দ্রে যখন নব বর্ষার জয়-ধ্বনি উঠিয়াছে, এমন সময় পুষ্করিণী খনন কার্য্য সমাধা ও ঘাট বাঁধান শেষ হওয়ার শুভ সংবাদে সে বড়ই উৎসাহিতা হইয়া উঠিল। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ উপেক্ষা করিয়া সে এবার উপবাসবহুল সাবিত্রীব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। স্থানে স্থানে জলসত্রে পথিকেরা গ্রীষ্মের কাতর কণ্ঠশোষ নিবারণপূর্ব্বক প্রাতর্বাক্যে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছিল। সে গুঞ্জন লোকমুখে কানে আসিলে সে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে ভাবে, এই পরিতৃপ্তিটুকু তাঁহার নিকট পৌছাক্, সব শুধু তাঁহারই জন্য। আমি কি পরের জন্য কখনও ভাবিতে জানিতাম?

এমনি করিয়া সকলের প্রতি স্নেহমমতায় প্রাণ যেন ভরিয়া উঠিল; কিন্তু নিজের প্রতি সে এতটুকু মায়া করিল না। সকলের জন্য নিজের বুক পাতিয়া দিল; নিজেকে শুধু বিশ্রামহীন কর্ম্মের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া তাহার চারিদিকে কঠোর তপস্যার বহ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিয়া

তুলিল। সেই আগুনে হরিবল্লভের রমাবল্লভের কৃষ্ণপ্রিয়ার আদরিণী রাধারাণী পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। সেই ভস্মমুষ্টি পরে পতিপ্রেমের অমৃতাভিষেকে এবং নির্ব্বাসিত অম্বরের মন্ত্রশক্তি তেজে তপঃপূত-চরিত্রা, ব্রহ্মচারিণী, স্নেহ প্রেম করুণার জীবন্ত মূর্ত্তি এক সতী নারীর প্রতিষ্ঠা ঘটিল। বাণী এখন আর রাজনগরের গৌরব গর্ব্বিতা জমিদার-দুহিতা নয়—দুঃখীর দুঃখিনী পত্নী, শোকার্ত্ত পিতার মাতৃহীনা কন্যা সে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বর্ষার প্লাবন বক্ষে বহিয়া চিত্ররেখা আপনার চির গন্তব্যপথে ধীর-প্রবাহিতা ; ঘন মেঘে নদীতীরের গাছের মাথায় কালিমাখা, তাহারই কোলে দুগ্ধশুভ্র বকের শ্রেণী তারকা বিন্দুর মতই ছোট দেখাইতেছিল। বাণী সেই মেঘময় বেণী এলাইয়া নববর্ষার নদীতীরে অবগাহন করিতে গিয়াছিল। সেখানে পরাণে জেলে তাহাকে সহস্র প্রণাম জানাইয়া দাদাঠাকুরের সহিত তাহার সখ্যতার সংবাদ প্রদান করিয়াছে। সে খবর আজ তাহার কাছে একটা স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনের সংবাদের চেয়ে কম নয়। ঘরে ফিরিয়াও সে সেই কথাই ভাবিতেছিল। মানুষকে ভালবাসিতে জানিলে কত সুখ।—সুখ না দুঃখ ? না—সুখ বৈ কি। অজ্ঞতার সুখের চেয়ে জ্ঞানের দুঃখও অনেক ভাল। জন্মান্ধ হওয়ার চেয়ে আলো দেখিয়া অন্ধকারে ডোবাই মঙ্গল। নহিলে সে অসীম অন্ধকারে সে অভাগা কোন্ জ্যোতির্ম্ময়ের ধ্যান করিবে ?

ছাদের কার্ণিসে মুক্তাবিন্দু সাজান, জানালাতেও তেমনি মুক্তামালা সজ্জিত। সে বারেক তাহার মধ্য দিয়া বনরাজি নীলা দূর পরপারে দৃষ্টিপাত করিল। বৃষ্টি অবসানের পর আকাশের গায়ে রৌদ্র ইন্দ্রধনু

আঁকিয়া রাখিয়াছে। সে আলোয় সম্মুখের দেওয়ালে টাঙ্গানো হরিবল্লভের বৃহৎ তৈলচিত্র যেন জীবন্ত বলিয়া মনে হইতেছিল। সে ধীরে ধীরে চিত্র সন্নিকটে আসিল। সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মনে হইল, চিত্র যেন তাহাকে কি প্রশ্ন করিতেছে। কি সে প্রশ্ন? সে যেন লজ্জায় মুখ তুলিয়া সেই চিত্রিত নেত্রের অপলক দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিল না। মনে পড়িল, দাদাবাবু তাহার পিতাকে বলিতেছিলেন, "সতী মায়ের মেয়ে, যেমন স্বামীর হাতে পড়বে, তাকেই দেবতা মনে করবে, অত খুঁৎ কাড়ছো কেন?" পিতা উত্তর দিয়াছিলেন, "সেও কি কখন হয়?"

সে ভূমিষ্ঠ হইয়া সেইখানে চিত্রচরণে প্রণাম করিল। অস্ফুটস্বরে কহিল, "তুমি ঠিক বলেছিলে দাদাবাবু! যখন বলেছিলে, তখন আমার বড় রাগ হয়েছিল। কিন্তু তখন বুঝি নি, তুমি আমার চেয়ে অনেক বড় —অনেক জ্ঞানী। তুমি থাকলেও হয় ত এমন দুর্দ্দশা আমার হ'ত না!"

বাণীর মন আজকাল আবার বড় চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। তাহার সেই পত্র লিখিবার পর হইতে পাঁচ-ছয় মাসকাল অম্বর প্রতি সপ্তাহেই তাহার পিতাকে একখানি করিয়া পত্র লিখিয়াছে। তাহাতে সে তাহার কুশল সংবাদই দিয়া আসিয়াছে। অর্দ্ধবিশ্বাসে তাহারা তাহারই উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতেছিল। তারপর ক্রমেই পত্রসংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল—সপ্তাহ—পক্ষে, পক্ষ—মাসে—ক্রমশঃ দেড়মাস দুইমাস পর্য্যন্ত বিলম্ব হইল। একবার লোক পাঠাইয়া খবর আনা হইল। সে আসিয়া বলিল, "জামাইবাবু খুব রোগা হইয়া গিয়াছেন; জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'চিরকাল কি কেহ একরকম থাকে? আমি বেশ আছি। বেশী কাজ, যাইতে পারিব না।"

শুনিয়া রমাবল্লভ কহিলেন, "রাধারাণি, এস, আমরা সেখানে যাই।"

বাণী দুই করতলে করতল নিপীড়িত করিয়া উত্তর দিল, "ঠাকুর-দেবতা ফেলে কেমন করে এখন যাই বাবা? আজ বাদে কাল জন্মাষ্টমী, তারপর রাধাষ্টমী, তারপর ঝুলন, তারপর মার বাৎসরিক আসছে। এখন থাক।"

যাইবার ত উপায় নাই—কেমন করিয়া সে যাইবে? স্বামীর ধর্ম্মে বাধা দেওয়া ত স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয়। সে কি হীন স্ত্রীলোকের ন্যায় তাহার মহর্ষি স্বামীর তপস্যা ভঙ্গ করিতে যাইবে? গোপীবল্লভ! এ অধঃপতনের তীব্র লোভ হইতে তুমি তাহাকে রক্ষা কর।

অবশেষে একদিন অকস্মাৎ আকাশের সাক্রন্ত মেঘ অশনি প্রেরণ করিল। অম্বরের নিকট হইতে পত্র আসিল, "বহুদিন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই। কয়দিন ধরিয়া এই পত্রখানি লিখিবার চেষ্টা করিতেছি, শারীরিক অসুস্থতার জন্য পারিতেছি না। আজ স্থির করিয়াছি ইহা শেষ করিতেই হইবে; নহিলে বোধ করি লেখা ঘটিয়া উঠিবে না।

"আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ইদানীং সময় মত পত্রাদি লিখিতে পারিতাম না, আজ আমি আপনাকে আপনার আদেশমত তাহার কারণ জানাইব।

"আপনার অনুমান যথার্থ, আমার শরীর অসুস্থই বটে। এতদূর অসুস্থ যে আজকাল আমি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেও ক্লান্তি অনুভব করিয়া থাকি। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম আসামের কালাজ্বরে আমার জীবনী-শক্তি ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। তাই আরব্ধ কর্ম্মগুলির সমাপ্তির দিকেই সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছিলাম। সর্ব্বদাই জ্বরভোগ করিতে হয়, যেটুকু ভাল থাকি কাজ কর্ম্মই দেখি, সেইজন্য পত্রাদি নিয়মিতভাবে দিতে পারি নাই। আমার সে ত্রুটি কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

"আজ আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। আপনি আমায় অনেক দিয়াছেন। এ ক্ষুদ্র জীবনের অনেক সাধ আপনারই দয়ায় পূর্ণ করিতে পারিয়াছি; নতুবা আমার মত দীনহীনের সাধ্য কি যে এই সুমঙ্গল কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করি। আপনার নিকট যাহা কিছু দোষ অপরাধ অবাধ্যতা করিয়াছি, সন্তান বলিয়া তাহা ক্ষমা করিবেন।

"আপনার পক্ষে কষ্টকর হইবে বলিয়া, যে সংবাদ দিতে বসিয়াছি, তাহা এখনও দিতে পারিতেছি না; কিন্তু না দিলেও নয়। তাই লিখিতেছি, আমার এ পত্রের উত্তর দিবেন না। দেওয়া বৃথা, দিলেও আমি তাহা পাইব না। আমার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। ডাক্তার বলিয়াছেন, আমার জীবনের আর কিছুমাত্র আশা নাই, দুই-তিন দিনের মধ্যেই খুব সম্ভব মৃত্যু হইতে পারে। সেই দুই-তিনটা দিন আমি ইচ্ছামত যাপন করিব স্থির করিয়াছি। জানি না, সে সাধ পূর্ণ করিতে পারিব কি না। আপনারা কেহ আমার পত্র পাইয়া এখানে আসিবেন না। আসিলে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব দয়া করিয়া ঐখানেই থাকিবেন। আমার এই একান্ত মিনতি ও শেষ প্রার্থনা।

সেবক শ্রীঅম্বরনাথ।"

রমাবল্লভ এ পত্র শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলেন। যখন বাণী আসিয়া তাঁহাকে দেখিল, সে তাঁহার মুখ দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। "বাবা! এ কি! কি হয়েছে?" বলিয়া তাড়াতাড়ি সে পাশের দেওয়ালটা চাপিয়া ধরিল। একটা অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছিল।

রমাবল্লভ কথা কহিতে পারিলেন না; পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত ভিতরে ছট্‌ফট্ করিয়া কেবল সেই সাংঘাতিক পত্রখানার দিকে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র; তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বাণী চিঠিখানা দেখিতে

পাইল। সে সঙ্কোচমাত্র না করিয়া সে পত্র তখনই তুলিয়া লইল। সেই পত্রের সহিত তাহার নাম লেখা আর একখানা পত্র ছিল, রমাবল্লভ তাহা লক্ষ্য করেন নাই। সে তাহা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি সেখানা কুড়াইয়া লইয়া খাম ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে লেখা ছিল—

"কল্যাণীয়াসু—

"সেদিন তোমার করুণাপূর্ণ পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, আজ দিতেছি; পিতৃদেবের পত্রে সকল সংবাদ পাইবে। তাই স্বতন্ত্রভাবে সে সকল কথা লিখিলাম না। জীবনে তোমার কাছে যে কিছু অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা করিও। তোমার দেবভক্তি ও একনিষ্ঠ প্রেমে আমি তোমায় আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম। মূর্খ আমি, বুদ্ধি দোষে সে নিষ্ঠায় কত না আঘাত দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সে সব কথা মনে করিয়া আজও মনে মনে অনুতপ্ত হই। অযোগ্যের কোন গুরুভার গ্রহণ করা অনুচিত, ইহাতে এই শিক্ষা পাইয়াছি। আমার সে অজ্ঞতার অপরাধ মার্জ্জনা করিও।

"তারপর আর একটি কথা বলিব। এ কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার না করা অনুচিত হইবে বলিয়াই আজ এ পত্রের অবতারণা; কিন্তু ইহাতে আমাদের সর্ত্তভঙ্গ হইল না ত? তা যদি হইয়া থাকে, কুম্ভীপাক নরকেও আমার স্থান হইবে না!

"সে কথা এই—আমি তোমারই কাছে মূর্ত্তি পূজার উপকারিতা অনুভব করিয়াছি। পূর্ব্বে আমি মনে করিতাম বিশ্বনাথকে মন্দিরে প্রতিমায় প্রতিষ্ঠা করা অনুচিত। কিন্তু পরে বুঝিয়াছি, ইহা আমারই বুঝিবার ভুল! বিশ্বনাথকে বিশ্বেই পূজা করিতে হয়; কিন্তু চঞ্চল মানব-চিত্ত তাহাতে স্থির হয় না; তাই নিজের মনকে অবলম্বন দিবার জন্য, নিজের মনকে একনিষ্ঠ করিবার জন্য, আমাদের মূর্ত্তি বা ভাবরূপ কল্পনা

করা প্রয়োজন। গঠিত অঙ্কিত অথবা জীবন্ত মূর্তি তাহার প্রধান সহায়। ইহাতে হৃদয় একনিষ্ঠ ও তন্ময় হয়। বিরাট্ বিশ্বের সকলই যখন তাঁহার রূপ, তখন তাহার মধ্যে একাংশের চিন্তায় হানিই বা কি? তাঁহার মস্তক, তাঁহার চরণ, তাঁহারই করাঙ্গুলি ভিন্ন সেও ত আর কিছুই নয়। আচ্ছা, এখন তোমায় আরও একটি শেষ কথা বলিয়া যাইব।

"আমার মনে হইত, মন্দিরের পূজায় একটু রাজসিক আয়োজন অধিকতর হইয়া পড়িয়াছিল—দেবতার নামে এরূপ আড়ম্বর অনুচিত বলিয়া সে সময় মনে হয়। পরমেশ্বরকে পিতা পুত্র স্বামী সখা অথবা মা—যে কোন নামেই পূজা কর ক্ষতি নাই ; কিন্তু যেমন পুত্রাদি আত্মীয়-জনের প্রতিও বৃথাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, তাঁহার নিকটও সেইরূপ। তুমি দ্রব্যগুণ মান ত? ঐশ্বর্য্যসমাসীন হইয়া মন সাত্ত্বিকভাবাপন্ন রাখা একটু অসম্ভব বলিয়া আমার মনে হয়। কিন্তু ঐশ্বর্য্যবানের ঐশ্বর্য্য কেবল নিজোদ্দেশে ব্যয়িত না হইয়া দেবোদ্দেশে ব্যয় হওয়ায় যে সে ধনের কতকটা সার্থকতা ঘটে, এ কথাও আমি মানি। তবু যেন মনে হয়, মন্দির বৃথা উপকরণের ভারে ভারী না করিয়া সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ করিলে সে মন্দির অধিকতর পবিত্র, সমধিক চিত্তশান্তিকর হইবে। ঐ অজস্র স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি কত দরিদ্র-নারায়ণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার মনে যে কথাটা উঠিয়াছে তোমায় লিখিলাম। যদি অনুচিত মনে হয়, নিজগুণে এই অকিঞ্চনকে ক্ষমা করিও।

"এখন বিদায়। আমার মনে কোন অতৃপ্তি নাই। তোমাদের দয়ায় এ জীবনে অনেক পাইয়াছি। ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাদের নিকট কত ঋণী! আমার মৃত্যুতে তোমার দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। শুধু একজন বিশ্বাসী শুভার্থী—আমার সম্বন্ধে এইটুকু—কখন কখনও আমার মনে পড়ে ত স্মরণ করিও। তোমার বিশ্বাস রক্ষা করিতে

পারিয়াছি ত? আমার মরণে লোকে তোমায় না বুঝিয়া বিধবা বলিবে—হয় ত দেশাচারক্রমে কিছু ক্লেশভোগও অনিবার্য্য! কিন্তু আমি জানি, তুমি চির-সধবা। ভগবানে যে প্রাণ স'পিয়াছে তাহার কখনও বৈধব্য ঘটিতে পারে না।

"তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ, পিতৃদেব যদি তোমায় সঙ্গে লইয়া এখানে আসিতে চাহেন, তুমি কোন মতেই আসিয়ো না। ইহলোকে আর কখনও কোন অনুরোধ করি নাই—করিবও না। এই একমাত্র প্রার্থনা। ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখুন।

চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অম্বর।"

পত্র পাঠ শেষ হইলে বাণী স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। একবৎসর পূর্ব্বে সেই শেষ দেখার দিনে সে ষ্টীমারের নির্জ্জন কামরায় আছড়াইয়া পড়িয়া বুক-ফাটা কান্না কাঁদিয়া তাহাকে আকুল হৃদয়ে ডাকিয়াছিল; কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ এই গভীরতর যন্ত্রণা তাহাকে নিঃশব্দে যেন পাষাণে পরিণত করিয়া দিল। সমস্ত শরীরের স্নায়ুজাল অবসন্ন হইয়া রক্তচলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়ায় হস্তপদ অসাড় হিম এবং মুখখানা সাদা কাগজের মতই শুভ্র হইয়া গেল। অথচ সে তাহা জানিতেও পারিল না। সে কেবল একদৃষ্টে সেই পত্র—তাহার স্বামীর প্রথম এবং শেষ পত্রখানার পানে অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল।

সে মৃত্যুশয্যায়! আর সে সেইখানে তাহাকে তাহার সহিত শেষ দেখা করিতে যাইতেও নিষেধ করিয়াছে! তাহার স্বামী আসামের জলা জঙ্গলে মরণাপন্ন অবস্থায় অসহায় পড়িয়া—আর সে এইখানে তাঁহার মৃত্যু সংবাদের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে? ভগবান! ভগবান! এ কি শাস্তি! এ কি প্রায়শ্চিত্ত! রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া ইহা কি কেহ—তা যত বড় মহাপাপীই সে হোক, সহিতে পারে?

মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় তাহার পাংশু ওষ্ঠ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। প্রাণহীন দেহের মত নিশ্চল শরীরে কেবল এই একটীমাত্র জীবন-চিহ্ন —"আমার মৃত্যুতে দুঃখিত হইও না।" "লোকে তোমায় বিধবা বলিবে, কিন্তু আমি জানি, তুমি চির-সধবা। বৈধব্য ঘটিতে পারে না।" ওঃ ভগবান! এ কি নিষ্ঠুর বজ্রাঘাত! যে এই পৃথিবীতে তাহার একমাত্র ধ্যান ছিল, যাহার জন্য তাহার এই সুখের জীবন—সাধের পৃথিবী কণ্টক-কাননে পরিণত হইয়াছে, সে আজ তাহার সেই পৃথিবী হইতে চির-বিদায় সংবাদে দুঃখিত হইবে না? আর এই শেষ কথা সে বলিয়া গেল!

পৃথিবী! হায়, এই শত আশা উদ্দীপনাময়ী সাধের পৃথিবীতে সে আর কতক্ষণই বা আছে? সেই সুন্দর মূর্ত্তি—সেই মহৎ প্রাণ; সে আর কত অল্পক্ষণের মধ্যেই এ পৃথিবীর কঠিন মৃত্তিকার সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। সে বিধবা হইবে না! শুধু লোকে বলিবে? এই কথায় সে জানাইয়াছে যে, সে তাহার যথার্থ স্ত্রী—ধর্ম্ম-পত্নী নহে—শুধু লৌকিক একটা নিয়মে বদ্ধ ছিল মাত্র। সে বন্ধন কাটিয়া গেল। সত্য এ কি তাই? শুধু কি তাহাদের লৌকিক বিবাহই হইয়াছিল? আর কিছু নয়? সেই ষ্টেশনে সেই যে "আমার স্ত্রী" বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলে সেও কি তবে লৌকিক? তাই যদি হয়, সেই স্বীকারোক্তিটুকুও যদি একটা বাহ্য শব্দ মাত্রই হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া সেই প্রাণ-স্পর্শী সুরটুকু তাহার বুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ভালবাসা বিবাহ এবং পত্নীর কর্ত্তব্য যে কি বস্তু, সে সম্বন্ধে অমন শিক্ষা দিয়া গিয়াছিল? আর সেই যে বিবাহের মন্ত্র, সেও তবে লৌকিক? যাহার প্রভাব তাহার মত কালসর্পীকেও বশীভূতা করিয়া তোমার প্রতি তাহার সকল তাচ্ছিল্য ভুলাইয়া তোমার দাসানুদাসীরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে, সেও তবে কিছু নয়? এ কি তোমার কুটিলতাহীন হৃদয়ের

যথার্থ কামনা? অথবা ইচ্ছা করিয়া তোমার প্রতি অকথ্য অত্যাচারের শাস্তি তুমি তোমার স্ত্রীকে ফিরাইয়া দিয়াছ? কৈ—সে ভাব ত কোথাও নাই? একটু ব্যথা—এতটুকু অভিমান! উঃ, অসহ্য! এ অসহ্য! জন্মের মত চলিয়া গেলে—জানিয়াও গেলে না, সেই হৃদয়হীনা পাষাণী তোমায় সুখী করে নাই, তাই সে পাপের জন্মকালব্যাপী মহা প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া সে কি তুষানলে দগ্ধ হইবার জন্যই বাঁচিয়া রহিল! একবার শুনিয়াও গেলে না, সে আজ তোমায় কত ভালবাসে। ওগো, এসো, যেয়ো না, শুনিয়া যাও—তুমিই যে তাহার সর্ব্বস্ব! ইহ-পরকালের একমাত্র তপ, একমাত্র প্রার্থিত! শুধু সেই কঠোর প্রতিজ্ঞা এতদিন এ ব্যাকুলতাকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, নহিলে এই গর্ব্বস্ফীত হৃদয় কত পূর্ব্বে তোমার দুই পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিত—আমায় ও চরণে স্থান দাও!

কিন্তু আজ সকলই বৃথা! সে নাই! এ পৃথিবীর আর সবই তেমনই আছে; শুধু ইহার মাঝখানে হয় ত তাহার এতটুকু স্থানই আজ চিরশূন্য!

রমাবল্লভ শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মা, চল, আমরা তার কাছে যাই—না গিয়ে কেমন করে থাকব?"

বাণীর চোখে জল আসিল না; সমস্ত ভিতরটা যেন তাহার দারুণ শৈত্যে বরফের মত জমাট্ বাঁধিয়া গিয়াছিল। সে পিতার দিকে শূন্য দৃষ্টি ফিরাইয়া সেই শববৎ রক্তহীন ওষ্ঠাধরে উচ্চারণ করিল, "আমার যাবার উপায় নেই বাবা, যেতে হয়—তোমরা যাও।"

একটা কথা—একমাত্র শেষ আশা তাহার আশাহীন অন্ধকার নৈরাশ্যের মধ্যে বিদ্যুতের শিখার মত ক্ষণে ক্ষণে চকিত হইতেছিল। সে আশা—হয় ত এখনও সে বাঁচিয়া আছে। হয় ত এ যাত্রা রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে। একখানা পত্রে তাহাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া লিখিয়া তাহার নিকট যাইবার অনুমতি সে প্রার্থনা করিবে। যদি সময়

থাকে, ভালও যদি সে না থাকে—তবুও ত মরণের পূর্ব্বে জানিয়া যাইবে, তাহার স্ত্রী তাহাকে ভালবাসে—প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে।

অনেক কষ্টে চিত্ত একটু স্থির করিয়া কম্পিত হস্তে সে পত্র লিখিতে বসিল। প্রথম পত্রে গভীর ভালবাসাপূর্ণ সম্বোধনে আপনার রুদ্ধ হৃদয়-দ্বারের সমস্ত কবাটগুলা খুলিয়া ফেলিয়া একেবারে তাহার রমণী হৃদয়ের মাঝখানটাকে মুক্ত করিয়া ধরিল। কেমন করিয়া মানসিক যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, সেই মন্ত্রশক্তি—বাসরঘর—বিদায়—তার পর সকলের চেয়ে কঠোর পরীক্ষা—সেই ট্রেণের সাক্ষাৎ—তাঁহার মুখে সেই "আমার স্ত্রী" এই স্বীকারোক্তি শ্রবণ; এ সকল দিনের সকল কথাই সে নিজের প্রাণের তুলিকায় চিত্রিত করিয়া তুলিল। অশ্রুধারায় অর্দ্ধধৌত কম্পিত লেখনীপ্রসূত সে পত্র বহুশত পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি সকরুণ জীবন-কাহিনীর মতই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

কি সে পত্র পাঠান হইল না। সহসা তাহার মনে পড়িল, এ পত্র যখন সেখানে পৌছিবে, তখন হয়ত তাহার শারীরিক অবস্থা আরও মন্দ হইতে পারে। হয় ত সেই দুর্ব্বল শরীরে এই উচ্ছ্বাসব্যক্ত ভাষার লিপি সে সহিতে পারিবে না। হয় ত তাহার ব্যাকুলতা তাহার স্নেহশীল চিত্তকে ব্যথিত করিয়া তাহার শেষ মুহূর্ত্তটুকুকেও বিষম অশান্ত করিয়া তুলিতে পারে।

স্বার্থপরায়ণা বাণী আজ মমতাময়ী পত্নী, নিজের চেয়েও স্বামীর সুখের জন্য সে এক্ষণে অধিকতর ব্যাকুলা। না, তাঁহার শেষ সময় শান্তিপূর্ণ হউক। তাহার ত সকলই যাইতেছে, এ আর এমন বেশী কি?

মনে বল, হৃদয়ে ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া সাবধানে সে আর একখানা পত্র লিখিল। তাহার এক অংশ এইরূপ—

"আমায় যাইতে নিষেধ করিয়াছ। সে আদেশ লঙ্ঘন করিবার সাধ্য

আমার নাই ; কিন্তু তোমার প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্যপূর্ণ ভালবাসা ভক্তিতে আমার হৃদয় আজ পরিপূর্ণ। আজ তোমার এ অবস্থায় দূরে থাকা আমার পক্ষে মর্ম্মান্তিক ! কৃপা করিয়া তোমার রোগশয্যার পার্শ্বে গিয়া তোমার সেবা করিবার অনুমতি আমাকে দাও। তারপর যে আদেশ করিবে মাথা পাতিয়া লইব। অপরাধিনী পত্নীকে এই শেষ সুখটুকু হইতে বঞ্চিত করিও না। বিবাহ-মন্ত্রে সুখ-দুঃখের সমুদায় অংশ দিতেই ত স্বীকার করিয়াছিলে। এ জগতে এই আমার একমাত্র শেষ প্রার্থনা। এটুকু পূর্ণ করিবে না কি ?

তোমার কৃপাপ্রার্থিনী দাসী রাধারাণী।”

অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। এ পত্র যখন অম্বরের নির্জ্জন কুটীরদ্বারে গিয়া পৌঁছিল, তখন সে কুটীর শূন্য পড়িয়া আছে, কেহ কোথাও নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাণীর প্রথম পত্র যখন অম্বরের নিকট পৌঁছিল, তখন সে নিজের ছোট ঘরখানির মধ্যে জ্বরের যন্ত্রণায় অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। ম্যালেরিয়া বিষ-দুষ্ট কালাজ্বর তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল। পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে ভীষণ বেগে আক্রমণ হইত ; এখন আর আক্রমণের প্রয়োজন হয় না। নিজের অধিকৃত দুর্গে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া সে এখন রাজার গৌরবে বসবাস করিতেছে ; এবং দিনে দিনে তাহার পাণ্ডু পতাকা সগর্ব্বে সে বিজিতের সর্ব্বশরীরে উড়াইয়া দিয়াছে। এখন প্রতিদিনের মধ্যে অধিকাংশ কালই তাহার সঙ্গীদের পদভরে সেই জীর্ণ দেহ-দুর্গ কম্পিত হইয়া উঠে। দিনরাত্রির মধ্যে পাঁচ-সাত ঘণ্টামাত্র তবু একটু

ভাল যায়। এ অবসরকালও প্রত্যহ তিল তিল করিয়া সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছিল।

ম্যালেরিয়া যে শরীরে বাসা লইয়াছে, তাহার অবস্থা ভগ্ন গৃহের মত। নিত্য চূণবালি খসিতেছে; কখন পড়ে কখন পড়ে, সর্ব্বদাই এমনই একটা ভয়। স্থান পরিবর্ত্তন ভিন্ন এ রোগের প্রতিকার বা প্রতিষেধকও বড় একটা কিছু নাই। শ্বশুরের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সে একবার একজন ডাক্তার ডাকাইয়াছিল; ডাক্তার কতকগুলা কুইনিন পিল গিলাইয়া এই উপদেশই দিলেন। কাজেই সে আর দ্বিতীয়বার তাঁকে ডাকাইল না।

যতক্ষণ জ্বরের কম্প চলিতে থাকে, ততক্ষণ নিজের পুরাতন লেপখানি মুড়ি দিয়া শত-ছিন্ন বিছানাটায় পড়িয়া সে কাঁপে; প্রবল তৃষ্ণা প্রাণপণে রোধ করে। কম্পের বেগে সর্ব্বশরীরে খাল ধরিতে থাকে। এমন কেহ দ্বিতীয় ব্যক্তি কাছে নাই যে, মুখে একটু জল দেয়; অথবা বুক পিঠের কাছটা চাপিয়া ধরিয়া কম্পের কষ্ট কথঞ্চিৎ নিবারণ করে। তার পর আবার জ্বরের প্রথম বেগ কাটিয়া গেলে সে উঠিয়া বসে। কোন দিন রাঁধিয়া কিছু মুখে দেয়; কোন দিন অনাহারে পুঁথি-পত্র খুলিয়া পড়া-শুনায় মন দেয়; বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া ইষ্টমন্ত্র জপ অথবা শাস্ত্র-মীমাংসা করে। আবার কোন সময় চকিতের মত বা একজনের কথাও মনে পড়িয়া যায়।

সে দিন জ্বরের ঘোর কাটিয়া গেলে সে যখন চোখ মেলিল, তখন দেখিল, গোধূলির অস্পষ্ট অন্ধকার-আলোকে সম্মুখে একখানা লেফাফার মত কি পড়িয়া আছে। পত্রই ত! সাগ্রহে সে মাথা তুলিল। কাহার পত্র কিছুই জানা নাই, তথাপি কিসের যেন একটা আশা তাহাকে একটু চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। রমাবল্লভের পত্রে অন্ততঃ সে এই খবরটুকু পাইবে, "রাধারাণী ভাল আছে।"

শুধু এইটুকু আর কিছুই নয়। শুধু একটু কুশল সমাচার—যাহার কুশল কামনায় সে আজ এই আত্মীয়-স্বজন-বিবর্জিত সেবা-সুখ-হীন নিরানন্দময় মৃত্যুকে বরণ করিতেছে, তাহার ভাল থাকার সংবাদটুকু মাত্র। তাহার চেয়ে বেশী ইহলোকে আর কিছু পাওনা নাই। আর বেশী কিছু প্রয়োজনই বা কি ?

মস্তকের ভার তখনও সমান আছে। উঠিতে না পারিয়া সে ক্লান্তভাবে তৈলাক্ত উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া চক্ষু মুদিল। দৃষ্টি তখনও অস্থির জ্বালাময়। মনে মনে ভাবিল, আর একটু হোক্, এখন ত চোখেও দেখিতে পাইব না। কিন্তু চোখ বুজিতে আবার সেই ট্রেণের দৃশ্যটা সহসা কেমন তাহার মনে পড়িয়া গেল। কি অপ্রত্যাশিত, অতর্কিত সে সাক্ষাৎ! দয়াময়, মনের দুর্ব্বলতাটুকুও কি তোমার কাছে অপ্রকাশিত থাকে না ? বড় অহঙ্কার ছিল, বুঝি মনে সুখ-দুঃখের বিকার কিছুই নাই। যাহাকে ভালবাসি, শুধু তাহার সুখের জন্ত নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছি, নিজের এ চিত্ত কামনাহীন। তাই সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিলে। বুঝাইয়া দিলে—বিশুদ্ধ প্রেম সান্নিধ্য খোঁজে না, কিন্তু পরিচ্ছন্ন জাগতিক ভালবাসা মাত্রই—তা যতই কেন তাহা উচ্চ হোক, একেবারে নিষ্কাম হওয়া অসম্ভব। একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে সাধ হইত। কখনও ত তেমন করিয়া নিজের ভাবিয়া দেখা হয় নাই। তাই বুঝি দেখাইলে ? আহা নাথ ! এই দীনহীনের প্রতিও তোমার এত দয়া।

এবার সেই আকস্মিক সাক্ষাতের পর হইতে অম্বরের মনে একটা সমস্যা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে সেই চকিতের মধ্যেই দেখিয়া বুঝিয়াছে, বাণীর মধ্যে একটা যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে। সে যখন প্রথম সেই কামরার মধ্যে প্রবেশ করে, সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্য করিয়াছিল, দেড় বৎসর পূর্ব্বে যে স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যশীলা লাবণ্যময়ী কিশোরীকে সে নিজের পার্শ্বে

দেখিয়াছিল, ইহার অঙ্গে আর এখন সে অটুট স্বাস্থ্যের পূর্ণ জ্যোতিঃ বিরাজিত নাই। অসংযত কেশকলাপ মধ্যবর্ত্তী ভুবনমোহন মুখখানা তেমনি মোহময়; কিন্তু তাহার সেই সুললিত গ্রীবা ও গণ্ডের পরিপূর্ণতা যেন অনেকখানি ঝরিয়া গিয়াছে।

সে অন্তরমধ্যে ঈষৎ বেদনা বোধ করিল। কেন এমন হইল? তার পর একবার মুহূর্ত্তের জন্য বাণী যখন তাহার দিকে চাহিল, বাহিরে অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও ভিতরে সে তখন বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়াছিল। সে কি দৃষ্টি! সেই স্বাধীন সানুগ্রহ ভাব, বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ কালো মেঘের মত উজ্জ্বল আঁখিতারা আজ এ কি নূতনভাবে নূতন ধরণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত শান্ত শীতল দৃষ্টি, কোমল কিশলয়ের মত পাতা দুইখানির মধ্যে অর্দ্ধবিকশিত—অর্দ্ধাবরিত, তাহার ভিতর যেন কত গভীরতা—কত মাধুর্য্য—কত সঙ্কোচ লজ্জা ভয় একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া আছে। জলভারাকুল মেঘের মত তাহা নিবিড়ভাবে হৃদয়কে বেষ্টন করে, সরস আনন্দে পাগল করিয়া তুলে। এ কি পরিবর্ত্তন। এ পরিবর্ত্তনের অর্থ কি?

সেদিন অর্দ্ধমুহূর্ত্তেই নিজেকে সে সংযত করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু সে বিষয়ের চিন্তাটা আজও তাহার মন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। এ দৃষ্টি ত সংসারাতীত নহে! ইহার প্রতি ঈক্ষণে পলে পলে স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, করুণা এবং সতী রমণীর সুগভীর ভালবাসা যেন ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে। তাহার সে সংসারানভিজ্ঞ আপনভোলা ভাব আর ইহাতে নাই। কিন্তু কিসে কে তাহার এ পরিবর্ত্তন ঘটাইল? ইহা কি যথার্থ-ই ঘটিয়াছে, না এ সকলই শুধু তাহার রোগদুর্ব্বল মনের কল্পনা?

কিয়ৎক্ষণ গত হইলে দুইবারের চেষ্টায় এবার সে উঠিয়া বসিল। তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বারের নিকট হইতে পত্রখানা কুড়াইয়া

আনিল। তখনও তাহার হাত পা দুর্ব্বলতায় কাঁপিতেছে। খামের লেখাটা অপরিচিত। ধীর হস্তে আবরণ মোচন করিয়া বিষম উল্লাসে সে পত্র পাঠ করিল। এ পত্র বাণীর। তাহার স্ত্রীর! সত্য? না, সে জ্বরের ঘোরে যেমন সব অসম্ভব অলীকের বিজৃম্ভনিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে ইহাও তাহাই?

যদি মিথ্যা হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এ সংসার একটু দীর্ঘকালব্যাপী স্বপ্নমাত্র, তদ্ভিন্ন আর ত বেশী কিছুই নহে। এ না হয়, তাহারই মধ্যে একটুখানি ছোট স্বপ্নই হইল।

বিছানায় শুইয়া চিঠিখানা প্রায়ই সে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল; কিন্তু যে জিনিষটি তাহার ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা মিলিল না। পিতার আদেশ পালন ভিন্ন সে পত্রে লেখিকার অপর কোন উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় নাই। সহানুভূতি কিংবা তাহার চেয়ে আর কিছু বেশী? না, কিছু না।

তবু ত সে পত্র তাহার স্ত্রীর লেখা—সে সেই জড় পত্রখানাকে অতি সাবধানে ঘুমন্ত শিশুটির মতই সযত্নে ধরিয়া নিজের বালিসের নীচে রাখিয়া দিল, পরে প্রথম উচ্ছ্বাসের মুখে উত্তর লিখিতে বসিল। প্রথমেই লিখিল—

"চিরায়ুষ্মতীষু,

"তোমার পত্র পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। তুমি আমায় আসামের অস্বাস্থ্যকর স্থান ত্যাগ করিতে বলিয়াছ—কিন্তু বাণি—"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, এ কি করিতেছে সে? শতখণ্ডে কাগজখানা ছিঁড়িয়া জানালার বাহিরে জঙ্গলের মধ্যে তাহার ছিন্নাংশগুলা ছড়াইয়া দিয়া সে স্খলিতপদে কুটীরের বাহির হইয়া গেল—যেন সেখানে থাকিলে এই দুর্দ্দমনীয় লোভের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ অসম্ভব হইবে!

সে যখন কুটীরে পুনঃপ্রবেশ করিল তখন চারিদিকে প্রবলস্বরে ঝিঁঝিঁ

ডাকিতেছে, কালো অন্ধকার আকাশের গায়ে ছিটানো আলোক-বিন্দুর মতই তারাগুলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অদূরবর্ত্তী ডোবার পচা জল হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প উড়াইয়া মৃদু-মন্দ বাতাস গাছের পাতা নাড়িতেছিল, বলিতেছিল—সর্—সর্—সর্। যে বাঁচিতে চাহিস্, সে এখান হইতে সরিয়া যা। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া সে নিত্য প্রত্যক্ষ ইষ্টমূর্ত্তি স্মরণ করিল। "মা! আমি এত হীন, এত ছোট আমি? না মা, আমার অতিক্ষুদ্র এ জীবনে এই একটি মাত্র কার্য্য আমার সম্পন্ন করিয়া যাইতে দাও, তাহার বিশ্বাসটুকু যেন রক্ষা করিয়া মরিতে পারি। সে এইটুকু নির্ভরতা আমার উপর রাখিয়াছিল যে, প্রতিজ্ঞা করিলে সেটা নিশ্চয় আমি পালন করিব। এ বিশ্বাস যেন আমার দ্বারা ভঙ্গ না হয়।"

পরদিন জ্বর আসিবার পূর্ব্বে রমাবল্লভকে পত্র লিখিল। সে পত্র বাণী পড়িয়াছিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ঘরে বসিয়া পত্রোত্তরের প্রতীক্ষা করা অসম্ভব! যে লোক পাঠান হইয়াছে সে পৌঁছিয়া যে তার করিল, তাহার অর্থ, "জামাইবাবু নাই। তিনি কবে গিয়াছেন ঠিক জানা গেল না।"

আর ঠিক জানিয়াই বা লাভ কি? কিন্তু এ তার আসিবার পূর্ব্বেই বাণীকে লইয়া রমাবল্লভ রাজনগর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। তাই এ সংবাদ তাঁহাদের নিকট পৌঁছিল না।

বাণী নিজের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। সে বিদ্রোহী মনকে বুঝাইতে চাহিতেছিল, "এ আদেশ আমার স্বামীর আদেশ—আমার রাজার—আমার দেবতার আদেশ—এ আদেশ আমি লঙ্ঘন করিব না।

ইহপরলোকে যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইব বলিয়া শালগ্রাম অগ্নি ও ব্রাহ্মণ সাক্ষাতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছি, আমার প্রতি তাঁহার এই একমাত্র আজ্ঞা —এ আমি কেমন করিয়া লঙ্ঘন করিব? ইহাতে আমার প্রাণ যায় আর থাকে, আমাকে এইখানে পড়িয়া থাকিতেই হইবে।"

তথাপি মন কি এ যুক্তির বশ মানে? কেমন করিয়া সে ভুলিবে যে, তাহার চির-অনাদৃত স্বামী সুদূর আসামে নির্বান্ধব স্থানে রোগশয্যায় মরণের প্রতীক্ষা করিতেছেন—আর সে তাঁহার প্রতি বুকভরা অসীম ভক্তিপ্রীতি লইয়াও তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রতীক্ষায় এখানে পড়িয়া আছে। মহাপাতকের একটুমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিবারও সামর্থ নাই। না—নিশ্চয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত পাপকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে! জগতে এমন কোন মহাপাতক বা উপপাতক নাই, যাহার জন্য এমন নির্ম্মম প্রায়শ্চিত্ত ঘটিতে পারে। তুষানলের চেয়েও এ ভয়ানক; দগ্ধক্ষতে লবণ ছিটাইলে তাহার জ্বালাও বুঝি এমন অসহনীয় হয় না।

এমন করিয়া দুইটি দীর্ঘতর দিন রাত্রি কাটিয়া গেলে, শেষে আর কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া, একান্ত মুহ্যমান হতবুদ্ধি পিতাকে আসিয়া সে বলিল, "বাবা, চল, আমি না হয় মাসীমার বাড়ী চাঁদপুরে নাম্‌ব, তুমি সেখানে যেও।"

রমাবল্লভ গৃহে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন, কেবল কন্যার অসম্মতির জন্য কতকটা বটে এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়াও কতকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে জড়বৎ ঘরের মধ্যেই পড়িয়া ছিলেন। বিশেষতঃ জমিদার-সন্তানের পক্ষে সাধারণের মত অকস্মাৎ কোন একটা কাজ করিয়া ফেলা সহজ নহে। চিরাভ্যস্ত পদ্ধতির হাত ছাড়ান মানুষের নিজের ইচ্ছারও খানিকটা বাহিরে। কিন্তু এবার আর বিলম্ব হইল না, কন্যার সম্মতি পাইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। পাঁচজনে আপত্তি করিয়া বলিল,

"সে কি! এমন করিয়া কোথায় যাইবেন? কোন উদ্যোগ নাই, আয়োজন নাই, কষ্টের একশেষ হইবে যে? আপনার প্রাণ, মহৎ প্রাণ, এ কি আমি তুমি হেঁজিপেঁজি কেউ যে, হুট্‌ করিতেই বাহির হইয়া পড়িব? কখনও কি কষ্ট সহা অভ্যাস আছে!"

পুরোহিত পাঁজি খুলিয়া কহিলেন, "সম্মুখে যোগিনী লইয়া যাত্রা—এ যে সাক্ষাৎ কালের সহিত খেলা করা! এমন কর্ম্ম করিবেন না, করিবেন না, আগামী পরশ্ব অতি উত্তম দিন আছে। সে দিন মহেন্দ্রযোগে যাত্রা করিলে সর্ব্বসিদ্ধ ফল লাভ ঘটে।"

রমাবল্লভ ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "দিনক্ষণ দেখার ত আর সময় রাখি নি—আশুনাথ! যা-ই হোক্ আজ আমাদের যেতেই হবে।"

বাণী নীরবে পিতার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ঔষধপত্রগুলি গুছাইয়া লইল। শুধু এইখানেই তাহার অসাড় চিত্তে একটুখানি স্পন্দন মাত্র জাগ্রত ছিল।

পথের বাহির হইয়াও যন্ত্রচালিত পুত্তলির মত শোকাহত পিতার সঙ্গে চলাফেরা করিতেছিল। তাহার নিজের একটা নিজস্ব অস্তিত্ব যেন তাহার মধ্যে আর বর্ত্তমান ছিল না। এ সংসারের মধ্যে তাহার জন্য আর কিছুই সঞ্চিত নাই। এখন এইটুকু মাত্র শুনিবার জন্য সে শুধু উৎসুক হইয়া আছে যে, তাহার পত্র সময়ে পৌঁছিয়াছিল; মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার স্বামী তাহার মনের কথা শুনিয়া গিয়াছেন। সে এই একমাত্র প্রার্থনাই গোপীবল্লভের নিকট বিদায়কালে জানাইয়া আসিয়াছিল। ইহার বাহিরে—এইটুকু ব্যতীত তাহার সারা প্রাণ যেন মরিয়া গিয়াছে। আর সে মৃত্যু শুধু তাহার আসন্ন বিপদের আতঙ্কেই যে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; সেই বজ্রের সহিত আরও একটা অতি তীক্ষ্ণধার ক্ষুরবাণ ছিল। সেটা তাহার স্বামী মৃত্যুশয্যায় তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া ক্ষমাহীন সান্ত্বনা পরিশূন্য যে শাস্তি দিয়াছেন তাহারই অসহ্য স্মৃতি! সে জ্বালা ক্ষতের

চেয়েও ঔষধের জ্বালার মত সকল কষ্টকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল যেদিন এই সংবাদ আসিয়াছে, সেই দিনই সে তাঁহাকে অনন্তকালের জন্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। মৃত্যু হয় ত তাহাদের মাঝখানে ব্রহ্মপুত্র মেঘনার চেয়ে বেশী ব্যবধান সৃজন করিতে পারিত না; কিন্তু তাহার স্বামী নিজের হাতে যে গণ্ডী দিয়া চলিলেন,—ওগো, সে যে তাহার এ জন্মের এই ভীষণ শপথের চেয়েও দুর্লঙ্ঘ্য!

মৃত্যুর নির্ম্মম হস্ত তাহাকে যথার্থ বৈধব্য প্রদান করিবার পূর্ব্বেই ব্যাধ-বিদ্ধ ক্রৌঞ্চ-পত্নীর মত তাহার সারা চিত্ত স্বামীর ক্ষমাহীন বিদায়-সম্ভাষণে অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইয়া লুটাইতেছিল। পাছে মৃত্যুর পূর্ব্বের দিনগুলা তাহার সঙ্গ তাহার সেবা গ্রহণে অশান্ত হইয়া উঠে, সেই ভয়ে তিনি তাহাকে তাহার অভিশপ্ত জীবনের শেষ সান্ত্বনাটুকু হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন। এই নিদারুণ স্মৃতি বক্ষে বহিয়া বাঁচা তাহার পক্ষে কি কষ্টকর—অথচ মরণেরও কোন পথ নাই!

শিয়ালদহে ট্রেণে উঠিতে হইবে। পথ বড় দীর্ঘ, অসুবিধাজনক ও বিপদ-সঙ্কুল। আকাশ মেঘে ভরা, ঝড়বৃষ্টি নিত্য হইতেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমাবল্লভ ভাবিলেন, এমন দিনে বাণীকে আমার কখনও ঘরের বাহিরে যাইতে দিই নাই, আর আজ কি না—তাহাকে মেঘনা পারে যাইতে হইবে! নিজের মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল।

বাণী আকাশে ভীমকান্ত সজল জলদ দৃষ্টি করিয়া মনে মনে ভাবিল, মেঘনায় যদি তুফান উঠে ত মন্দ হয় না।

রেলে প্রথম শ্রেণীর কামরার দ্বারে দাঁড়াইয়া রমাবল্লভ অতর্কিত-দৃষ্ট বহুদিনের পরিচিত প্রিয়বন্ধু বিখ্যাত ডাক্তার জগতিবাবুর প্রশ্নের উত্তরে আসন্ন বিপদের সংবাদ দিতে দিতে বিষাদ-ছবি কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, এমন সময় কতকগুলা লোক একখানা চারপায়া বহিয়া প্ল্যাটফরমের উপর তাঁহাদেরই নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

বাহকগণ একটা মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিসের লোক এবং আর একটি ভদ্রলোক, বোধ করি ডাক্তার হওয়াই সম্ভব, হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে।

বাণী কামরার জানালার নিকটেই বসিয়া ছিল। এতগুলা লোকের একসঙ্গে চলার শব্দেই হউক, না হয় আর কি হেতু বলা যায় না, সে সেই সময় বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল—শীর্ণ দুর্ব্বল একটি লোকের দেহ চারপায়ার উপর শায়িত। দিনের আলো পূর্ণতেজে সেই মৃত্যুবিবর্ণ মুখের উপর পতিত হওয়ায় তাহা পাণ্ডুতর দেখাইতেছিল। সেই অস্থিসার কঙ্কালের উপাধানহীন মস্তক বাহকগণের অসাবধান পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এধারে ওধারে গড়াইয়া পড়িতেছিল। একখানা হাত অবশভাবে পাশের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহার সরু লম্বা আঙ্গুলের শেষে দীর্ঘ নখ নীল মাড়িয়া গিয়াছিল। বোধ হয় কোন দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষয়শীল রোগ-যন্ত্রণার শেষে হতভাগ্য চির-বিরাম লাভ করিয়াছে। বাহকগণের দ্রুত গতি মন্দীভূত করিবার জন্য সঙ্গের ভদ্রলোকটি হঠাৎ হাঁকিয়া উঠিলেন, "ধীরসে।"

বাণী নিস্পন্দলোচনে সেই অনাচ্ছাদিত শবের পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিশ্চয় এই লোকটি অনেকক্ষণ হইল মরিয়া গিয়াছে! মুখে এতটুকু একটু জীবনের জ্যোতিও ত কই অবশিষ্ট নাই! যেন কোন শোণিত-পায়ী জীব নিঃশেষে তাহার সারা দেহের রক্তটুকু শুষিয়া লইয়াছিল।

বাহকগণ অগ্রসর হইতেছিল। বাণী মুখ ফিরাইল, আকস্মিক বাণবিদ্ধের মরণ আর্ত্তনাদের মত তাহার মর্ম্ম ভেদ করিয়া সহসা একটা

হাহাকার ধ্বনি উঠিল, "বাবা! ও কে বাবা? দেখ—দেখ ও—কে? ও ভগবান, এ আমায় কি দেখালে!—কি দেখালে!—কি দেখালে!"

রমাবল্লভ নিজ কাহিনীর দুঃখভারে একান্ত অভিভূত থাকাতে অত্যধিক অন্যমনা ছিলেন; সেজন্য শববাহক বা শবদেহের প্রতি এ যাবৎ তাঁহার দৃষ্টি বা মন আকৃষ্ট হয় নাই। এখন কন্যার এই আকস্মিক উত্তেজনার অভিব্যক্তিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চমকিয়া চারিদিকে চাহিতেই তাহাদের তিনি দেখিতে পাইলেন; কিন্তু কিছুই তাঁহার যেন বোধগম্য হইল না। তথাপি বুকের মধ্যে একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক সমুদ্র-তরঙ্গের মতই উত্তাল হইয়া উঠিল। অতিমাত্র ব্যস্তভাবে ফিরিয়া ব্যগ্র-কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "কোথায় রাধারাণি, কোথায়—কে?"

বাণী বেতসপত্রের ন্যায় সঘনে কাঁপিতেছিল; তবু সে নিজেকে স্থির রাখিবার চেষ্টায়, বাক্যোচ্চারণ করিবার জন্য প্রাণপণে নিজের সঙ্গে যুঝিতে লাগিল। অবশ অঙ্গুলি কোনমতে উঠাইয়া মৃতের দিকে দেখাইয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠের মধ্য হইতে ঠেলিয়া স্বর বাহির করিল—"ঐ যায় বাবা, এখনই কোথায় নিয়ে যাবে। ঐখানে সে—যাও তুমি—যাও—তুমি, —যা—ও—তুমি।"

একটা মহাভয় রমাবল্লভকে যেন জড়বৎ করিয়া ফেলিল—তিনি হয় ত তখনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেন—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে জগতিবাবুর আকর্ষণে চমক ভাঙ্গিতেই আসন্ন বিপদের মধ্যে হতাশ্বাসের শেষ সাহসও যেন তাঁহার এই কয়টি কথায় আবার ফিরিয়া আসিল। "এসো, রমা-বল্লভ! আমি ত চিনি নে, দেখ দেখি—মা'র সন্দেহ সত্য কি না। এ বিচিত্র জগতে কিছুই ত অসম্ভব নয়!"

রমাবল্লভ শবের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়াই বুকফাটাস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন, "অম্বর—বাপ আমার!"

সঙ্গের ডাক্তারটি তাঁহাদের ভাব দেখিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিলেন, "থার্ড ক্লাস কামরায় পড়িয়া ছিল, প্রাণ আছে বলিয়া মনে হওয়ায় হাসপাতালে পাঠাইতেছিলাম। ইনি আপনাদের পরিচিত না কি? আমার ত বোধ হয় আপনারা ভুল করিতেছেন। এ ব্যক্তি নিতান্তই দরিদ্র। সঙ্গে একটি কপর্দকও নাই। দেখিতেছেন—পরা কাপড়খানি পর্য্যন্ত গরীবেরই মত!"

জগতিবাবু কহিলেন, "হ্যাঁ, এঁর জামাই ইনি। সে অনেক কথা, এখন থাক। আমার বাড়ী হ্যরিসন রোডে—নিকটেই। চল, সাবধানে সেইখানেই নিয়ে যাই। আমিও ত ডাক্তার। আমায় আপনারা স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করতে পারেন। সেখানে ওঁর জন্য মানুষের সাধ্যে যা হয়, তার ত্রুটি হবে না। চল্—খুব সাবধানে নিয়ে চল্। খাটটা যেন না দোলে দেখিস্!" ডাক্তারবাবু সাবধানে সেই লম্বিত হাতখানা উঠাইয়া দিবার সময় চমকিয়া উঠিলেন। সে হস্ত একেবারে নাড়ীর স্পন্দহীন, শবহস্তের ন্যায়ই শীতল।

রমাবল্লভকে গাড়ীতে উঠিতে বলিয়া তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, বাণী আসিতেছে। সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ওঠো মা!" সে কিছু না বলিয়া যন্ত্র-চালিতের মত গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিল। তাহার একবার মনে হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে যেন ইহলোকে নাই; যম-যন্ত্রণায় সে এই সকল বিভীষিকা দর্শন ও দণ্ডভোগ করিতেছে।

জগতি ডাক্তারের খুব নাম-যশ, অর্থ-ঐশ্বর্য্যও তদনুরূপ। সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটার সিঁড়ি বাহিয়া শব-বাহকগণ উপর তলায় উঠিয়া গেল। ডাক্তারবাবু হাঁকিলেন, "বাঁয়ে।" বামপার্শ্বের একটি প্রশস্ত কক্ষে তাহারা প্রবেশ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে বাণীও তাহাদের অতিক্রম করিয়া সেই কক্ষের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া ঢুকিল। তাহার মনে ভয় হইতেছিল, হয়

ত ইহারা তাহাকে এ ঘরে প্রবেশ করিতে না দিয়া এখনই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবে।

গৃহের মধ্যস্থলে খাটের উপর পরিষ্কার শয্যা বিছানো। শয্যার নিকটে চারপায়াখানা নামাইয়া সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, যেন এইবারই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সময়টা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে সমস্যা আর কিছুই নয়—তাহা শুধু জীবন-মরণের সমস্যা! তাহারা যে অবলুণ্ঠিত দেহ এইবার সযত্নে উত্তোলন করিবে—তাহা মৃতের না—জীবিতের?

বাণী খোলা মাথায় বিস্রস্ত-বসনে সেই অপরিচিত দলের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তার অম্বরের নাড়ীহীন হস্ত স্পর্শ করিতেই সে তাঁহার কাছে গিয়া কহিল, "আমার স্বামী—কাকাবাবু—আমার স্বামী এতদিন পরে আমার কাছে ফিরে এসেছেন।" তাহার কণ্ঠ যেন কূপের মধ্য হইতে কথা কয়টা উচ্চারণ করিল।

ডাক্তার তাঁহার সহকারীর সাহায্যে অম্বরের মৃতবৎ শরীর বিছানার উপর স্থাপন করিলেন; কহিলেন, "এখনও প্রাণ আছে। না—ব'লছ কেন? নাড়ী না থাক, অতি ক্ষীণ হ'লেও নিশ্বাস আছে বৈ কি। রমাবল্লভ, অধীর হয়ো না। বরং এখন একবার বাইরে যাও, স্থির হবার চেষ্টা কর। রাধারাণি মা, জানালাটা খুলে দিয়ে ওইখানে বাতাসের কাছে একটু দাঁড়িয়ে নিজেকে স্থির ক'রে নাও। এখন কাতর হ'লে চলবে না, তোমার স্বামীর জন্য মনকে শক্ত ক'রে ফেল দেখি!"

এ অব্যর্থ শব্দ! সে মন্ত্রমুগ্ধের মত আজ্ঞা পালন করিল। বাহিরে অবিশ্রাম বন্যাবেগে ট্রাম মোটর ও ঘোড়ার গাড়ী ছুটিতেছে, ফুটপাতে লোক চলারও বিরাম নাই। কর্ম্মকোলাহলময় ধরণীর বক্ষ হইতে আজ তাহার সকল আশা আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই ঝরিয়া পড়িবে। এই

যে অগণ্য গ্রহনক্ষত্রবিভাসিত উদার নীল আকাশ, ওইখানে কোন্ এক অপরিজ্ঞাত নূতন রাজ্যে তাহার জীবনসর্ব্বস্ব সকল ক্লেশমুক্ত জীবন লইয়া চলিল। না জানি, সেখানে কি শান্তিই তাহার জন্য সঞ্চিত আছে!

শীতল বাতাসে তাহার লুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত হইলে সহসা সে বুঝিতে পারিল, কেন অম্বর তাহাকে তাহার নিকট যাইতে নিষেধ করিয়া সেই-খানেই থাকিতে বলিয়াছিল! তাহার প্রতি অভিমান অথবা অনাগ্রহে সে তাহাকে দূরে রাখিতে চাহে নাই, নিজে সে মরণের পূর্ব্বে তাহাদের মাঝখানে ফিরিতে চাহিয়াছিল। ও ভগবান! সে যদি সেই শূন্য গৃহে গিয়া পৌঁছিত!

সে ফিরিয়া দেখিল, ঘরে আরও দুই-একজন নূতন লোক প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় রোগীর নিস্পন্দ দেহের মলিন বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলা হইল। বাণী নিকটে আসিল। বস্ত্রমধ্য হইতে একখানা খামভরা চিঠি পড়িয়া গিয়াছে—পত্রখানির উপর অম্বরের হাতের লেখা,—সেখানায় ডাকটিকিট লাগান ছিল, ডাকে পাঠানো হয় নাই। দূর হইতেও সে হস্তাক্ষর সে চিনিয়াছিল—তাই সাগ্রহে সেখানা ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইল। উপরে তাহার নামে রাজনগরের ঠিকানা লেখা। তাহার কণ্ঠ মধ্য হইতে অকস্মাৎ একটা আর্ত্ত স্বর বাহির হইল। তবে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে সে তাহাকে—তাহারই নির্ম্মম হত্যাকারিণীকে বিস্মৃত হয় নাই? এমন ক্ষমাশীল স্নেহময় স্বামী সে হেলায় হারাইল!

ডাক্তার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্নেহ সান্ত্বনার সহিত তাহার অবসন্ন মস্তকে হাত রাখিয়া কহিলেন, "রাধারাণি, সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় বিপদে অধীর হয়ো না। বাইরে যাও, আমাদের উপর বিশ্বাস কর, এর কোন রকমে সেবা যত্নের ত্রুটি হবে না। সহরের সব চেয়ে বড় বড় ডাক্তারদের আমি আনতে পাঠিয়েছি—যথাসাধ্যই করব। যাও—এখন

তুমি গিয়ে মাথা ঠিক্ কর। যতক্ষণ প্রাণ আছে—ততক্ষণ যেমন অবস্থাই হোক, আমরা কোন মতেই আশা ছাড়্তে পারি নে। কে জানে হয় ত প্রতি মুহূর্ত্তেই সংজ্ঞা ফিরতেও পারে। আর তা যদি হয়, তবে তোমার তখন বড় ধৈর্য্য রাখা চাই। সে সময় কাতর হয়ে পড়লে মুহূর্ত্তে সর্ব্বনাশ ঘটবে। এই বুঝে নিজের মন কঠিন কর।"

"যদি সংজ্ঞা ফেরে?" আহা, এ কথা কে বলিল গো? বাণীর ইষ্টদেব! এমন দিন কি তুমি সত্যই তাহাকে দিবে? সে সচেতন হইয়া উঠিয়া প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—"আমায় তখন ডাকবেন ত? যদিই—না, আমি, যাব না। যদি সে সময় আমায় ডাকতে আপনারা ভুলে যান। যদি আমার আস্তে দেরী হয়ে যায়? না কাকাবাবু, দয়া করে আমায় একপাশে থাকতে দিন। আমি চুপ করেই থাকব।"

"না, না—যাও—ডাকব বই কি।—অমৃত, ষ্ট্রিক্নিন্, আর হাইপোডার্ম্মিকটা আনা হয়েছে। ব্যাগ দুটোয় গরম জল ভরা হ'ল? দাও, ততক্ষণ হাতে পায়ে দাও। আচ্ছা, ব্যাটারিটা ঠিক কর—করা হচ্চে? বেশ, যাও—ঐ পাশের ঘরটা খালি পাবে বোধ হয়—রাধারাণি, দেরী ক'র না—শান্ত হয়ে এসো, যাও মা, ভয় নেই—তোমায় ডাকব বই কি। অস্থির হ'লে কোন কাজই ত কর্‌তে পার্‌ব না, যাও।"

বাণীর পিছনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া ডাক্তার জগতিবাবু রোগীর কাছে ফিরিয়া আসিলেন। রোগীর দুই হস্তের কবজীতে ধমনী নিশ্চল, বক্ষ স্থির, কেবল নাসা-পথে অতি মৃদু শ্বাস যেন সসঙ্কোচে বাহিরের পথ খুঁজিতেছিল। তাহাও এত ধীর যে, প্রতিক্ষণেই ভয় হয়, বুঝি এইবার স্তব্ধ হইয়া গেল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

স্বপ্নের জাগ্রত স্মৃতির মত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্ত যে অপ্রত্যাশিত ঘটনারাজি ঘটিয়া গেল, তাহার মাঝখান হইতে বাহির হইয়া বাণী মন্ত্রসম্মোহিতবৎ বারান্দা অতিক্রম করিয়া ডাক্তারের নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিল। জোর করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া যে সেখানে থাকিবার চেষ্টা করিবে, এমন শক্তি তাহার মধ্যে ছিল না। শোক-দুঃখের ব্যাকুলতার অপেক্ষা বিস্ময়ের বিহ্বলতাই যেন তাহার হতবুদ্ধি চিত্তকে সমধিক অধিকার করিয়া তাহার মধ্যে একপ্রকার মূঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছিল। যখন কাহারও জীবনে কল্পনারও অতীত কোন একটা বিশেষ ঘটনা অকস্মাৎ সত্য হইয়া দেখা দেয়, তাহার জীবনের এতদিনকার বাস্তবগুলাকে অবধি সেই সঙ্গে সে যেন অস্পষ্ট অবাস্তবে পরিণত করিয়া ফেলিয়া সবাইকেই একাকার লণ্ডভণ্ড করিয়া তোলে। সে যে কোথায় আছে, কি করিতেছে, সে সব ত দূরের কথা, পাথরের মেঝের কঠিনত্ব ও কলিকাতার রাস্তার অবিশ্রাম শব্দলহরী পর্য্যন্ত আর তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল না। সে যখন সেই অপরিচিত গৃহে প্রবেশ করিল, তখন এই একমাত্র সত্য কেবল তাহার মনে জাগিয়া রহিল যে, তাহার স্বামী তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছেন। আর শুধু তাই নয়—তিনি তাহারই জন্য পত্র লিখিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন।

তিনি যে মৃত্যু-শয্যায়, সে কথা মিথ্যা নহে। মৃত্যুর ঐ বিভীষিকা-পূর্ণ রূপ চোখের উপর দেখা—সে অতি ভয়ানক! একান্তই অসহ্য সে! তথাপি—তিনি যে আসিয়াছেন—নিশ্চয় তাহার কাছেই আসিয়াছেন, এই অনুভূতিটুকু সমস্ত বিয়োগব্যথা হতাশা ক্লেশ শান্ত করিয়া শীতল প্রলেপের মত তাহার দগ্ধ ক্ষত জ্বালাপূর্ণ চিত্তের উপর কে যেন বুলাইয়া দিল।

তার পর সহসা তাহার স্মরণ হইল, এখন তাহার উপর কি দায়িত্বের ভার পড়িবে। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, 'হয় ত তাহার চেতনা ফিরিতে পারে।' পারে কি? ঐ দেহ—কি স্থির! কি বিবর্ণ! আর কি ম্লান সে মুখ! জীবন থাকিতে অমন হয় কি? ওঃ—!

কিন্তু কেন—পারিবে না কেন? যিনি তাহাকে এ অবস্থায় তাহার কাছে আনিয়া দিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে কি না হয়? মৃত ব্যক্তি জীবন পাইবে, সে আর এমন বেশী কথা কি? সে একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিল। তবে দেখি, তিনি কি লিখিয়াছেন? হয় ত এমন কিছু থাকা সম্ভব, যাহা আমার এখনই জানা প্রয়োজন।

তাহার শীতল করতলের শিথিল মুষ্টিমধ্যে পত্রখানাকে সে ধরিয়া রাখিয়াছিল। আপনাকে কিঞ্চিৎ সামলাইয়া সে পত্রাবরণ মোচন করিতে গেল। খামের উপর এক পার্শ্বে লেখা আছে, "যিনি এ পত্র দেখিতে পাইবেন, মৃতের প্রতি দয়া করিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিবেন।" তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া পত্রখানা সে বাহির করিল। পত্রে লেখা আছে—

"বাণি, সহধর্ম্মিণী আমার! চলিলাম! অনেক দূর রাজ্যে, জানি না কোথায়, কোন্ বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে, হয় ত যুগান্তরব্যাপী তামসী রাত্রির বিরাট উদর-গহ্বরে যন্ত্রণাময় নূতন জীবনে উদিত হইতে চলিয়াছি। কে জানে? কে বলিতে পারে মানবের কর্ম্ম অভাগা শরীরীকে মৃত্যুর পরপারে কোন্ অবস্থান্তর প্রদান করিবে? স্বয়ং ধর্ম্মরাজও একদিন নাচিকেতার এ প্রশ্নের সমুচিত সমাধান করিতে সমর্থ হন নাই। তাই স্বতঃই মনে উদয় হয়, কর্ম্মসূত্র কোন্ পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—ভয় নয়—শুধু কৌতূহল জাগে—জানিতে ইচ্ছা হয়—সাধ যায়।

"কিন্তু না, এখন আর এ চিন্তা নয়। এখন আমি সর্ব্বদা এই কথাই ভাবি, মৃত্যুর যে চির-সুন্দর চির-নবীন রূপ আবাল্য পরমসুহৃদের ন্যায় প্রীতির চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহারই স্নেহ অঙ্কে এই সংসার-মলময় পঙ্কিল জীবন শান্তিপূর্ণ করিতে চলিলাম। সে কোন দূর রাজ্য নহে, জীবনের চেয়ে মৃত্যু সেখান হইতে মানুষকে নৈকট্য দান করে। সকল কর্ম্ম-বিপাক সেখানে লয় পায় এবং অমৃতময় জীবন লাভ ঘটে। সেই চিরবাঞ্ছিতের চরণপদ্মে আশ্রয় লইতে চলিলাম।

"বেশী কথা লিখিব না। এখন যাহা বলিবার আছে, তোমার সম্বন্ধে সেই একমাত্র কথাই লিখিতে বসিলাম। বাণি! মৃতের এ অমার্জ্জনীয় অপরাধ কি ক্ষমা করিতে পারিবে না? তোমার কাছে আজ এই মানসিক পাপটুকু গোপন করিয়া যাইতে পারিলাম না। তাই লিখিতেছি, তুমি আমায় একান্ত বিশ্বাস করিয়া যে অধিকার দিয়াছিলে, আমি যথাসাধ্য তাহা পালনে যত্নও করিয়াছিলাম, তাহা বোধ করি তুমিও জান? কিন্তু (হয় ত) অনুচিত হইলেও মনের মধ্যে—অযোগ্য অভাজন আমি, তোমায় দূরে রাখিতে পারি নাই। আমার স্ত্রী, আমার রাধারাণী বলিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছি। সেই প্রথম দিনেই—অর্থাৎ যে দিন তোমার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তোমার পিতা আমায় ডাকিয়া পাঠান, সেই দিন এ বিবাহের অসঙ্গতি বিচার করিবার সময়েই বুঝিতে পারি—তোমার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতায় যে পরিমাণে আমার মন তোমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত, তাহাতে তোমায় স্নেহ প্রীতি ভালবাসা প্রদান করা আমার পক্ষে একটুও অসম্ভব নয়। বিশুদ্ধ প্রেম—শ্রদ্ধা ভক্তি বা স্নেহেরই রূপান্তর। বুঝিলাম, ইহ-পর জীবনের জন্য এ মন্ত্রপাশ বন্ধন শপথ গ্রহণে আমার পক্ষে ধর্ম্মহানির ভয় নাই। বিশ্বাস করিবে কি রাধারাণি! এ সংবাদ নিজের অজ্ঞাত রহিয়া গেলে আজ

আমি তোমাদের কোন কাজেই লাগিতে পারিতাম না। সেই প্রথম মুহূর্ত্তেই বুঝিয়াছিলাম—তুমি আমার কি!

"বেশী কিছু বলিব না। তার পর? বিবাহের মন্ত্রে সে ভালবাসার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তার পর দণ্ড পল বিপল! তোমার নিকট হইতে দূরে থাকিয়াও দূরত্বের অনুভব খুব অল্পই হইয়াছে। প্রচ্ছন্ন ভালবাসা হইলেও, আমার মনে বিন্দুমাত্র জাগতিক মোহ বা লাভাকাঙ্ক্ষা না থাকায়, আমি তোমার প্রতি প্রেম বড় উচ্চপ্রেমের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলাম। বিশ্বশক্তির একটি ক্ষুদ্র শক্তিরূপে তোমায় আমার হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। শুধু একটুখানি আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিয়াছিল, তাহাতেও পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় অতৃপ্তি ঘটে নাই। মনে পড়ে, সেই শেষ দেখা? সে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। কিন্তু সেদিন যতটা আশা করিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ পাই নাই। তোমার চোখের দৃষ্টিতে যে মনের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা আমাকে শুধু বিস্মিত নয়, ব্যথিতও করিয়াছিল। তোমার চোখে অমন সলজ্জ বিষণ্ণ দৃষ্টি আমি কখনও দেখি নাই। সে ত সেই সংসারাতীত আত্ম-বিস্মৃত ভাব নয়। সে যে স্নেহময়ী—প্রেমময়ী—নারীর দৃষ্টি!

"যাক্, সে কথা থাক্। এখন আমার এই অযোগ্য ভালবাসা-প্রকাশে কি তুমি বিরক্ত হইলে? আমার মনের এ ভালবাসা কি তোমার পক্ষে অপমানের বিষয় বাণি? কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও স্মরণ করিও যে, যে তোমায় এতদিন গোপনে ভালবাসিয়া আসিয়াছিল, সে ত আজ আর বাঁচিয়া নাই। মৃতের ভালবাসায় ক্ষতি কি, বাণি, জীবনে তোমার সহিত সম্বন্ধ রাখিব না, এই শপথ ছিল। মৃত্যুও কি তাহা ভঙ্গ করিতে পারিবে না? বাহ্যিক শপথ ভঙ্গ না করিলেও আমি

মনের এ পাপটুকু রোধ করিতে সক্ষম হই নাই। তাই আজ সে অপরাধ তোমার কাছে স্বীকার করিয়া গেলাম।

"এইবার বিদায়—বাণি—বিদায়! যদি আমায় ভুলিলে তুমি সুখী হও, তবে ভুলিয়ো। এত স্বার্থপর আমি হইতে চাই না যে, তোমায় আমাকে মনে রাখিবার অনুরোধ করিব। কিন্তু যদি মনে থাকে, কখন কখন মনে যদি পড়ে, মনে করিও, একজন আজ পৃথিবীর বাহিরে এখনও তোমায় ভালবাসে! হাঁ—এখনও। তোমার প্রতি আমার ভালবাসা—কামনা-লেশহীন, পবিত্র এবং সে ভালবাসা সেই অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের মধ্য দিয়াই উৎসারিত, তাই তাহা অসীম ও অফুরন্ত। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমার মৃত্যুতে দুঃখিত হইও না। গোপীবল্লভের চরণে অচলা ভক্তি রাখিও।

তোমার অযোগ্য স্বামী অম্বর।"

"পুনশ্চ, তোমাদের নিকট হইতে এত দূরে থাকিয়া মরিতে ইচ্ছা করিতেছে না। ডাক্তার ডাকাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, 'মৃত্যু নিশ্চিত'—বড় জোর পাঁচ-সাত দিন কোনমতে কাটিতে পারে। তাই অবিলম্বে এ স্থান ছাড়িয়া চলিলাম। যদি রাজনগরে পৌঁছিতে পারি তবে একবার মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমার পূজা-রত মূর্তিখানি দেখিব। এই একটি সাধ—শেষ সাধ আছে। জানি না, এ বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কি না। গোপনেই যাইব, তুমি বা আর কেহ জানিবে না। ইচ্ছা আছে, যদি সময় থাকে, তবে ইহার পরে গঙ্গাতীরে শেষ শয্যা পাতিব। তুমি সেখানে থাকিবে ত? গিয়া যদি দেখিতে না পাই, তবে বড় নিরাশ হইব।

অম্বর।"

পত্র পাঠ যখন শেষ হইল, তখন ঝটিকা-শান্ত প্রকৃতির ন্যায় বাণী স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। অতি অল্পক্ষণের জন্য তদবস্থ থাকিয়া, নবজাগ্রত বিপুল

মানসিক শক্তিতে সে আপনার অন্তর্বাহ্য সমস্তটাকেই প্রকৃতিস্থ করিয়া ফেলিয়া ধীর অকম্পিত চরণে ঘরের বাহির হইল।

মৃত্যুকে সে আর ভ্রুক্ষেপও করে না—সে তাহার দুই হিমশিলা-শীতল হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার সম্মুখীন হইতেছে, সেই শীর্ণ করকাবর্বী অঙ্গুলির স্পর্শানুভবে তাহার শিরার মধ্যে উষ্ণ শোণিতও থাকিয়া থাকিয়া বুঝিবা তেমনি শীতল ও জমাট বাঁধিয়া যাইতেছে—তাহাতে কি আসিয়া যায়? আর সে তাহাকে ভয় করে না, এখন নির্ভীকচিত্তে সে তাহার সহিত যুঝিতে চলিল। তাহার স্বামী তাহাকে ভালবাসে, সে তাহার কাছে মৃত্যুশয্যা পাতিতে আসিয়াছে, আর কি দুঃখ? কিসের অভাব আর?

অর্দ্ধ-অন্ধকারময় কক্ষে যেখানে মৃত্যুশয্যায় অম্বর শায়িত, সেই গৃহে নিঃশব্দ চরণে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, দরজা ও বিছানার মধ্যস্থলে একটা চৌকির উপর একজন শুশ্রূষাকারিণী বসিয়া মধ্যে মধ্যে রোগীর দিকে চাহিতেছে। বাণী প্রবেশ করিবামাত্র সে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া আসিয়া বলিল, "আপনি—চিনি না কে, যদি এই রোগীর স্ত্রী হন—ডাক্তারসাহেব হুকুম দিয়ে গিয়েছেন যে, যদি রোগীর চেতনা ফেরে তখনই আমি আপনাকে এই বাঁ দিকের ঘরে খবর দিয়ে আসব—আর তাঁকেও জানাব। তিনি ঠিক ঐ সামনের ঘরে ঔষধ ঠিক করছেন। অন্য ডাক্তারেরাও ঐখানে আছেন। এখন আপনি অনায়াসে বাইরে থাকতে পারেন, কিন্তু রোগীর যে আর জ্ঞান হবে, এমন ত আমার মনে হয় না। একটু পূর্ব্বে সামান্য ক্ষণের জন্য সেই ইন্‌জেক্ট করবার পরই একটিবার যা একটু হয়েছিল।

বাণী বারেক অন্তর্বিদ্ধের ন্যায় ভয়ার্ত্তনেত্রে শুশ্রূষাকারিণীর বিকার-বর্জ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; তাহার সেই তীব্র বেদনাস্নিগ্ধ ভৎ'সনা দৃষ্টি যেন তাহাকে ব্যাকুল অনুযোগে বলিল—এমন করিয়া তুমি

আমার আশার মূলে কুঠার তুলিয়ো না—চুপ্ কর! পরক্ষণে সে শান্ত স্বরেই তাহাকে কহিল, "আমি এখানে একা থাক্‌তে চাই, তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর। যদি দরকার হয়, আমিই তোমাকে সাহায্যের জন্য ডাক্‌ব!—ডাক্তারসাহেব রাগ কর্‌তে পারেন! না—আমি বল্‌ছি, রাগ কর্‌বেন না! আচ্ছা, ইচ্ছা হ'লে তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌তেও পার। সেই ভাল।"

শুশ্রূষাকারিণী বারকয়েক আপত্তি করিয়া শেষে তাহার আগ্রহাতিশয্যে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন বাণী ধীরে ধীরে শয্যার নিকট অগ্রসর হইল এবং অম্বরের পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া সেই সংজ্ঞাহীন শীতল দেহ ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে নিজের বুকের কাছে টানিয়া উপাধানহীন মস্তক নিজের সুগোল বাহুলতায় তুলিয়া লইয়া অশ্রু-ব্যাকুলতাশূন্য স্থিরচক্ষে সেই মৃত্যুর পূর্ণ অধিকার বিস্তৃত মুখের পানে নীরবে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন আর তাহার বক্ষে বেদনা বা চক্ষে অশ্রু—কিছুই ছিল না। রোগী তখন বোধ করি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ঘুমাইতেছিল। তাহার শরীর তখন আর সেরূপ শীতল ছিল না।

এমন করিয়া বহুক্ষণ কাটিলে একবার রোগী ক্লান্তির মৃদু শ্বাস অতি ধীরে গ্রহণ করিয়া চাহিল; পরক্ষণেই অতিশয় মৃদুস্বরে কহিল, "আমি এ কোথায়? রাজনগর আর কত দূর?"

অত্যন্ত দুর্ব্বল ক্ষীণ স্বর, কথা কয়টি অনেক কষ্টে বোধগম্য হইল।

ধীর স্থির কণ্ঠে বাণী উত্তর করিল, "আর ত দূরে নেই। তুমি যে আমার কাছে, তোমার বাণীর কোলে আছ, বুঝতে পার্‌ছ না?"

"আমার বাণী! আমার বাণীর কাছে?" ক্ষীণ অস্ফুটস্বরে যেন ঈষৎ বিস্ময়ে অম্বর এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিল।

"হ্যাঁ, তোমার বাণী, তোমারই স্ত্রী, তোমারই দাসী, তোমারই সহধর্ম্মিণী! ওগো আর একবার চেয়ে দেখ! আমার যা জানাবার আছে, তা না শুনেই চলে যেও না। আমিও তোমায় ভালবাসি। তোমার ভালবাসা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ, প্রধান অহঙ্কার। আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, তবু আমি তোমার স্ত্রী, তোমার শিষ্যা—তোমার দাসী। আমায় ক্ষমা করবে না কি?"

"তুমি আমায় ভালবাস বাণি?"

এই অবিশ্বাস্য সংবাদটিকে অতি দুর্ব্বল মস্তিষ্ক যেন তাহার মনের মধ্যে ঠিক পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেছিল না। সে অনেকক্ষণ স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল। তার পর তাহার শুষ্ক চর্ম্মে ঢাকা পাণ্ডু ওষ্ঠে হাসির মত একটা ভাব প্রকটিত হইতে চাহিল। বোধ হইল সে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে। কিন্তু সে আনন্দ প্রকাশের শক্তিও আর তাহার মধ্যে বর্ত্তমান নাই। তাহার হাসি ও অশ্রুতে এখন কোনই প্রভেদ ছিল না—দুইই তাহার নিকট হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। সে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিল, "ওই কথাটা আবার বল না বাণি!"

বাণী তেমনি অনুত্তেজিত করুণা-তরল কণ্ঠে আবার সেই কথাগুলিই বলিল। তাহার পর সে কহিল, "বিবাহ যে কি বস্তু, তা আমি বুঝেছি। বিবাহ-মন্ত্র যে পতিপত্নীকে একাত্ম হ'তে অনুজ্ঞা করে, সে যে শুধু মৌখিক উপদেশমাত্র নয়, নিজেই সে যে তার মহাশক্তি দ্বারা সেই সংযোগ ক্রিয়া সাধনে সক্ষম, আমার নিকট ইহা স্থূল প্রত্যক্ষ যাবৎ বস্তুর মতই সত্য এই মহাশক্তির যে কোথাও কোথাও প্রতিরোধ দেখা যায়—বুঝতে পারি নে, কেমন করেই তেমন ঘটে থাকে! তবে এ'ও হতে পারে যে, সে মন্ত্র তোমার মত সাত্বিক-প্রকৃতি প্রকৃত বেদজ্ঞের মুখেই এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, সবার কাছে বোধ করি তার এ পূর্ণশক্তি জাগ্রত

হয় না। শুনেছি, বিশ্বামিত্র ঋষি এই মন্ত্রশক্তি দ্বারা নূতন সৃষ্টি করেছিলেন; আর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা এই বেদমন্ত্রে আহ্বান কর্‌লে মৃতও জীবনমুক্ত হয়ে উঠত। এ সব কথা মনে কর্‌তে আমার এত আনন্দ হচ্ছে, তাই তোমার কাছে বল্‌ছি।"

"তুমি আমায় ভালবাস রাধারাণি? এখন আমার মৃত্যু আরও আনন্দের মধ্যে, আরও শান্তির—"

"না, না, ও কথা নয়, মৃত্যুর কথা কেন ভাব্‌ছ?"

"কেন ভাব্‌ছি? আমায় যে যেতেই হবে বাণি! তা হোক, সে দেশ আসামের চেয়ে বেশী দূরে নয়। আর তোমার জন্য? জেনো বাণি! মহৎ দুঃখ মানুষের পক্ষে একটা মহৎ শিক্ষা। দুঃখ না পেলে মন পরিপূর্ণতা লাভ করে না, হৃদয় সরল হয় না, পরের দুঃখে গলে না। তা ছাড়া তুমি তাঁকে সেই রকমই ভালবাস ত রাধারাণি? তাঁকে ত ভুলে যাও নি?"

"না, তোমায় ভালবেসে আমি তাঁর প্রকৃত পরিচয় পেয়েছি, তাঁকে এত দিন অতি নিকটে—আমার এই বুকের মধ্যে সত্য মঙ্গলরূপে আনন্দময় মূর্ত্তিতে পেয়েছি।"

গভীর সুখে অম্বর নিশ্বাস ফেলিল, "আঃ, কি আনন্দ! আহা, কৃপাময়! তোমার কত দয়া। তিনি যে প্রেমস্বরূপ—তাই প্রেমের সাধনায় তাঁকে কাছে পেয়েছ। রাধারাণি—"

"কি? বল, বল। চুপ্ কর্‌লে কেন?" বাণী অতি যত্নে স্বামীর অস্থিময় হাতখানি এক হস্তে তুলিয়া নিজের তপ্ত গণ্ড তাহার উপর রাখিল। উষ্ণ শোণিত সেখানকার প্রতি সূক্ষ্ম শিরার মুখে মুখে ঝঞ্ঝাবেগে বাহির হইবার জন্য নিদারুণ চেষ্টায় কাটিয়া উঠিতেছিল।

মুমূর্ষু ঈষৎ হাসিল, কহিল, "মরণে এত শান্তি! পরে আরও কত! মা মৃত্যুরূপিণী জগজ্জননীর মধ্যে এ জীবনের পরিণাম শান্তিময় আনন্দময় বলি

হ'তে পারে, তার চেয়ে আর কি সুখ আছে? মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু ত এখানে, সেখানে তাঁকে পেলে—যা হ'তে এই অসীম চরাচর নিঃসৃত হয়েছে, যে আনন্দের মধ্যে এই অসীম চরাচর প্রবেশ ক'রছে, সেইখানে থেকেই জীবন আর মৃত্যুর জ্যোতিঃ এবং অন্ধকারের উন্মেষ ও নিমেষ হচ্ছে। আর তিনি স্থির হ'য়ে আছেন; কারণ তিনিই যে এই সংসরণশীল সংসারে একমাত্র ধ্রুব! সেই তাঁকে—সেই শিব অদ্বিতীয়কে মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারলে মৃত্যু যে অমৃতে পরিণত হয়, তিনি যে মৃত্যুঞ্জয়—বাণি!

বাণী কথা কহিল না। সে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের বলে নিজের পূর্ণ শক্তিকে প্রাণপণে জাগ্রত করিতে চাহিতেছিল। যদি বেদমন্ত্রে অত বড় শক্তি নিহিত থাকে, তবে এই বেদমন্ত্র-রচয়িতা মানবের প্রবল ইচ্ছামন্ত্রে কি কোন শক্তি নাই? ইহাও কি সম্ভব? মানুষ—এই ক্ষুদ্র তাপজর্জ্জরিত দীন মনুষ্যই কি সর্ব্ব শক্তির অংশ নয়? অম্বরই ত তাঁহাকে এখনই শিব অদ্বৈত মন্ত্রে পূজা করিল। তবে? সমুদ্রোত্থিত সলিল-বিন্দু কি অম্বুরাশির লবণগুণবিবর্জ্জিত হইতে পারে? মনে মনে সে দৃঢ় করিয়াই বলিল, আমি বেদজ্ঞ নহি, সামান্য অজ্ঞ রমণী মাত্র। বেদ-মন্ত্রের উচ্চারণ আমি জানি না, দেশাচার মতে সে মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারিণী আমি নই; কিন্তু সে শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ আমি জ্ঞাত আছি। সে অর্থ এই—'যদি এই রোগাক্রান্তের আয়ু ক্ষীণ হইয়া থাকে, যদি এই ব্যক্তি ইহলোক হইতে পরাগত হইয়া থাকে, যদি মৃত্যুমুখে নীতও হইয়া থাকে, তথাপি আমি নিঋতির আয়ুক্ষয়কারিণী দেবতার সকাশ হইতে ইহাকে পুনরানয়ন ও শতসংখ্যক বৎসর নীরোগ জীবন ধারণে সক্ষম করিব।' আমার সঙ্কল্পশক্তিকে পূর্ণভাবে জাগ্রত করে তুলে, আমার বেদজ্ঞ স্বামীকে স্পর্শ করে, এই মহামন্ত্রের মহাশক্তিকে কেন আমি জাগাতে সমর্থ হব না?

অম্বর স্থির হইয়া রহিল। বাণীর মনে হইল, হয় ত বা শ্বাস বহিতেছে

না ! কিন্তু তথাপি সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল না, স্থিরনেত্রে শুধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

একটু পরে অম্বর কথা কহিল ; বলিল, "কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে। আমার মনে হচ্ছে, তোমার শরীর হ'তে যেন একটা শক্তি, একটা তেজ বার হ'য়ে আমার মধ্যে প্রবেশ করছে ! সত্য কি বাণি, না, এ আমার কল্পনামাত্র ? আঃ কত সুখ—কত শান্তিই যে আমি অনুভব করছি ! আমার যেন ঘুম আসছে। বহুকাল ঘুমোই নি ; ঘুমোব বাণি ?"

"ঘুমাও !"

"বিদায় নেব কি ? কি জানি, এ কি ঘুম ?"

বাণী একমুহূর্ত্তের জন্য কথা কহিতে পারিল না। মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র তাহার প্রাণান্ত দৃঢ়তার বাঁধ দিয়া বাঁধা মনের বড় উন্মাদ অজয়ের প্রচণ্ড বন্যাস্রোতের মতই যন্ত্রণা ও অশ্রুরাশির আকস্মিক প্লাবনে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু তাহার চক্ষু দিয়া নীরবে অজস্রধারে দুর্ব্বল মানবচিত্ততার যে আভাস প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল, তাহার অন্তরের জাগ্রত দেবতার কাছে তখনই তাহা মাথা নত করিয়া ফেলিল। তখনই —পাছে সে তাহার রোদন অনুভব করিয়া উদ্বিগ্ন হয়, এই ভয়ে তাহার প্রতি গভীর প্রেমে নিজেকে অতি সহজেই বশীভূত করিয়া ফেলিয়া শান্ত-ভাবেই সে উত্তর দিল, "না, বিদায় কিসের ? ঘুমুলে অনেকটা গ্লানি দূর হবে, তুমি একটু ঘুমাও।"

অম্বর উত্তর দিল না ; তাহার অবসাদক্লান্ত চোখের পাতা দুখানি অতি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল। বাণীর বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া উঠিল ; তাহার ভয় হইল, বুঝি নিজে সে বড় বিলম্বে উত্তর দিয়াছে, তাহা তাহার নিকটে পৌঁছে নাই। সে নিজের উভয় বাহু দিয়া রোগীকে নিজের বক্ষ সংলগ্ন করিয়া রাখিল।

"বাণী!" বাণী মুখ নত করিয়া রোগীর মুখের কাছে কান পাতিয়া তাহার মত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলবে বল?"

"বড় ঘুম আসচে, মন হচ্ছে, সমস্ত শরীর মন যেন আনন্দসাগরে নিস্তরঙ্গ শান্তিসলিলে একেবারে তলিয়ে যাচ্চে। যেন তুমি আমি দুজনে পৃথক্ পৃথক্ সত্তা হারিয়ে, এক হয়ে গিয়ে, সেই অমৃতসাগরের মধ্যে রোগতাপের অতীত শান্ত সুন্দর আনন্দময় সত্তায় শয়ান রয়েছি। এখানে কোন ক্ষুদ্র আক্ষেপ বিক্ষোভমাত্র উপস্থিত করতে পারে না, এখানে শান্ত-মঙ্গল পূর্ণস্বরূপ বাধাবিহীন নিত্য-সম্মিলন। এ ঘুম ভেঙ্গে আবার সেই ক্ষুদ্র বিয়োগ-বিচ্ছেদ-শঙ্কিত জগতে বিচরণ করবার জন্য দূরে যাওয়ার চেয়ে, এই এত কাছে—তোমার বুকে মাথা রেখে, তোমার এই বিপুল প্রেম মনে প্রাণে সর্ব্বদেহে উপলব্ধি করতে করতে যদি এই ব্যাধি-জর্জ্জর জীর্ণ দেহের খেলা সাঙ্গ করা যায়, সে কি ভাল নয় বাণি?"

বাণী দুই হাতে স্বামীর মস্তক বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার শীর্ণ হস্ত আপনার কোমল করে চাপিয়া ধরিল। এই কথার মধ্যকার যতখানি বিষতিক্ত স্মৃতি ও তীক্ষ্ণ আশঙ্কা সবটাই তাহার বুকে বজ্রবলে গিয়া বিঁধিয়াছিল, তাই তাহার অনিচ্ছাকৃত শরাঘাতেও সে যেন ব্যাধবিদ্ধ কুরঙ্গিনীর মত বারেক ঘুরিয়া পড়িতে গেল। সত্য কি আবার দূরে যাইতে হইবে? একটু থামিয়া থাকিয়া পরক্ষণে উদ্দীপ্ত সাহসের সহিত সে উত্তর দিল, "আবার দূরে! কেন? তিনি নিজে সঙ্গে নিয়ে যখন তোমায় এ অবস্থায় আমার কাছে এনে পৌছে দিয়েছেন, তখন অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের যোগ কোথায়? এবার নবজীবনে তুমি আমারই।"

মনে মনে জোর করিয়া সে আরও বলিল, "শুধু তোমার নয়, আবার যে নূতন জীবন হয়েছে। সে বাণী ত আর বেঁচে নেই। আমি এক জন্মের জন্যই শপথ করেছিলাম। জন্মজন্মান্তর শুদ্ধ ত আর বাঁধা দিই

নি। এ নূতন জন্মে মৃত্যুর কাছে তোমায় ভিক্ষা করে ফিরিয়ে নিয়ে তোমায় আমি আমার করব। পারব না? কেন পারব না? সাবিত্রী তাঁর মৃত স্বামীকে বাঁচিয়েছিলেন—আর আমি পারব না? কেন, আমি কি সতী স্ত্রী নই? না—আমার শরীরে আমার সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী মা ঠাকুরমায়ের রক্ত বইছে না?”

অম্বর বারকয়েক আনন্দ-বিচলিত চিত্তে শিশুর মত তাহার বুকের মধ্যে মস্তক সঞ্চালন করিয়া স্থির হইয়া পড়িল, যেন বড় শান্তির স্থান সে লাভ করিয়াছে, এইবার ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিবে।

বাণী তেমনি করিয়া তাহার নিজের নিকটে—অতি নিকটে—বুকের মধ্যে বাহুপাশে বাঁধিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে সে কেবল এই প্রার্থনা করিল, যেন এমনই করিয়া সারারাত্রি আপনার শারীরিক সুবিধা-অসুবিধা ভুলিয়া সে যাপন করিতে পারে। সামান্য একটু নড়িয়া চড়িয়াও যেন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া না ফেলে। তাহার মনের মধ্যে কোথা হইতে প্রতীতি সুদৃঢ় হইয়া উঠিল যে, তাহা হইলেই সে তাহার এই মৃত-কল্প স্বামীকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিবে। তাহার শোণিতোষ্ণতাহীন নীল শিরার উপর সে নিজের উষ্ণশোণিত-প্রবাহিত ধমনী একাগ্রচিত্তে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল—যেন সেই সঙ্গে কোন অদৃশ্য শক্তিবলে সে আপনার শরীর হইতে তপ্ত শোণিতধারা তাঁহার অঙ্গে সঞ্চালিত করিয়া দিতেছে, এমনি প্রবল অনুভূতি তাহার নিজের মধ্যেই জাগিয়া উঠিতেছিল।

তখন তাহার একনিষ্ঠ একাগ্র হৃদয়ে চিন্তা ভয় শোক কিছুই আর বর্ত্তমান ছিল না। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার এক সঙ্গে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেবল সেই সর্ব্বসমাহিত সতী-চিত্তের সমুদায় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সে তাহার মৃতবৎ স্তব্ধ স্থির স্বামীর দেহ আপনার জীবন হইতে জীবনী-ধারা ঢালিয়া দিতে চাহিতেছিল।

প্রকৃত প্রেমের অপেক্ষা জগতে কোন শক্তিই প্রবল নহে। প্রেমময় শুধু বিশুদ্ধ প্রেমেরই অধীন।

গৃহ গভীর নিস্তব্ধ! ডাক্তার বার বার আসিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেলেন, সে দৃশ্যে তাঁহার আত্ম-বিশ্বাসী হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাসনে একই ভাবে বসিয়া এই যে মহাতপস্তাপরায়ণা যোগিনী শবসাধনে সমাধিমগ্না, সিদ্ধি আপনি দুই বাহু বাড়াইয়া ইহার কাছে ব্যগ্র আলিঙ্গন দিতে ছুটিয়া আসিবে না? যদি না আসে, তবে ধিক্ তাহাকে! তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এই ভাল! এ রোগী ত আমাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার প্রায় অতীত হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। যদি পারে ত এই একান্ত একাগ্রতাই উহাকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিবে।

সতীর যে ধ্যান ভঙ্গ করিতে স্বয়ং যমরাজও একদিন সাহসী হন নাই, ক্ষুদ্র মানব ত কোন্ ছার!

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। দূরে ঘড়ি বাজিয়া বাজিয়া থামিল। ট্রামের হড় হড় গড় গড় শব্দ থামিয়া গিয়াছে। জনকোলাহল কিছু যেন শান্ত বোধ হইতেছিল। কেবল ষ্টেশন-যাত্রী গাড়ীগুলা মধ্যে মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া চলিয়াছিল, আর অদূরে প্রতিবেশী গৃহে কোন ভাব-মুগ্ধ যুবক তাড়িত জ্যোৎস্নামিশ্রিতালোকে ছাদে বসিয়া গাহিতেছিল—

"দুঃখের রাতে নিখিল ধরা যখন করে বঞ্চনা—
তোমারে যেন না করি সংশয়।"

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

I